ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই অগ্রহায়ণ,
১৮৮১ শকাব্দ

৫·৫০ নঃ পঃ

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

হে অতীত, কথা কও!

যা দেখেছি, যা শুনেছি, যাঁর কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি সেই আমার দেখা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর আমার জীবনের একটি ঘটনা; কালিকলমের আঁচড় টেনে, সেই জ্ঞানের-রাজ্যে-ডুবে-থাকা মহাজীবনকে ধরে রাখবার শক্তি আমার নেই, তবু তাঁর স্নেহের উত্তাপে আমি দিনের পর দিন মানুষ হয়েছি, আর এই স্পর্ধা নিয়েই যা স্মরণে আছে তাই লিখলাম। সেই ফেলে-আসা দিনগুলি যেন আমার বাল্যজীবনের দশ-বছরে-গড়ে-ওঠা অনুভূতির রঙিন স্বাক্ষর! জীবনের ঝরাপাতায় কত কী যে হারিয়ে গেছে, তবু যা মনে পড়ে, এ শুধু তারই অনুলেখন। হিমালয়কে মানুষ কত রকমেই না দেখে এসেছে, আমার চিত্তলোকে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখারও তেমনই অন্ত নেই। তাই আমার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত সেই অভ্রভেদী বিশালতায় মহীয়ান রামেন্দ্রসুন্দরের গৌরব-মহিমাদীপ্ত জীবনের কয়েকটি আনুষঙ্গিক ঘটনা জানাতে চাই। সন তারিখ মনে থাকবার কথা নয়, এ সব যে একদিন বলতে হবে, তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না, তাই ঘটনাবিন্যাস হয়তো ঐতিহাসিক নিয়ম মেনে চলবে না, তা হলেও ভাব-সুন্দর রামেন্দ্র-সুন্দরকে দেখবার কোনও অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন আমার বয়স খুবই অল্প, আন্দাজ আট-ন বছর। পিতৃকুলে সবেধন-নীলমণি, মাতৃকুলেও তাই। সাধারণতঃ এই সব ছেলে আলালের ঘরের দুলাল হয়ে ওঠে, অতএব তাদের মস্তক চর্বিত হয়। অবশ্য আমার অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন, আমাকে সে ভাবে গড়ে তোলেন নি। তবু ঐশ্বর্যের মাদকতায় যাতে আমার মাথা-খাওয়া না যায়, সেই কারণেই আমার পিতামহ, মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষালাভের আশায়। তিনি সম্বন্ধে আমার মাতামহ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে কী কান্না! তাই চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির, এই সব দেখিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন। প্রথম কলকাতায় এলে বুড়োরাও এ সব দেখে আহ্লাদে আটখানা হন—ছেলেদের তো কথাই নেই। যখন ওই সব দেখি, তখন কিছুটা সময় ভুলে থাকি, তারপরই বাড়ি ফিরে এসে আবার অঝোরে কান্না—চিলেকোঠায় গিয়ে মায়ের জন্যে একচোট লুকিয়ে কেঁদে আসি।

সেখানেই বসে মাকে চিঠি লিখি—মা, তুমি আমার প্রণাম নিও, মিনিকে আমার আশীর্বাদ দিও। তার কথা কিছু লেখো না কেন? মিনি একটা কাবলী বেড়াল, বেশ নাদুস-নুদুস, রঙ ধবধবে সাদা, সোনালী রঙের মোটা ল্যাজ। লালগোলায় থাকতে সে কখনও আমার কাছছাড়া হত না—পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে মিউ মিউ করে আদর চাইত। আমার কাছে তার খাতিরটাই বড়; দুধ ভাত মাছ তাকে খাইয়ে আমি খেতাম। কলকাতায় এসেও তার বিরহ আমাকে কম কাবু করে নি।

আর একজন কান্নার সঙ্গী ছিলেন—তারাপ্রসন্ন, আমাদের ঠিক সামনের বাড়িতেই তিনি থাকতেন। এঁর একটা ইতিহাস আছে। যখন আমি প্রথম কলকাতায় আসি, তার মাস দুই আগেই তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। ইনি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাক্তন ছাত্র, ইতিপূর্বে ডিগ্রী পরীক্ষায় সাত-সাতবার ডিগবাজি খেয়েছেন।

আমি আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তো খোকা, পাস করব কি না?

আমিও তখনই উত্তর দিলাম, নিশ্চয় করবেন।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, অষ্টম বারে তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকে হারাতে হল। পত্নীবিয়োগের পর তিনি সব সময়ই আমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতেন, রামেন্দ্রসুন্দরের পায়ে পড়ে কখনও বা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেন। গুরুর চরণযুগল সব সময় অনায়াসলভ্য না হওয়ায় তিনিও চিলেকোঠার এক কোণে সেই গরমেও কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে বসতেন। আমিও সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম—তিনি তাঁর দুঃখে, আমি আমার দুঃখে। তাঁর ফুঁপিয়ে কান্না দেখে আমার হাঁপিয়ে কান্না থেমে যেত। অবাক হয়ে দেখতাম। তাঁর হেতুটা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কারণটা যে কী, তিনি কখনও জানতে চান নি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, তাঁর জন্যেই আমার এই কান্না, আর সেই কারণেই আমিও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। লোকটি পরোপকারী, আর মনটা মোটামুটি সাদা হলেও, লোকের পেছনে চিমটি কাটার অভ্যেসটুকু তিনি কখনই ছাড়তে পারেন নি।

মধু গুপ্ত লেনে, পাশেই গা-লাগা বাড়িটায় থাকতেন শ্রীঅনাথনাথ সেন। তাঁর দুই ছেলে, অবনী আর অমিয়। অবনী আমার চেয়ে কিছুটা বড় আর অমিয় কিছুটা ছোট। বড় ভাই সিক্স্থ্ আর ছোট ভাই সেভেন্থ্ ক্লাসে পড়ে। দুজনেই চৌকস। অমিয় প্রত্যেক বারই ফার্স্ট হয়ে উঠত। অবনীও কম যায় না। কোনও বারে ফার্স্ট, কোনও বার সেকেণ্ড। তাই মাতামহ ওই দুটি ছেলের সঙ্গেই আমার

আলাপ করিয়ে দিলেন, যেন তাদের সঙ্গেই খেলাধুলায় ভুলে থাকি, আর সঙ্গটাও যেন ভাল হয়। আমাদের ভাড়া বাড়িটা বেশ প্রকাণ্ড—তবু মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠত। লালগোলার মত ফাঁকা মাঠ, বন-নদী—কিছুই এখানে নেই, আছে কেবল ছ্যাকড়া গাড়ির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ, আর অগুনতি মানুষের অফুরন্ত ছুটে চলা। দু-দুজন সমবয়সী বন্ধু পেয়ে একটুখানি হাত-পা মেলবার সুযোগ পেলাম। এরাই ছিল তখনকার দিনের নিত্যসঙ্গী। সে আজ অনেক দিনের কথা। তারা এখন কোথায়, অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাই নি।

প্রায়ই বিকেলে বাড়ির প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠানে আমরা ফুটবল খেলতাম। এক দিকে বাঙালী অপর দিকে গোরার দল, যা খেলোয়াড় জুটত আমরা দু ভাগ করে নিতাম। মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরও আমায় ডেকে নিয়ে "বাঘ-বন্দী" ও "মোগল-পাঠান" খেলা শেখাতেন। আমাকেই সোজা করে চক্-পেন্সিলে ছক কাটতে হত, যতক্ষণ না লাইন সোজা হয়। খেলার মধ্যে দিয়েও আমাকে শিক্ষা দেওয়ার ঝোঁক ছিল তাঁর প্রবল। আবার তাঁর সঙ্গে মেঝের ওপর মুখোমুখি হয়ে খেলতেও বসতাম।

পড়াশুনায় ছেলেবেলায় ভালই ছিলাম, লোকে আমায় শ্রুতিধর বলে ডাকত। একবার শুনলে আর ভুল হবার জোটি নেই। রামেন্দ্রসুন্দর স্থির করলেন, কিছুদিন ঘরে পড়িয়ে তারপর স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার চাইতে ঘরে পড়ানোর ওপরই তাঁর আস্থা বেশী ছিল।

এই ব্যবস্থায় দু বেলাই তাঁর চোখের সামনে বিরাট হলঘরের এক কোণে পড়তে বসি। রোজ সকালবেলা তাঁর কাছে বহু লোকের সমাগম, বাংলার প্রতিভাধর চিন্তানায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সেখানে গতায়াত ছিল—রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী ভট্টাচার্য, এ. চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখনকার কালের বড় বড় লেখক আরও কত মনীষী। আরও আসতেন হেরম্ব মৈত্র—লোকে বলত, ইনি চরিত্রের কষ্টিপাথর। আর একজন মনীষীও আসতেন, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ-শ্মশ্রু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—অপরিসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এক কথায় বিদ্যার জাহাজ। কোনও সুপণ্ডিত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—He is not a seal but a whale. তিনি এলেই শাস্ত্রালোচনায় আকণ্ঠনিমজ্জিত রামেন্দ্রসুন্দর অতলে ডুবে যেতেন।

হে অতীত, কথা কও!

যা দেখেছি, যা শুনেছি, যাঁর কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি সেই আমার দেখা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর আমার জীবনের একটি ঘটনা; কালিকলমের আঁচড় টেনে, সেই জ্ঞানের-রাজ্যে-ডুবে-থাকা মহাজীবনকে ধরে রাখবার শক্তি আমার নেই, তবু তাঁর স্নেহের উত্তাপে আমি দিনের পর দিন মানুষ হয়েছি, আর এই স্পর্ধা নিয়েই যা স্মরণে আছে তাই লিখলাম। সেই ফেলে-আসা দিনগুলি যেন আমার বাল্যজীবনের দশ-বছরে-গড়ে-ওঠা অনুভূতির রঙিন স্বাক্ষর! জীবনের ঝরাপাতায় কত কী যে হারিয়ে গেছে, তবু যা মনে পড়ে, এ শুধু তারই অনুলেখন। হিমালয়কে মানুষ কত রকমেই না দেখে এসেছে, আমার চিত্তলোকে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখারও তেমনই অন্ত নেই। তাই আমার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত সেই অভ্রভেদী বিশালতায় মহীয়ান রামেন্দ্রসুন্দরের গৌরব-মহিমাদীপ্ত জীবনের কয়েকটি আনুষঙ্গিক ঘটনা জানাতে চাই। সন তারিখ মনে থাকবার কথা নয়, এ সব যে একদিন বলতে হবে, তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না, তাই ঘটনাবিন্যাস হয়তো ঐতিহাসিক নিয়ম মেনে চলবে না, তা হলেও ভাব-সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখবার কোনও অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন আমার বয়স খুবই অল্প, আন্দাজ আট-ন বছর। পিতৃকুলে সবেধন-নীলমণি, মাতৃকুলেও তাই। সাধারণতঃ এই সব ছেলে আলালের ঘরের দুলাল হয়ে ওঠে, অতএব তাদের মস্তক চর্বিত হয়। অবশ্য আমার অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন, আমাকে সে ভাবে গড়ে তোলেন নি। তবু ঐশ্বর্যের মাদকতায় যাতে আমার মাথা-খাওয়া না যায়, সেই কারণেই আমার পিতামহ, মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষালাভের আশায়। তিনি সম্বন্ধে আমার মাতামহ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে কী কান্না! তাই চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির, এই সব দেখিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন। প্রথম কলকাতায় এলে বুড়োরাও এ সব দেখে আহ্লাদে আটখানা হন—ছেলেদের তো কথাই নেই। যখন ওই সব দেখি, তখন কিছুটা সময় ভুলে থাকি, তারপরই বাড়ি ফিরে এসে আবার অঝোরে কান্না—চিলেকোঠায় গিয়ে মায়ের জন্যে একচোট লুকিয়ে কেঁদে আসি।

সেখানেই বসে মাকে চিঠি লিখি—মা, তুমি আমার প্রণাম নিও, মিনিকে আমার আশীর্বাদ দিও। তার কথা কিছু লেখো না কেন? মিনি একটা কাবলী বেড়াল, বেশ নাদুস-নুদুস, রঙ ধবধবে সাদা, সোনালী রঙের মোটা ল্যাজ। লালগোলায় থাকতে সে কখনও আমার কাছছাড়া হত না—পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে মিউ মিউ করে আদর চাইত। আমার কাছে তার খাতিরটাই বড়; দুধ ভাত মাছ তাকে খাইয়ে আমি খেতাম। কলকাতায় এসেও তার বিরহ আমাকে কম কাবু করে নি।

আর একজন কান্নার সঙ্গী ছিলেন—তারাপ্রসন্ন, আমাদের ঠিক সামনের বাড়িতেই তিনি থাকতেন। এঁর একটা ইতিহাস আছে। যখন আমি প্রথম কলকাতায় আসি, তার মাস দুই আগেই তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। ইনি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাক্তন ছাত্র, ইতিপূর্বে ডিগ্রী পরীক্ষায় সাত-সাতবার ডিগবাজি খেয়েছেন।

আমি আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তো খোকা, পাস করব কি না?

আমিও তখনই উত্তর দিলাম, নিশ্চয় করবেন।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, অষ্টম বারে তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকে হারাতে হল। পত্নীবিয়োগের পর তিনি সব সময়ই আমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতেন, রামেন্দ্রসুন্দরের পায়ে পড়ে কখনও বা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেন। গুরুর চরণযুগল সব সময় অনায়াসলভ্য না হওয়ায় তিনিও চিলেকোঠার এক কোণে সেই গরমেও কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে বসতেন। আমিও সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম—তিনি তাঁর দুঃখে, আমি আমার দুঃখে। তাঁর ফুঁপিয়ে কান্না দেখে আমার হাঁপিয়ে কান্না থেমে যেত। অবাক হয়ে দেখতাম। তাঁর হেতুটা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কারণটা যে কী, তিনি কখনও জানতে চান নি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, তাঁর জন্যেই আমার এই কান্না, আর সেই কারণেই আমিও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। লোকটি পরোপকারী, আর মনটা মোটামুটি সাদা হলেও, লোকের পেছনে চিমটি কাটার অভ্যেসটুকু তিনি কখনই ছাড়তে পারেন নি।

মধু গুপ্ত লেনে, পাশেই গা-লাগা বাড়িটায় থাকতেন শ্রীঅনাথনাথ সেন। তাঁর দুই ছেলে, অবনী আর অমিয়। অবনী আমার চেয়ে কিছুটা বড় আর অমিয় কিছুটা ছোট। বড় ভাই সিক্‌স্‌থ্‌ আর ছোট ভাই সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ে। দুজনেই চৌকস। অমিয় প্রত্যেক বারই ফার্স্ট হয়ে উঠত। অবনীও কম যায় না। কোনও বার ফার্স্ট, কোনও বার সেকেণ্ড। তাই মাতামহ ওই দুটি ছেলের সঙ্গেই আমার

আলাপ করিয়ে দিলেন, যেন তাদের সঙ্গেই খেলাধুলায় ভুলে থাকি, আর সঙ্গটাও যেন ভাল হয়। আমাদের ভাড়া বাড়িটা বেশ প্রকাণ্ড—তবু মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠত। লালগোলার মত ফাঁকা মাঠ, বন-নদী—কিছুই এখানে নেই, আছে কেবল ছ্যাকড়া গাড়ির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ, আর অগুনতি মানুষের অফুরন্ত ছুটে চলা। দু-তুজন সমবয়সী বন্ধু পেয়ে একটুখানি হাত-পা মেলবার সুযোগ পেলাম। এরাই ছিল তখনকার দিনের নিত্যসঙ্গী। সে আজ অনেক দিনের কথা। তারা এখন কোথায়, অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাই নি।

প্রায়ই বিকেলে বাড়ির প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠানে আমরা ফুটবল খেলতাম। এক দিকে বাঙালী অপর দিকে গোরার দল, যা খেলোয়াড় জুটত আমরা দু ভাগ করে নিতাম। মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরও আমায় ডেকে নিয়ে "বাঘ-বন্দী" ও "মোগল-পাঠান" খেলা শেখাতেন। আমাকেই সোজা করে চক্-পেন্সিলে ছক কাটতে হত, যতক্ষণ না লাইন সোজা হয়। খেলার মধ্যে দিয়েও আমাকে শিক্ষা দেওয়ার ঝোঁক ছিল তাঁর প্রবল। আবার তাঁর সঙ্গে মেঝের ওপর মুখোমুখি হয়ে খেলতেও বসতাম।

পড়াশুনায় ছেলেবেলায় ভালই ছিলাম, লোকে আমায় শ্রুতিধর বলে ডাকত। একবার শুনলে আর ভুল হবার জোটি নেই। রামেন্দ্রসুন্দর স্থির করলেন, কিছুদিন ঘরে পড়িয়ে তারপর স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার চাইতে ঘরে পড়ানোর ওপরই তাঁর আস্থা বেশী ছিল।

এই ব্যবস্থায় দু বেলাই তাঁর চোখের সামনে বিরাট হলঘরের এক কোণে পড়তে বসি। রোজ সকালবেলা তাঁর কাছে বহু লোকের সমাগম, বাংলার প্রতিভাধর চিন্তানায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সেখানে গতায়াত ছিল—রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী ভট্টাচার্য, এ. চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখনকার কালের বড় বড় লেখক আরও কত মনীষী। আরও আসতেন হেরম্ব মৈত্র—লোকে বলত, ইনি চরিত্রের কষ্টিপাথর। আর একজন মনীষীও আসতেন, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ-শ্মশ্রু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—অপরিসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এক কথায় বিদ্যার জাহাজ। কোনও সুপণ্ডিত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—He is not a seal but a whale. তিনি এলেই শাস্ত্রালোচনায় আকণ্ঠনিমজ্জিত রামেন্দ্রসুন্দর অতলে ডুবে যেতেন।

সে সময়ে আমার কাউকেই জানা সম্ভব নয়, তবু তাঁরা চলে গেলে বালকসুলভ অনুসন্ধিৎসায় "ইনি কে?" "উনি কে?" প্রশ্ন করে রামেন্দ্রসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতাম। তখন থেকেই সব জিনিসই খুঁটিয়ে জানবার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল।

যেদিন রবীন্দ্রনাথ আসতেন, আমার সেদিনকার পড়া মাথায় উঠত। সেই দীর্ঘকায়, উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ দেহ, কাঁচা-পাকা ঢেউ-খেলানো দাড়ি, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল পদ্ম-পলাশ-লোচন জ্যোতির্ময় পুরুষ—আমি কিছুতেই আর তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে দেখেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেন, আমাকেও প্রণাম করতে বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কিন্তু বালকের পায়ের প্রণাম নিতেও কুণ্ঠা হত, এমন কি "আহা, না-না-না" বলে দু-তিন পা পিছিয়েও যেতেন। একজন সুন্দর সুপুরুষ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু বুঝবার বয়স তখন আমার হয় নি। উত্তরজীবনে অবশ্য তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

এরই মাঝে একদিন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর জীবনে একটা ব্যতিক্রম করে বসলেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বার বার নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি কখনও যেতেন না। সেদিন কোথাকার কী চাপে তিনি রাজী হয়ে গেলেন, সঙ্গে আছেন মাতামহী—ইন্দুপ্রভা দেবী। আমিও কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম, তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও তাঁরা সঙ্গে নিলেন। ইন্দুপ্রভা দেবী বারে বারে গিরিশ ঘোষের নাম করছেন, মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরও। সেই প্রথম তাঁর নাম শুনতে পেলাম।

সেদিন খাওয়ারও ব্যতিক্রম। যেখানে রোজ রাত নটায় খাই, সেদিন সন্ধ্যার সময় সবারই খাওয়া শেষ হয়ে গেল। লালগোলায় আমাদের নাট্যমঞ্চে শখের অভিনয় হত, কলকাতার থিয়েটারও সেখানে মাঝে-মাঝে যেত। কিন্তু আমার দেখবার হুকুম ছিল না, তবে আমাদের বাড়িতে দু-একবার যাত্রাগান শুনেছিলাম।

থিয়েটার-হলের ভেতর ঢুকে আমি কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম। চারিদিক আলোয় আলোময়। বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি, তাই আমরা রাজকীয় মসনদে গিয়ে বসলাম। সে যুগের থিয়েটারে রয়াল থ্রোন দেখেছিলাম। ঐকতান বাদ্যের পর দুলতে দুলতে যবনিকা উঠল, আমারও মন কেমন যেন দুলে উঠল। ইন্দুপ্রভা দেবী কিছুক্ষণ পরে একজন স্টেজে আসতেই দেখিয়ে দিলেন, ওই গিরিশ ঘোষ। কে গিরিশ ঘোষ, কী তাঁর পরিচয়—সে বয়সে কেমন করেই বা জানব? তবে মনে আছে তাঁর ভুঁড়ি দুলিয়ে নৃত্য, হাতে বোতল। পরে শুনেছিলাম, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ ওই রকম অভিনয় নাকি করতেন! আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার

অজস্র প্রশ্নবাণে রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবী জর্জরিত। কী হয়েছে ওঁর, অমন করছেন কেন? হাতে কিসের বোতল? ইত্যাদি। তাঁদের থিয়েটার দেখা মাথায় উঠল।

রামেন্দ্রসুন্দর মুশকিলে পড়ে গেলেন। ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন, ওটা রোজ সিরাপ।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই, চেপে ধরলাম—আমি তো খাই, কই, ও রকম হয় না তো!

ইন্দুপ্রভা দেবী ঠাট্টা করে বললেন, ওটা বড় সিরাপ, বড় হয়ে চেখে দেখিস, বুঝবি।

রামেন্দ্রসুন্দর ধমক দিয়ে উঠলেন, ওসব কী কথা বলছ তুমি?

আজ পর্যন্ত সেটা কিন্তু চেখে দেখা হয় নি।

আবার যবনিকা পড়ল—সঙ্গে সঙ্গেই কন্‌সার্ট বেজে ওঠে, পান বিড়ি সিগারেটের হল্লায় প্রেক্ষাগার মুখরিত। যবনিকার মধ্যস্থলে খুব বড় অক্ষরে একটা বিজ্ঞাপন। মাতামহীকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ও একটা রোগের ওষুধ।

তখনই আমার প্রশ্ন : কী রোগ? ও হলে কী হয়? কেন হয়?

ইন্দুপ্রভা দেবী সহাস্যে এটা-সেটা বুঝিয়ে আমায় থামিয়ে রাখতে চান, আবার সেটা ধামাচাপা দিয়ে অন্য কথা বলেন।

বিরক্ত করিস নি, এখন চুপ করে থাক্—ওসব জানতে নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় সিংহনাদ শোনা গেল : আঃ, চুপ করে বসে থাক, নইলে এখ্‌নি উঠিয়ে নিয়ে যাব।

রঙ্গমঞ্চের আলো, সাজানো বাড়ি ঘর দোর, নানা রকমের আসবাবপত্র আমার কিশোর-মনে কেমন একটা মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। থিয়েটার ভাঙলে বাড়ি ফিরে এলাম। বিছানায় শুয়েও সেই মায়াপুরীর কথাই ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না।

সে বয়সে বালকরা প্রায়ই অনুকরণপ্রিয় হয়, তাই ভোরে উঠেই জানলায় দাঁড়িয়ে অমিয় আর অবনীকে ডাকলাম। আর তাদের কাছে অর্ধশূন্য রোজ সিরাপের বোতলটা হাতে নিয়ে গিরিশ ঘোষের ভুঁড়ি নাচানোর ভঙ্গীটা দেখিয়ে দিলাম। তারা তো হতভম্ব! ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই, তারা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।•

হে অতীত, কথা কও!

যা দেখেছি, যা শুনেছি, যাঁর কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি সেই আমার দেখা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর আমার জীবনের একটি ঘটনা; কালিকলমের আঁচড় টেনে, সেই জ্ঞানের-রাজ্যে-ডুবে-থাকা মহাজীবনকে ধরে রাখবার শক্তি আমার নেই, তবু তাঁর স্নেহের উত্তাপে আমি দিনের পর দিন মানুষ হয়েছি, আর এই স্পর্ধা নিয়েই যা স্মরণে আছে তাই লিখলাম। সেই ফেলে-আসা দিনগুলি যেন আমার বাল্যজীবনের দশ-বছরে-গড়ে-ওঠা অনুভূতির রঙিন স্বাক্ষর! জীবনের ঝরাপাতায় কত কী যে হারিয়ে গেছে, তবু যা মনে পড়ে, এ শুধু তারই অনুলেখন। হিমালয়কে মানুষ কত রকমেই না দেখে এসেছে, আমার চিত্তলোকে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখারও তেমনই অন্ত নেই। তাই আমার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত সেই অভ্রভেদী বিশালতায় মহীয়ান রামেন্দ্রসুন্দরের গৌরব-মহিমাদীপ্ত জীবনের কয়েকটি আনুষঙ্গিক ঘটনা জানাতে চাই। সন তারিখ মনে থাকবার কথা নয়, এ সব যে একদিন বলতে হবে, তা আমার ধারণার মধ্যেও ছিল না, তাই ঘটনাবিন্যাস হয়তো ঐতিহাসিক নিয়ম মেনে চলবে না, তা হলেও ভাব-সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখবার কোনও অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন আমার বয়স খুবই অল্প, আন্দাজ আট-ন বছর। পিতৃকুলে সবেধন-নীলমণি, মাতৃকুলেও তাই। সাধারণতঃ এই সব ছেলে আলালের ঘরের দুলাল হয়ে ওঠে, অতএব তাদের মস্তক চর্বিত হয়। অবশ্য আমার অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ ছিলেন, আমাকে সে ভাবে গড়ে তোলেন নি। তবু ঐশ্বর্যের মাদকতায় যাতে আমার মাথা-খাওয়া না যায়, সেই কারণেই আমার পিতামহ, মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষালাভের আশায়। তিনি সম্বন্ধে আমার মাতামহ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে কী কান্না! তাই চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির, এই সব দেখিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন। প্রথম কলকাতায় এলে বুড়োরাও এ সব দেখে আহ্লাদে আটখানা হন—ছেলেদের তো কথাই নেই। যখন ওই সব দেখি, তখন কিছুটা সময় ভুলে থাকি, তারপরই বাড়ি ফিরে এসে আবার অঝোরে কান্না—চিলেকোঠায় গিয়ে মায়ের জন্যে একচোট লুকিয়ে কেঁদে আসি।

সেখানেই বসে মাকে চিঠি লিখি—মা, তুমি আমার প্রণাম নিও, মিনিকে আমার আশীর্বাদ দিও। তার কথা কিছু লেখো না কেন? মিনি একটা কাবলী বেড়াল, বেশ নাদুস-নুদুস, রঙ ধবধবে সাদা, সোনালী রঙের মোটা ল্যাজ। লালগোলায় থাকতে সে কখনও আমার কাছছাড়া হত না—পায়ের গোড়ায় লুটিয়ে মিউ মিউ করে আদর চাইত। আমার কাছে তার খাতিরটাই বড়; দুধ ভাত মাছ তাকে খাইয়ে আমি খেতাম। কলকাতায় এসেও তার বিরহ আমাকে কম কাবু করে নি।

আর একজন কান্নার সঙ্গী ছিলেন—তারাপ্রসন্ন, আমাদের ঠিক সামনের বাড়িতেই তিনি থাকতেন। এঁর একটা ইতিহাস আছে। যখন আমি প্রথম কলকাতায় আসি, তার মাস দুই আগেই তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। ইনি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাক্তন ছাত্র, ইতিপূর্বে ডিগ্রী পরীক্ষায় সাত-সাতবার ডিগবাজি খেয়েছেন।

আমি আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তো খোকা, পাস করব কি না?

আমিও তখনই উত্তর দিলাম, নিশ্চয় করবেন।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, অষ্টম বারে তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকে হারাতে হল। পত্নীবিয়োগের পর তিনি সব সময়ই আমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতেন, রামেন্দ্রসুন্দরের পায়ে পড়ে কখনও বা হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেন। গুরুর চরণযুগল সব সময় অনায়াসলভ্য না হওয়ায় তিনিও চিলেকোঠার এক কোণে সেই গরমেও কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে বসতেন। আমিও সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম—তিনি তাঁর দুঃখে, আমি আমার দুঃখে। তাঁর ফুঁপিয়ে কান্না দেখে আমার হাঁপিয়ে কান্না থেমে যেত। অবাক হয়ে দেখতাম। তাঁর হেতুটা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার কারণটা যে কী, তিনি কখনও জানতে চান নি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, তাঁর জন্যেই আমার এই কান্না, আর সেই কারণেই আমিও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। লোকটি পরোপকারী, আর মনটা মোটামুটি সাদা হলেও, লোকের পেছনে চিমটি কাটার অভ্যেসটুকু তিনি কখনই ছাড়তে পারেন নি।

মধু গুপ্ত লেনে, পাশেই গা-লাগা বাড়িটায় থাকতেন শ্রীঅনাথনাথ সেন। তাঁর দুই ছেলে, অবনী আর অমিয়। অবনী আমার চেয়ে কিছুটা বড় আর অমিয় কিছুটা ছোট। বড় ভাই সিক্‌স্‌থ্‌ আর ছোট ভাই সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ে। দুজনেই চৌকস। অমিয় প্রত্যেক বারই ফার্স্ট হয়ে উঠত। অবনীও কম যায় না। কোনও বার ফার্স্ট, কোনও বার সেকেণ্ড। তাই মাতামহ ওই দুটি ছেলের সঙ্গেই আমার

আলাপ করিয়ে দিলেন, যেন তাদের সঙ্গেই খেলাধুলায় ভুলে থাকি, আর সঙ্গটাও যেন ভাল হয়। আমাদের ভাড়া বাড়িটা বেশ প্রকাণ্ড—তবু মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠত। লালগোলার মত ফাঁকা মাঠ, বন-নদী—কিছুই এখানে নেই, আছে কেবল ছ্যাকড়া গাড়ির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ, আর অগুনতি মানুষের অফুরন্ত ছুটে চলা। দু-তুজন সমবয়সী বন্ধু পেয়ে একটুখানি হাত-পা মেলবার সুযোগ পেলাম। এরাই ছিল তখনকার দিনের নিত্যসঙ্গী। সে আজ অনেক দিনের কথা। তারা এখন কোথায়, অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাই নি।

প্রায়ই বিকেলে বাড়ির প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠানে আমরা ফুটবল খেলতাম। এক দিকে বাঙালী অপর দিকে গোরার দল, যা খেলোয়াড় জুটত আমরা দু ভাগ করে নিতাম। মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরও আমায় ডেকে নিয়ে "বাঘ-বন্দী" ও "মোগল-পাঠান" খেলা শেখাতেন। আমাকেই সোজা করে চক্-পেন্সিলে ছক কাটতে হত, যতক্ষণ না লাইন সোজা হয়। খেলার মধ্যে দিয়েও আমাকে শিক্ষা দেওয়ার ঝোঁক ছিল তাঁর প্রবল। আবার তাঁর সঙ্গে মেঝের ওপর মুখোমুখি হয়ে খেলতেও বসতাম।

পড়াশুনায় ছেলেবেলায় ভালই ছিলাম, লোকে আমায় শ্রুতিধর বলে ডাকত। একবার শুনলে আর ভুল হবার জোটি নেই। রামেন্দ্রসুন্দর স্থির করলেন, কিছুদিন ঘরে পড়িয়ে তারপর স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার চাইতে ঘরে পড়ানোর ওপরই তাঁর আস্থা বেশী ছিল।

এই ব্যবস্থায় দু বেলাই তাঁর চোখের সামনে বিরাট হলঘরের এক কোণে পড়তে বসি। রোজ সকালবেলা তাঁর কাছে বহু লোকের সমাগম, বাংলার প্রতিভাধর চিন্তানায়কদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সেখানে গতায়াত ছিল—রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী ভট্টাচার্য, এ. চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখনকার কালের বড় বড় লেখক আরও কত মনীষী। আরও আসতেন হেরম্ব মৈত্র—লোকে বলত, ইনি চরিত্রের কষ্টিপাথর। আর একজন মনীষীও আসতেন, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ-শ্মশ্রু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—অপরিসীম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এক কথায় বিদ্যার জাহাজ। কোনও সুপণ্ডিত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—He is not a seal but a whale. তিনি এলেই শাস্ত্রালোচনায় আকণ্ঠনিমজ্জিত রামেন্দ্রসুন্দর অতলে ডুবে যেতেন।

সে সময়ে আমার কাউকেই জানা সম্ভব নয়, তবু তাঁরা চলে গেলে বালকসুলভ অনুসন্ধিৎসায় "ইনি কে?" "উনি কে?" প্রশ্ন করে রামেন্দ্রসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতাম। তখন থেকেই সব জিনিসই খুঁটিয়ে জানবার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল।

যেদিন রবীন্দ্রনাথ আসতেন, আমার সেদিনকার পড়া মাথায় উঠত। সেই দীর্ঘকায়, উন্নতনাসা, গৌরবর্ণ দেহ, কাঁচা-পাকা ঢেউ-খেলানো দাড়ি, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল পদ্ম-পলাশ-লোচন জ্যোতির্ময় পুরুষ—আমি কিছুতেই আর তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে দেখেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেন, আমাকেও প্রণাম করতে বলতেন। রবীন্দ্রনাথের কিন্তু বালকের পায়ের প্রণাম নিতেও কুণ্ঠা হত, এমন কি "আহা, না-না-না" বলে দু-তিন পা পিছিয়েও যেতেন। একজন সুন্দর সুপুরুষ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু বুঝবার বয়স তখন আমার হয় নি। উত্তরজীবনে অবশ্য তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

এরই মাঝে একদিন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর জীবনে একটা ব্যতিক্রম করে বসলেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বার বার নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি কখনও যেতেন না। সেদিন কোথাকার কী চাপে তিনি রাজী হয়ে গেলেন, সঙ্গে আছেন মাতামহী—ইন্দুপ্রভা দেবী। আমিও কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম, তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও তাঁরা সঙ্গে নিলেন। ইন্দুপ্রভা দেবী বারে বারে গিরিশ ঘোষের নাম করছেন, মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরও। সেই প্রথম তাঁর নাম শুনতে পেলাম।

সেদিন খাওয়ারও ব্যতিক্রম। যেখানে রোজ রাত নটায় খাই, সেদিন সন্ধ্যার সময় সবারই খাওয়া শেষ হয়ে গেল। লালগোলায় আমাদের নাট্যমঞ্চে শখের অভিনয় হত, কলকাতার থিয়েটারও সেখানে মাঝে-মাঝে যেত। কিন্তু আমার দেখবার হুকুম ছিল না, তবে আমাদের বাড়িতে দু-একবার যাত্রাগান শুনেছিলাম।

থিয়েটার-হলের ভেতর ঢুকে আমি কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম। চারিদিক আলোয় আলোময়। বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি, তাই আমরা রাজকীয় মসনদে গিয়ে বসলাম। সে যুগের থিয়েটারে রয়াল থ্রোন দেখেছিলাম। ঐকতান বাদ্যের পর দুলতে দুলতে যবনিকা উঠল, আমারও মন কেমন যেন দুলে উঠল। ইন্দুপ্রভা দেবী কিছুক্ষণ পরে একজন স্টেজে আসতেই দেখিয়ে দিলেন, ওই গিরিশ ঘোষ। কে গিরিশ ঘোষ, কী তাঁর পরিচয়—সে বয়সে কেমন করেই বা জানব? তবে মনে আছে তাঁর ভুঁড়ি দুলিয়ে নৃত্য, হাতে বোতল। পরে শুনেছিলাম, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ ওই রকম অভিনয় নাকি করতেন! আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার

অজস্র প্রশ্নবাণে রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবী জর্জরিত। কী হয়েছে ওঁর, অমন করছেন কেন? হাতে কিসের বোতল? ইত্যাদি। তাঁদের থিয়েটার দেখা মাথায় উঠল।

রামেন্দ্রসুন্দর মুশকিলে পড়ে গেলেন। ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন, ওটা রোজ সিরাপ।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই, চেপে ধরলাম—আমি তো খাই, কই, ও রকম হয় না তো!

ইন্দুপ্রভা দেবী ঠাট্টা করে বললেন, ওটা বড় সিরাপ, বড় হয়ে চেখে দেখিস, বুঝবি।

রামেন্দ্রসুন্দর ধমক দিয়ে উঠলেন, ওসব কী কথা বলছ তুমি?

আজ পর্যন্ত সেটা কিন্তু চেখে দেখা হয় নি।

আবার যবনিকা পড়ল—সঙ্গে সঙ্গেই কন্‌সার্ট বেজে ওঠে, পান বিড়ি সিগারেটের হল্লায় প্রেক্ষাগার মুখরিত। যবনিকার মধ্যস্থলে খুব বড় অক্ষরে একটা বিজ্ঞাপন। মাতামহীকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ও একটা রোগের ওষুধ।

তখনই আমার প্রশ্ন: কী রোগ? ও হলে কী হয়? কেন হয়?

ইন্দুপ্রভা দেবী সহাস্যে এটা-সেটা বুঝিয়ে আমায় থামিয়ে রাখতে চান, আবার সেটা ধামাচাপা দিয়ে অন্য কথা বলেন।

বিরক্ত করিস নি, এখন চুপ করে থাক্—ওসব জানতে নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় সিংহনাদ শোনা গেল: আঃ, চুপ করে বসে থাক্, নইলে এখুনি উঠিয়ে নিয়ে যাব।

রঙ্গমঞ্চের আলো, সাজানো বাড়ি ঘর দোর, নানা রকমের আসবাবপত্র আমার কিশোর-মনে কেমন একটা মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। থিয়েটার ভাঙলে বাড়ি ফিরে এলাম। বিছানায় শুয়েও সেই মায়াপুরীর কথাই ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না।

সে বয়সে বালকরা প্রায়ই অনুকরণপ্রিয় হয়, তাই ভোরে উঠেই জানলায় দাঁড়িয়ে অমিয় আর অবনীকে ডাকলাম। আর তাদের কাছে অর্ধশূন্য রোজ সিরাপের বোতলটা হাতে নিয়ে গিরিশ ঘোষের ভুঁড়ি নাচানোর ভঙ্গীটা দেখিয়ে দিলাম। তারা তো হতভম্ব! ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই, তারা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

অমিয় বলল, সীতাহরণ পালাটা আমরা নিজেরাই থিয়েটার করব বলে ঠিক করেছিলাম—তা হলে আয়, সেটাই করা যাক।

আর চাই কী? অমিয়, অবনী—রাম, লক্ষ্মণ, তাদের বোন শৈল সাত বছরের মেয়ে—সে হল সীতা আর আমি হলাম রাবণ। এখন হনুমান চাই, কে সে পার্ট নেবে? যদিও আমরা সবাই হনুমানের দল, তবু পাড়ার একটি বিশেষ হনুমানকে ধরে আনা হল। সে বয়সেও বড়, পড়তেও দু-তিন ধাপ ওপরে।

লালগোলায় যে আমাকে মানুষ করেছিল, তার নাম দামোদর। পশ্চিমে চাকর, সেও আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে। তার কথাও একটু বলা দরকার। সে-ই ছোটবেলায় আমাকে শিখিয়েছিল আর রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলত, এই তোমার নানা, ওই তোমার নানী। তাই শেষ পর্যন্ত আমার কাছে তাঁরা ওই নামেই চালু হয়ে গিয়েছিলেন।

নানা ও নানীকে আমাদের এই সব আয়োজনের কথা আগে বিন্দুবিসর্গ জানতে দিই নি। তাঁদের হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে তাক লাগিয়ে দেব—এই ছিল আমাদের গোপন অভিলাষ। তাঁরা কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবই খবর রাখতেন, শুধু আমাদের দৌড় কদ্দূর এইটুকু দেখবার জন্যই বুঝি চুপ করে ছিলেন।

দামোদরকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল।

তিন-চারটে চিক একসঙ্গে সেলাই করে পুলি, লকলাইন দড়ি দিয়ে নীচেকার একটা ঘরে সে-ই যবনিকা বানিয়ে দিল। আমরা হরদম ড্রপ তুলি আর নামাই, এইভাবে খুব মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা-কার্য চলে। এখন চাই তক্তাপোশ, আলো আর কন্সার্ট। নীচেকার ঘরে দারোয়ান, ঠাকুর প্রভৃতির তক্তাপোশগুলো নিয়ে আসা হল। অমিয় আর অবনীও তাদের বাড়ি থেকে দুখানা নিয়ে এল। তারপর তলায় প্রয়োজনমত ইঁট দিয়ে ঠিক সমান করে তক্তাপোশগুলোকে সাজিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হল—লণ্ঠন, মোমবাতিও এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে যা যোগাড় করা গেল, তাতেই ফুটলাইটের কাজ চলবে। কিছু পয়সার দরকার। লাল নীল কাগজ চাই, রাংতা চাই, সাজাতে হবে তো! আমাদের কারও হাতেই পয়সা নেই, অথচ বেজায় শখ, থিয়েটার করা চাই। তাই বেয়ারিং পোস্টে কাজটা চালিয়ে দিলে হয় না? অমিয় প্রস্তাব করতেই তার দাদা মুরুব্বীর মত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, ও হয়ে যাবে 'খন, এ সব বিষয়ে আমি ওস্তাদ। কত লোকের কাছে যে

সরস্বতীপুজোর চাঁদা আদায় করেছি, তার গোনাগুন্‌তি নেই। যারা পয়সা দেবে, তাদেরই নেমন্তন্ন করা হবে।

কিন্তু হনুমান চাঁদা দিতে রাজী নয়, শেষটায় তাকে পার্ট দেওয়া হবে না—বলতেই সে স্কুলের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বহু কষ্টে চার আনা চাঁদা দিয়ে ফেলল। প্লে হয়ে গেলেও কিছুদিন পথেঘাটে দেখা হলেই তাকে সবাই "হনু" বলে ডাকত, সেও বিষম চটে যেত বলেই ছেলের দল আরও বেশী করে ক্ষেপিয়ে তুলত। সর্বসাকুল্যে চার টাকা দশ আনা চাঁদা উঠল—সে যুগে ওই যথেষ্ট। একজন ছেলের অভিভাবক এক টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।

অমিয় লাল নীল কাগজ কেটে কত রকমের ফুল, মালা, শেকল তৈরি করলে। সে বিষয়ে অমিয় খুব পটু। দরজার সামনে আর ঘরের ভেতরটা এ সব দিয়ে সে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। স্টেজের মধ্যে ঝলমলে রাংতা এঁটে এমন জমকালো করা গেল যে, মনে হল, আমরা যেন দ্বিতীয় মিনার্ভা তৈরি করেছি। এই হল আমাদের নাট্যশালার ইতিহাস।

অমিয়-অবনীর আর নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। কোত্থেকে একটা ধাড়ী ছেলেকে যোগাড় করে আনল, সে বাজাবে দুই হাতে "বেলো" করা একর্ডিয়ন—এই হল আমাদের কন্সার্ট।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের সীতাহরণ নাটকের অভিনয়। পার্ট সম্বন্ধে এই ঠিক হয়েছিল—যার যা খুশি তাই বলবে, তবে মূল সীতাহরণটা হওয়া চাই। আমি বলেছিলাম—দূর, সীতাহরণের সময় রাম-লক্ষ্মণ তো সোনার হরিণের পেছনে, আর হনুমানই বা তখন কোথায়? থাকব শুধু আমি রাবণ আর শৈল সীতা। অমিয় মস্ত একটা বোদ্ধার মত আপত্তি জানালে—না, সবাই থাকবে, নইলে প্লে জমবে না। অগত্যা আমিও রাজী হলাম।

মাতামহীকে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম দস্তুরমত বেমানান উঁচু-নীচু অক্ষরে একটা কাগজে লিখে নিয়ে। বাঁকা-ট্যাড়া লাইনগুলোও যেন আমাকেই মুখ বেঁকিয়ে বিদ্রূপ করতে চায়। যাই হোক, তিনি আমায় কানে কানে বললেন, ওঁকে বলিস নি, উনি থিয়েটারের ওপর হাড়ে চটা। আমিও তাঁর কাছে জেদ ধরে জানতে চাইলাম, তবে সেদিন থিয়েটার দেখতে গেলেন কেন? ইন্দুপ্রভা দেবী বুঝিয়ে দিলেন, আমি গিরিশ ঘোষকে দেখতে চেয়েছিলাম তাই নিয়ে গিয়েছিলেন।

শেষবয়সেও ইন্দুপ্রভা দেবীর একগাছিও চুল পাকে নি। দেখা হলেই তিনি আমার ছেলেবেলার কথা বেশ রসিয়ে বলেন।

আমিও লক্ষ্মী ছেলের মত তাঁর কথাই মাথা পেতে নিলাম। আমাদেরই মত সমবয়স্ক দর্শকবৃন্দ যোগাড়ের ভার নিয়েছিল অবনী-অমিয় দুই ভাই। সামনের শতরঞ্চিতে তারা চুপ করে বসে। যথাসময়ে ঐকতান শুরু হল। সেই বিচিত্র বিজ্ঞাপনবিহীন যবনিকাও উঠল। আমরা মনের আনন্দে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পাড়ার যত সমবেত দর্শকদের মাতিয়ে তুললাম। হনুমানের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজ মুড়ে তৈরি বিরাট লেজটা সটান তক্তাপোশে গিয়ে ঠেকেছে—তার ডগায় আর একটা দড়ি বাঁধা। মাঝে মাঝে লাঙ্গুল-সঞ্চালন দেখানো চাই। তাই নেপথ্যে একজন দড়িতে টান দিয়ে সেটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। তার মুখে কাঠ-কয়লার গুঁড়ো এতটা ঘন করে মাখানো যে, তাকেও আর চেনবার উপায় নেই। সেই বীর হনুমান হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে, মুখে কোনও ভাষা নেই, কেবল হুপ্ হাপ্ ছাড়া।

ড্রপ পড়ে গেল। আবার ঐকতান বাদ্য শুরু হল। এইবার ড্রপ উঠলেই সীতা-হরণ হবে। আমি রাবণ—সীতাহরণের ভার আমারই ওপর। খুব পাঁয়তারা কষে নিয়েছি—শৈলকেও বলে রেখেছি একটু ধস্তাধস্তির পর সে যেন টুক্ করে আমার কোলে উঠে পড়ে। যেন দুষ্টুমি করে না।

ড্রপ উঠল, সীতাহরণের জন্যে বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম। সবেমাত্র সীতাকে কোলে নিয়ে এক পা লাফিয়েছি, হঠাৎ কী এক হুঙ্কারে হলঘর কেঁপে উঠল—হনুমান একলাফে অদৃশ্য, রাম-লক্ষ্মণের পঞ্চবটী ত্যাগ, দর্শকবৃন্দ দ্রুত পলায়মান। আমার মাথাটা সামনে পেছনে দুলতে লাগল, দুখানা শক্ত হাতে লঙ্কাধিপতি মহারাক্ষস রাবণের কর্ণদ্বয় বিমর্দিত। তাকিয়ে দেখি, স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর। ঘরের পেছন দিকের জানলার খড়খড়ি উঠিয়ে তিনি ও ইন্দুপ্রভা দেবী ব্যাপারটা দেখেই ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেছেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এখন থেকেই সীতাহরণ—অ্যাঁ?

"ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা"। কর্ণবিমর্দনের পর থিয়েটারের প্রসঙ্গ একেবারেই চাপা পড়ে গেল। অমিয়-অবনীরাও বাপের কানমলা খেয়ে একদম ঠাণ্ডা। "হনু" মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারত বটে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের হুঙ্কারের কথা এখনও সে ভুলতে পারে নি বলেই বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেত না।

আমার মস্তিষ্ক যেন কোনও সময়েই অলস না থাকে, সেদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের কড়া নজর। ভোরে উঠেই আমার পুঁথি-পত্তর নিয়ে সেই হলঘরের নির্দিষ্ট কোণে পড়তে বসি, তার পরেই আসেন গৃহশিক্ষক। তিনি চলে যাবার পর মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দর এসে, কদ্দূর কী পড়া হল, তারই দেখাশোনা করে যান—অবশ্য যেদিন তাঁর ফুরসত থাকে। নটায় ছুটি; তারপরই স্নানাহার সেরে নানার সঙ্গে কলেজে যেতাম। তখন মির্জাপুর স্ট্রীটের ৬১নং গোলাপী রঙের বাড়িতেই কলেজ বসত, তখনও রিপন কলেজের নিজস্ব বাড়ি হয় নি। কলেজে ঢুকেই ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক কোণে ছোট একটা ঘরে তিনি আর প্রফেসাররা বসতেন। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে চারদিকের নোনা-লাগা দেয়াল, একটি মাত্র জানলা, ঘরের তুলনায় খুব বড় হলেও তার মধ্যে সূর্যকিরণের যেন প্রবেশাধিকার নেই। কলেজ, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার ইত্যাদি নাম শুনলেই যেমন একটা সুরুচিপূর্ণ পরিবেশের কথা মনে হয়, তার কিছুই ছিল না সেখানে। তবু সেখানেই আসতেন তখনকার দিনের মনীষীরা; সুরেন্দ্রনাথও প্রায়ই সেখানে গিয়ে বসতেন, যদিও তাঁর নিজস্ব একটা আলাদা বসবার ঘর ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের পরনে থানধুতি, গায়ে আমেরিকান 'কপ' শার্ট, গলার বোতাম কোনদিন থাকত, কোনদিন থাকত না, হয়তো কোনদিন মাঝের ঝিনুকের বোতাম ভেঙে যাওয়ায় সে জায়গাটা ফাঁক হয়ে থাকত; তার ভেতর দিয়ে বুকের কাঁচা-পাকা চুল দেখা যেত, এলোমেলো চাদরখানা কোনদিন বা গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন।

যানবাহনের মধ্যে ছিল শুধু ছ্যাকড়া গাড়ি—লাল রঙের রয়েল এক শ এগারো নম্বর, নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের দরজায় এসে লাগত, আমরা গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়োয়ান সেই দুর্বল প্রপীড়িত অসহায় নিরীহ ঘোড়া দুটির ওপর শপাং করে চাবুক চালিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিত। খেতে-না-পাওয়া, হাড়-বেরুনো অশ্বযুগল যেন চলতে চায় না, হ্রেষারবে জানিয়ে দেয় তাদের এই দুর্বহ জীবনভার যেন আর বইতে পারে না।

ভেতরে আমরা দুজন মুখোমুখি বসে; রাস্তা কাঁপিয়ে আমাদের রথ চলতে থাকে—রামেন্দ্রসুন্দর আপন মনেই বিড়বিড় করেন—তাঁর মন যে কোথায় কোন্ জগতে ঘুরে বেড়াত, কী যে তিনি ভাবতেন তিনিই জানেন। সে সময়ে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে কোন সাড়াশব্দ পেতাম না—হয়তো অনেকক্ষণ ডাকার পর 'অ্যাঁ:' বলে তিনি যেন আবার এই মাটির বুকে ফিরে আসতেন। প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, উদাসী রামেন্দ্রসুন্দরের এইটিই ছিল বিশেষত্ব।

কলেজে গিয়ে আমার ভাল লাগবে কেন? ওই বয়সে বৃদ্ধদের মধ্যে চুপ করে বসে থাকাটা সশ্রম কারাদণ্ডের চাইতেও বেশী। আপনভোলা রামেন্দ্রসুন্দর যখন কারও সঙ্গে কথায় ডুবে যান, আমিও ফাঁকতালে বেরিয়ে পড়ি, আর এ-ক্লাস ও-ক্লাস ছুটোছুটি করে বেড়াই। তাঁর যখন খেয়াল হত—আমি নেই, বেয়ারা দিয়ে আবার ধরিয়ে এনে কড়া হুকুম জারি করতেন: আমার অনুমতি না নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেন? পারিবারিক জীবনে এই রকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ক্রিয়াপদের ব্যবহার তিনি করতেন—যথা, করলেও করতে পারা যেতে পারে ইত্যাদি। অন্যান্য প্রফেসাররা আমার হয়ে ওকালতি করতেন—আহা, ছেলেমানুষ, ওর পক্ষে চুপ করে বসে থাকাটাই যে অস্বাভাবিক!

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় ফার্মান জারি হল, এখন চল আমার সঙ্গে ক্লাসে গিয়ে বসে থাকবে।

বাড়ন্ত গড়ন বলে, বয়সের তুলনায় আমাকে একটু বড়ই দেখাত, ক্লাসের ছেলেরা আমাকে ছাত্র বলেই ধরে নিয়েছিল। আমিও খুব গম্ভীর চালে লেক্‌চার শোনার ভান করতাম। প্রথম দিনই ক্লাসের কয়েকটি ছেলে শঙ্কাবিজড়িত কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দরকে জিজ্ঞেস করল, আমিও কি তাদের সহপাঠী? এত ছোট ছেলে তাদের সঙ্গে পড়ছে, এটা সত্যি তাদের পক্ষে লজ্জার কথা।

আমাকে নিয়ে ক্লাস থেকে ফিরে এসে রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যাপকদের কাছে এই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাসাহাসি করেছিলেন।

অধ্যাপক জানকী ভট্টাচার্য মশায় কলেজে আসতেন কালো চাপকান পরে—আদালতের উকিল-মোক্তারের মত। তার কারণও ছিল। কখনও কখনও কলেজের ক্লাস সেরেই কোর্টে চলে যেতেন, আবার কোনও দিন বা কোর্ট সেরে কলেজে আসতেন। দু-দুটো কাজ যে তিনি কেমন করে চালাতেন, তা তিনিই জানেন। একদিন কী একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সতীর্থ বন্ধু ক্ষেত্রবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন,—জানকী কোথায়?

মাথায় হাত দিয়ে ক্ষেত্রবাবু উত্তর দিলেন,—তোমার জানকী যে চলে গেল, রাম।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরে ঢুকেই কথাটি শুনে চমকে উঠলেন—অ্যাঁ, হঠাৎ কী হয়েছিল জানকীবাবুর?

ওই কথাটির ভেতরে যে একটা প্রচ্ছন্ন রসিকতার ইঙ্গিত ছিল, সেটা সুরেন্দ্রনাথের বোধগম্য হয় নি।

অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন নির্বাক। তাঁর এক টুকরো হাসিতেই সুরেন্দ্রনাথ কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে চুপ করে গেলেন।

জানকীবাবু রামেন্দ্রসুন্দরের সহপাঠী এবং একাত্ম বন্ধু। শুধু সেদিক দিয়ে নয়, ভাবের ঘরেও তাঁরা সতীর্থ। কলেজ সেরে কোর্টে যাবেন, ট্রাম ধরবার জন্যে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন—হাতে একখানা বই—সেটি পাতার পর পাতা পড়েই চলেছেন। এদিকে দু-তিনখানা ট্রাম চলে গেল, খেয়াল নেই। ব্যাপার বুঝে তাঁরই জনৈক ছাত্র তাঁকে সজাগ করে দিতেই তাঁর হুঁশ হল, তিনি তাড়াতাড়ি আর একটি হাইকোর্টগামী ট্রামে উঠে বসলেন।

তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। একদিন কাছে ডাকতেই আমার হাত ফস্‌কে এক দোয়াত কালি তাঁর গায়ে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময়টা রামেন্দ্রসুন্দর কী একটা কাজে পাশের ঘরে গিয়েছেন। আমি তো ভয়ে কাঠ, মুখ শুকিয়ে চুন! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সান্ত্বনা দিলেন, না না, ভয় পেয়ো না, রাম কিচ্ছু জানতে পারবে না। কিন্তু তা হয় নি, পরে রামেন্দ্রসুন্দর জানতে পারায় আমায় যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

একদিন সুরেন্দ্রনাথ সেই ঘরে রামেন্দ্রসুন্দরের সামনে বসে আছেন। আমাকে দেখিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, এই দেখুন মশায়, একটি শান্ত শিষ্ট ছেলে, বছরে যাট জোড়া কাপড় লাগে। দু-তিন দিনের বেশী একখানা কাপড় আস্ত থাকে না।

সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললেন, বলেন কী? আমার তো মাত্র দু জোড়ায় বছর চলে যায়।

এর পরই আমার বরাদ্দ ঠিক হয়ে গেল—বছরে গোনাগুনতি ছ জোড়া, ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে পরতে হবে। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্কর তখন এণ্ট্রান্স পাস করে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসের একটা ছেলের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়ায় ছাত্রটি এসে সুরেন্দ্রনাথের কাছে নালিশ করলে।

তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিয়ে বললেন, বাড়িতে আমি ওর বাবা হতে পারি, এখানে আমি কেউ নই—এঁকে বল।

ডাক পড়তেই ভবশঙ্কর হাজির, বেশ মোটা-সোটা, বেপরোয়া ভাব; ঘরে ঢুকতেই সুরেন্দ্রনাথের গম্ভীর কণ্ঠ: শাট দ্য ডোর।

সমস্ত অধ্যাপকমণ্ডলী চারিদিকে ঘিরে চুপ করে বসে আছেন—সুরেন্দ্রনাথ

নিস্তব্ধ। বিচারে রামেন্দ্রসুন্দর জরিমানা করেই ক্ষান্ত হলেন না—শাসন করে দিলেন, দ্বিতীয় বার এরকম হলে কলেজ থেকে বের করে দেব।

ভবশঙ্কর দমে যাবার পাত্র নয়। বেরিয়ে গিয়েই ফন্দী আঁটলে, এবার আর হাত দিয়ে নয়, হাতিয়ার দিয়ে কার্য উদ্ধার করতে হবে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যাক। আমি বেরুতেই ভবশঙ্কর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। যে ছেলেটি নালিশ করেছিল, তাকে দেখিয়ে আমায় বললে, দেখ্, ওর পকেট থেকে যদি স্টাইলো পেনটা তুলে আনতে পারিস তা হলে কী নিবি তাই বল্?

আমিও নীতিবাক্য শুনিয়ে দিলাম, না না, আমি ওসব পারব না—পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।

আরে দুর, চুরি কোথায়? তুই লুকোচুরি খেলিস নে? এও তো একটা খেলা, নিলাম—ও খুঁজে মরুক—তারপর আবার ফিরিয়ে দেব, এতে আর চুরি কোথায়? আর আমি যে তোকে বললাম, এটা কাউকে বলিস নি যেন।

আগে অনেক ইতস্ততঃ করেছিলাম। তারপর যখন আমার মাথায় ঢুকল যে সত্যি এটা লুকোচুরি খেলা, আমি রাজী হয়ে গেলাম। আমি সটান ছেলেটির কাছে বসেই পাশের পকেটে ক্লিপ দিয়ে আঁটা কলমটা তুলে নিলাম। হাত-সাফাই বিদ্যাটা আয়ত্তে ছিল না বলেই ধরা পড়ে গেলাম। তার কাছেই কথাটা ফাঁস করে দিতে হল যে, ভবশঙ্করই আমায় কলমটা নিতে বলেছে শুধু তাকে জব্দ করবার জন্যে। আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে।

ভবশঙ্করের ওপর ছেলেটির রাগ তো আগে থেকেই ছিল। এবার আর কোনও কথা নয়। সোজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আবার নালিশ। তাঁর কাছে পূর্বের মত সবাই বসে আছেন। ভবশঙ্করের আবার ডাক পড়ল। এবার তাকে শাস্তি দেবার ভার নিলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ। আর আমার কথা না বলাই ভাল—বাড়িতে এসে সাত চোরের মার, আর সাত দিন মাংস খাওয়া বন্ধ। আমার খুব প্রিয় খাদ্য, তাই সেটা বন্ধ করে চরম শাস্তির ব্যবস্থা হল। আমার সামনে সবাই খাবে, আমি তাকিয়ে দেখব।

আর একবার ভবশঙ্কর রিপন কলেজের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে কোন একটা গুরুতর অসদ্ব্যবহার করায় রামেন্দ্রসুন্দর কঠোর শাস্তিবিধান করলেন, যতদিন সে ক্লাসের মধ্যে সেই অধ্যাপকের কাছে সকলের সামনে মার্জনা ভিক্ষা না করে, তাকে পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হবে না। ভবশঙ্কর তাঁর নির্দেশ না মানাতে পরীক্ষা দিতে

পারে নি। এতে সুরেন্দ্রনাথ একটা পত্র লিখে রামেন্দ্রসুন্দরকে জানান—তিনি কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট, তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে এই চরম পন্থা অবলম্বন করা ঠিক হয় নি।

স্বাধীনচেতা রামেন্দ্রসুন্দরের ভাগ্যলিপি রচনার সময় চিত্রগুপ্ত কর্তাভজন নামীয় বিশেষ গুণটি লিখতে ভুল করেছিলেন। তাই পদত্যাগপত্র দাখিল করে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে জানালেন—

"আমি কলেজের অধ্যক্ষ, যেটা ভাল মনে হয়েছে, তাই করেছি—এসব বিষয়ে আপনার কাছে কোনও পরামর্শ নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি। কলেজে যতক্ষণ আমি অধ্যক্ষের পদে আছি, আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।"

এই নিয়ে অনেক চিঠিপত্র দুজনের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর নিজের সঙ্কল্প থেকে বিন্দুমাত্র চ্যুত হন নি, কলেজেও আর যান না।

আমি মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করি, তুমি আর কলেজ যাও না কেন?

সদুত্তর পাই নি। পরে নানীর কাছে সব শুনেছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন, সমূহ বিপদ। তিনি গেলে তাঁর সতীর্থ জানকীনাথ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তা ছাড়া আরও অনেক অধ্যাপককে হারাতে হবে। জানকীবাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতিকে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং বিশেষ অনুরোধ করায় রামেন্দ্রসুন্দর শেষটায় রাজী হলেন বটে, তবে একটি মাত্র শর্তে—শঙ্করকে ক্ষমা চাইতেই হবে।

সেও পরীক্ষাগৃহে ছাত্রসমাজের সামনে প্রকাশ্যভাবে সেই অধ্যাপকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।

সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী, মানবতার পূজারী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃঢ়তা অনমনীয়।

গত্যন্তর নেই দেখে সুরেন্দ্রনাথ রাজী হলেন; এদিকে নানারও আবার কলেজ যাওয়া শুরু হল বটে, তবে আমাকে আর সঙ্গে নিয়ে যান না, একজন ড্রইং-মাস্টার নিযুক্ত করলেন। তিনি দুপুরে এসে আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগলেন। বেলা তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত ইন্দুপ্রভা দেবীকে রামায়ণ পড়ে শোনাতাম। তারপরই জলযোগান্তে ছুটি। অমিয়-অবনীর সঙ্গে পুনর্মিলন—সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত খেলাধুলো, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি, বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যা হয়।

সন্ধ্যায় মাস্টারের কাছে দস্তুরমতো পড়াশুনো। খাবার আগে যেটুকু সময় পাওয়া যেত নানার সঙ্গেই কাটিয়ে দিতাম, এ সময়টা তিনি ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে

থাকতেন, আমিও তাঁর পাশেই শুয়ে পড়তাম। তাঁর স্নেহময় বুকে মাথা রেখে, কত শিক্ষা কত যে উপদেশ পেয়েছি তার সীমা নেই। তিনি নির্নিমেষে আকাশের দিকে চেয়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় গল্পচ্ছলে আমাকে বলে যেতেন, সেই সঙ্গে দেশবিদেশের ইতিহাস কাহিনী আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যেতাম। আমার কিশোর-মনে তাঁর কথাগুলি মায়াজাল রচনা করে চলত। পরদিনই তাঁর কথামত সেই সব গল্প লিখে তাঁকে দেখাতাম, এক এক সময় আনন্দে তিনি আমায় বুকে চেপে ধরতেন, ভুলত্রুটি হলে আবার নূতন করে লিখে তাঁকে দেখাতে হত।

এই রকম রুটিন-মাফিক আমার দিন কেটে যায়। আর একজন খেলার সাথী ছিল—আমার সমবয়সী মাসতুতো বোন মুরলা। বয়সে মাত্র দু মাসের ছোট—ডাক-নাম 'ঘি'। ড্রইং-মাস্টার চলে যাবার পর রামায়ণ পড়তে বসার আগের ফাঁকটুকুতে সে এসে হাজির হত। অমনই তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতাম ঃ

ঘি ঘি ঘি
ক্ষীর সর ছানা ননী
খাবে তুমি কী ?

তারপর আর যে কী সব বলতাম মনে নেই, তবে অনেকগুলি ছন্দপতন ছিল—পরে মাস্টার মশাই সেগুলি সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

আমার এই ছড়া শুনলেই মুরলা চটে লাল, তার বাবুদাদা অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে নালিশ।

সে-ই একদিন কানে কানে ফিসফিস করে বলল, ধীরেনদা, একবার ওপরে চিলেকোঠায় আসবে ? একটা মজা দেখাব।

ওখানে আবার কী মজা ?

ঘি খুব মাথা নেড়ে ভবিষ্যুক্ত হয়ে বলে, চলই না, দেখবে।

আর কোন কথা নেই, দুজনেই চটপট ওপরে উঠে গেলাম। উন্মাদিনী বলে এক ঝি ছিল, বছর বিশ-বাইশ। সে দেখি দেয়ালে হেলান দিয়ে দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছে। মেয়েছেলের সিগারেট খাওয়া দেখে অবাক হয়ে গেলাম। উন্মাদিনী ঘিকেও দু-একদিন হল সাগরেদ করে নিয়েছে। সে টপ করে তার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়েই এক টান দিলে। তারপরই আমায় অনুরোধ, তুমিও একটু

খাও না ধীরেনদা, দেখবে, খেলেই কেমন কাশি হয়।—বলেই সে খক্ খক্ করে একটানা কাশতে শুরু করে দিলে।

ওঃ, তাই বুঝি নানা সেদিন বলছিলেন, রোজ রোজ আমার সিগারেট কমে যায় কেন? তিনি হাওয়া-গাড়ি সিগারেট খেতেন। এখন বোঝা গেল, উন্মাদিনী সেখান থেকেই ওগুলো হাওয়া করে দিত।

উন্মাদিনী আর মুরলাকে বললাম, দাঁড়াও, মজা টের পাওয়াচ্ছি। নানা এলেই বলে দেব। যাই, আগে তো নানীকে বলে আসি।

উন্মাদিনীর সে কী তোয়াজ, ঘিরও কত কী আকুলি-বিকুলি! পাছে সব কথা ফাঁস হয়ে যায় বলে বিশেষ করে উন্মাদিনী আমাকেও দলে টানতে চাইল। তার ময়লা কাপড়ের এক কোণে আঁচলে বাঁধা পুঁটলির গিঁট খুলে আমার হাতে খানিকটা মসলা দিয়ে বলল, মুখ ধুয়ে এটা খেয়ে ফেলিস, তা হলেই আর কেউ গন্ধ পাবে না। সিগারেট কেমন করে ধরে টানতে হয়, তারও তালিম দিতে সে কার্পণ্য করে নি। অনেক ওজর আপত্তি জানিয়েও নিষ্কৃতি পেলাম না।

বালকের কাঁচা মন, আর কতক্ষণ নীতিবাগীশ হয়ে থাকা যায়? আমিও দলে ভিড়ে গেলাম, তবুও বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগল।

সেদিন কোন্ নক্ষত্র ছিল জানি না—অশ্লেষা কি মঘা! সবে একটান দিয়েছি, প্রবল কাশির চোটে দমবন্ধ হবার যোগাড়! সে ধাক্কা যদিই বা সামলানো গেল, পেছন থেকে একখানা পাঞ্জা এসে গলাটাকে এমনি টিপে ধরেছে যে, আর নিশ্বাস নিতে পারি না। আর একটি হাত লেগে রয়েছে মুরলার কানে। সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রনির্ঘোষ: চল্ নীচে—এর বিচার হবে।

নানা কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ির নীচে থেকে আমাদের মৃদু গুঞ্জন শুনে সোজা চিলেকোঠায় কখন যে উঠে এসেছেন, আমরা টের পাই নি। যাই হোক, আমাদের অবস্থা কাহিল—উন্মাদিনীও ভয়ে উন্মাদ।

কে কী করেছ, সব ঠিক করে বলতে হবে।—আমার ওপর আদেশ জারি হতেই আমি কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার মত অকপটে সরল সত্য কথাগুলি বলে ফেললাম। সেই নীলচক্ষু রোষকষায়িত রুদ্রমূর্তি আমার এখনও মনে আছে।

নানা বললেন, এতক্ষণে বোঝা গেল, আমার সিগারেট রোজ কেন কমে যায়! উন্মাদিনীকে দেখিয়ে নানীকে বললেন, তুমি এর ব্যবস্থা কর—ইনিই হচ্ছেন মূল

গায়েন। আমি এ দুটোকে দেখে নিচ্ছি। বলেই দু হাতে দুজনের কান ধরে চারদিককার বারান্দায় সাতপাক ঘোরালেন।

ব্যাপারটা মন্দ লাগছিল না। ঘিকে বললাম, দেখলি, নানাকেও ঘুরতে হচ্ছে—ওই যাঃ, তোর বাবুদার সঙ্গে তোরও আজ সাতপাক হয়ে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর কান দুটো ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন, দুষ্ট ছেলে কোথাকার!

আমার ড্রইং-মাস্টারটি খেতে খুব ভালবাসতেন—ছবি আঁকা শেখাতে বসেও রোজ চাকর মারফত দোকান থেকে শিঙ্গাড়া সন্দেশ আনিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিতেন, দিয়ে-থুয়ে খাবার নামগন্ধ নেই। একদিন তিনিই আমায় ধরে বসলেন, খাওয়াও না একদিন মাছ-মাংস।

বেশ তো, কালই খাবেন।

পরদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় তিনি এসে দর্শন দিয়েই বললেন, রান্নাবান্নার কদ্দূর? একটু তাড়াতাড়ি করবে। আজ এখানে খুব এক পেট খাব—তাই বাড়িতে এক বিন্দু জলগ্রহণ করি নি, বুঝলে?

হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পেলাম, কী সর্বনাশ! এখন করা যায় কী?

মাস্টার মশায়কে নেমন্তন্নের কথা নানীকে বলাই হয় নি—স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছি। তার ওপর আজ যে বৃহস্পতিবার—সে দিন তো মাছ-মাংস আমাদের বাড়িতে ঢোকে না। তবে? মুরলাকে বলতেই সে প্রথমটায় চোখ বড় বড় করে বললে, কী সর্বনাশ! এখন উপায়? তার পরই একটু গম্ভীর হয়ে আমায় অভয় দিল, কিছু ভয় নেই ধীরেনদা, মাস্টার মশায় যেমন রোজ মিষ্টি আনিয়ে একলা খান তেমনি ঠ্যালা বুঝুন। মুরলার কথায় মনে তো কোনও ভরসাই পেলাম না, বরং উদ্বেগ বেড়ে গেল। আমি তো জানি, যত কিছু দোষ আমার ঘাড়েই এসে পড়বে।

মুরলা একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো করে তুলল।

অনেক কিছু খাবার হচ্ছে মাস্টার মশায়, দেরি হবে প্রায় তিনটে। কথাটা শুনেই একটা অস্ফুট শব্দ 'উঃ' তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত। আমারও মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। মুরলাকে তাড়া দিয়ে বলি, কী রে, কী হল? শীগগির একবার দেখে আয়।

সেও একটা চাপা হাসি হেসে তখুনি অন্তর্ধান, আবার পুনরাগমন করেই বলে, তিনটে-চারটের আগে কোনও আশাই নেই।

মাস্টার মশায়ের মাথায় বজ্রাঘাত, চোখ ছানাবাড়া, আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বল কি? আগে বলেছিলে তিনটে, এখন হল চারটে? যাই, দোকান থেকে কিছু খেয়ে পিত্তি রক্ষে করে আসি।

হয়তো তিনি ভেবে নিলেন, তাঁর জন্যে পোলাও কোর্মা কোপ্তা কাবাব হচ্ছে—দেরি হবারই কথা!

তিনি তো বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু আমার বুকের কাঁপন থামতে চায় না। মাস্টার মশায়ের নেমন্তন্নের কথাটা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ বৃহস্পতিবারের বার-বেলাটা আমার উপরই ফলবে, অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেদিন রামেন্দ্রসুন্দর কী জানি কেন, তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরে এলেন। ড্রইং মাস্টার সটান তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ধীরেন কাল আমায় নেমন্তন্ন করেছে। বেলা তিনটে বেজে গেল, এখনও ডাক পড়ল না!

অ্যাঁ!—একটা শব্দ করেই রামেন্দ্রসুন্দর অন্দরে গিয়ে জানতে পারলেন, এ সব ভুয়ো-নিমন্ত্রণের কথা কিছুই তাঁরা জানেন না। আমি ততক্ষণ পগার-পার অমিয়-অবনীদের বাড়িতে। ডাক পড়তেই সোজা অন্দরে ঢুকে নানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কথাই খুলে বললাম, তারপরই সটান এসে নানার সামনে হাজির। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল। জানতে চাইলেন, এর উদ্দেশ্য কী? নেমন্তন্ন করে বলা হয় নি কেন?

গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, উত্তর দাও।

অকপটে বললাম উনিই কালকে এখানে মাছ-মাংস খেতে চেয়েছিলেন। আজ বেস্পতিবার সেটা খেয়াল ছিল না। ওঁকে দেখেই মনে পড়ল। ভয়ে তোমাদের বলতে পারি নি।

ইন্দুপ্রভা দেবী তাড়াতাড়ি এসে দরজার আড়ালে থেকে ইশারায় তাঁকে ডেকে নিলেন। তারপর বুঝিয়ে বলতেই তখনকার মত আমি নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু ফাঁড়া সম্পূর্ণ কাটল না।

রামেন্দ্রসুন্দর আবার জেরা শুরু করলেন, ঝিকে বলা হয়েছিল কেন—দেখে আয় তো রান্নার কত দেরি? বড্ডই ইয়ার হয়েছ, অ্যাঁ! মাস্টার মশাই তোমার ইয়ার?

মুরলার ডাক পড়তেই সে এসে সাফাই গাইতে শুরু করে দিলে, তুমিই মা

বলেছিলে বাবুদা, লোককে দিয়ে-থুয়ে খেতে হয়। মাস্টার মশায়ের কাছে সেদিন একখানা জিলিপি চাইলাম, উনি দিলেন না। তাই—

ঘিয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

রামেন্দ্রসুন্দর বিপাকে পড়ে গেলেন। জিলিপি না দেওয়ার অপরাধে এরা পরামর্শ করে এই কু-কীর্তিটা করেছে, না, সত্যিই ভুলে যাওয়ার জন্যেই মাস্টারের এই অবস্থা। যাই হোক, তখুনি রাবড়ি, সন্দেশ, গরম লুচি, আলুর দম প্রভৃতির আয়োজন হল। মাস্টার মশায় 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করে সেগুলির চরম সদ্ব্যবহার করলেন। আমরাও ভাগ পেলাম।

পরদিন থেকেই মাস্টার মশাই খুব কড়া হয়ে ড্রইং শেখাতে লাগলেন। আমারও রবার ঘষতে ঘষতে আর্ট-বুকের পাতা ছিঁড়ে যায় আর কি!

সীতাহরণ পালার পর হনুমানের মনে একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝেই উঁকিঝুঁকি দিত। রবিবারে যথারীতি বেলা দশটায় নাপিত এসেছে। আমি চুল ছাঁটতে বসব। এমন সময় হনুমানের আবির্ভাব। মুরুব্বিয়ানার সুরে সে নাপিতকে বুঝিয়ে দিল, ওহে নরসুন্দর, এই দেখছ আমার দশ-আনা ছ-আনা? কানের রগ ঘেঁষে—ঘাড় পর্যন্ত চুল থাকবে না, ঠিক এমনি করে ওর মাথায় কাঁচি চালাও।

আমি একটু খুঁতখুঁত করতেই বলল, যাঃ, তুই কি চিরটা কাল নাবালক হয়েই থাকবি না কি? না না, ও সব ভয় করতে নেই।—আমার মত করে চুল ছাঁটলেই বুদ্ধিটা খুলে যাবে। আর তুই যা সুন্দর, আরও কত খোলতাই হবে দেখিস।

হনুমানের কথামতই নাপিতের কাঁচি আমার মাথার ওপর খচমচ চলতে থাকে। চুল ছাঁটা যেই শেষ হয়েছে, অমনই রামেন্দ্রসুন্দর কোত্থেকে এসে আমায় দেখে বললেন, ও কী! সইসের মত দেখাচ্ছে যে! এ বুদ্ধিটা আবার কে দিলে?

পেছনে তাকিয়ে দেখি, হনুমান অদৃশ্য। সে ততক্ষণ বোধ হয় কিষ্কিন্ধ্যায় পৌঁছে গেছে।

আমি নিরুত্তর। নাপিতই আমার হয়ে হনুমানের কথা বলে দিল। সুতরাং আবার রামেন্দ্রসুন্দরের আদেশে নরসুন্দর আমার মাথায় কদমফুলি ছাঁট চালিয়ে এমন সুন্দর সংস্কারকার্য করে দিল—সম্মুখে, পেছনে, এপাশে, ওপাশে, চতুর্দিকেই সমান, আয়নায় দেখে নিজেকে আর চিনতে পারি না, যেন সদ্য কোনো টুলো পণ্ডিতের

আখড়ায় ভর্তি হয়েছি। তবে মাথার চুল নিয়ে দুঃখের কোন হেতু ছিল না, কারণ সে সময় আমার টেরি কাটবার হুকুমও ছিল না আর নিত্য-নতুন ফ্যাশানের রঙও আমার মনে ধরে নি। আজও কায়দা আর ফ্যাশানকে শাসন করেই পথ চলেছি; আমার অন্তরে এখনও তার ছোঁয়া লাগে নি।

রামেন্দ্রসুন্দর একটি পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে হাঁক দিলেন, ওরে, দাও, কল্কেটা পাল্টে দাও। আর তেল নিয়ে আয়, স্নান করব। "দাও" বলে যাকে আহ্বান করা হল, সে একটি পশ্চিমে চাকর—নাম 'দেও', অনেক দিনের পুরনো। নানা ডাকলেই সে কিচিরমিচির করে এমন ভাবে উত্তর দিত, যার অর্ধেকটাই বোধগম্য হত না। তার সঙ্গে আমার কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না বটে, তবু মাঝে মাঝে সে আমায় দুধ খাইয়ে যেত। তার বুড়ো আঙুলের ময়লাভর্তি নখটা দুধে ডোবানো থাকত, এইটে মনে আছে।

ঠিক সেই দিনই পুণ্যলোভাতুরা রমণীবৃন্দ জেমো থেকে গঙ্গাসাগর-স্নান-উপলক্ষে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে সংখ্যায় চল্লিশের কম হবে না—দলে প্রবীণা ও নবীনাও আছেন, সবাই সম্বন্ধে দূর এবং নিকট আত্মীয়া। বাড়ি গমগম করছে, নানীর আজ নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। কলকাতায় একটা আস্তানা থাকলে বাঙালীদের এ রকম ঝক্কি পোয়াতে হয়। নানা ইতিপূর্বেই খেয়ে-দেয়ে নিজের শোবার ঘরে কী একটা বই পড়ে যাচ্ছেন, যেন এই সব ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

মাস্টার যেসব আঁক কষতে দিয়ে গেছেন, ওই ঘরে বসেই আমিও সেসব চটপট সেরে নেবার চেষ্টায় আছি। নানী ব্যস্ত থাকায় সেদিন নানার কাছেই রামায়ণ পড়ে শোনাতে হল। নানা সদয় হয়ে বললেন, যাও, এখন খেলা করলেও করতে পার।

আর চাই কী! সপ্তকাণ্ড রামায়ণখানা মাথায় ঠেকিয়ে যথাস্থানে তুলে রেখে বাইরে দিলাম ছুট। নীচে নামতেই দেখি, হনুমান দাঁড়িয়ে আছে, চমকে উঠে বলল, এ কি রে! তোর মাথাটাকে গোলগাল বেলুন বানিয়ে দিলে কে?

যত নষ্টের গোড়া তুই, আবার কে? ওরে হনু, এখনি তোর লঙ্কাকাণ্ড নানাকে শুনিয়ে এলাম।

শুধু শুনিয়ে কী হবে? চোখে দেখবি?

কী রকম? সে লঙ্কাকাণ্ড তুই দেখাবি কী করে?

সে কী বলতে চায়, কিছুই পরিষ্কার বোঝা গেল না।

তবে দেখ্।—বলেই ঝট করে চাকরদের ঘর থেকে একটা দেশলাই নিয়ে এল। অন্ততঃ চল্লিশ-বেয়াল্লিশখানা ধুতি-শাড়ি দোতলার বারান্দা থেকে পাশাপাশি নীচে ঝুলে আছে। কোন কথা বলবার আগেই সে একটা কাঠি জ্বেলে কাপড়ের কোণায় ধরতেই লঙ্কাদহন শুরু হয়ে গেল। লকলকে আগুন, একখানা থেকে আর একখানা, এমনই করে সবগুলোকে গ্রাস করল। হনুমান নিমেষে অদৃশ্য, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

বাড়ির সবাই বিশ্রাম করছিলেন, আমার চীৎকারে দু-চারজন বারান্দায় এসে ব্যাপারটা দেখে কলরব করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহা হট্টগোল। বলাই বাহুল্য, ঝি চাকর বামুন সবাই ছুটে এসে কলসী-কলসী জল ঢালতেই আগুন নির্বাপিত হল বটে, কিন্তু মনের আগুন নিবল না।

কে এই কাণ্ডটা বাধিয়েছে?—সবারই চোখে এই জিজ্ঞাসা।

আশ্চর্য! নানা কিন্তু তখনও তাঁর ঘর থেকে বের হন নি।

তিনি যখন কিছু লিখতেন বা পড়তেন, বিশ্বজগৎ যেন তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে যেত। তাঁর এই আত্মসমাহিত ভাব আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মুখেই একটি শোনা কথা মনে পড়ল। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেবার পূর্বে তাঁদের বাড়ির উঠোনে স্টেজ বেঁধে থিয়েটার হয়েছিল, তাঁর পড়বার ঘরের ঠিক সামনের জানলা দিয়ে সেটা পরিষ্কার দেখা যেত। তাঁর পিতৃদেব ও পিতৃব্য গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—এঁরাই কী একটা পৌরাণিক নাটক অভিনয় করছিলেন। শেষ যবনিকা-পতনের পর গোবিন্দসুন্দর এসে পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করেন, কী রে, দেখলি আমাদের থিয়েটার? কেমন লাগল? তার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, কই, আমি তো কিছুই দেখি নি। এই ছিল আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের আজীবনের বৈশিষ্ট্য। সব্যসাচীর মত এই রকম একাগ্রতা না থাকলে কি আর এমন লক্ষ্যভেদ হয়? তিনি সেই প্রবেশিকা-পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

যাই হোক, এ ক্ষেত্রেও ত্রিবেদী-তাপসের তপস্থার ব্যতিক্রম হয় নি। ইন্দুপ্রভা দেবী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে এই দুঃসংবাদটি শুনিয়ে দিতেই তিনি চমকে উঠে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চক্ষুতারকায় দুরন্ত বিস্ময়।

কী এক অজানিত আশঙ্কায় আমার সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, মনের ভাব বুঝি মুখ-দর্পণেই প্রতিফলিত হয়। এদিকে নানার বৈজ্ঞানিক মন কিছুতেই খুঁজে পায় না—এটা কী করে সম্ভব হল! হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই হাত ইশারায় ডেকে নিলেন। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আমাকে প্রশ্ন করতেই মনে হল,

যেন কোন্ পাতালপুরীর অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই কণ্ঠধ্বনি, তাতে দীপ্তি আছে—জ্বালা নেই, ধ্বনি আছে—ঝাঁজ নেই।

এ কাজ কে করেছে জান?

জানি, কিন্তু এর জন্যে আমি দায়ী নই।

ভূমিকার প্রয়োজন নেই, বল কে করেছে?

অকপটে সব কথাই তাঁকে খুলে বললাম এবং এটাও জানিয়ে দিলাম, আমার কিছু বুঝবার আগেই এই কাণ্ডটা হয়ে গেল।

তার বাড়ি জান?

কার? হনুমানের? আমি তো বাড়ি থেকে বেরুতে পাই না, কেমন করে জানব? হয়তো অমিয়-অবনীরা জানে।

বিনাবাক্যব্যয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অনাথবাবুকে ডাক দিলেন। তিনিও দিবানিদ্রা ত্যাগ করে হুড়মুড় করে জানলার কাছে দাঁড়াতেই সব ব্যাপার খুলে বললেন। সেদিন অমিয়র অসুখ, অবনী আমাদের বাড়িতে তখনই ছুটে এল। তাকে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর চললেন হনুমানের বাড়ি—খালি গায়ে, চরণে বিদ্যেসাগরী চটি। দূরে নয়, আমাদের ওখান থেকে মাত্র তিন-চারখানা বাড়ি পরেই।

হনুমানের বাবা গোবিন্দগোপালবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দরকে নগ্নগাত্রে উপস্থিত দেখে তিনি গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে কোথায় কী ভাবে বসালে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয় যেন ঠাহর করতে পাচ্ছিলেন না।

রামেন্দ্রসুন্দর আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললেন, ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, এ রকম কাজ করা কর্তব্য নয়।

তাঁর কণ্ঠে ক্রোধের লেশমাত্র নেই।

গোবিন্দগোপালবাবু ডাক দিতেই হনুমান হাজির। সেও নিজের অপরাধ স্বীকার করতেই তিনি ছেলের গণ্ডে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষে চেঁচিয়ে উঠলেন, ব্যাটা হতচ্ছাড়া—

রামেন্দ্রসুন্দর বাধা দিয়ে বললেন, থাক্ থাক্, মেরে-ধরে কাজ নেই, ওকে একটু বুঝিয়ে দেবেন। তা হলেই হবে।

নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন মাফিক অমিয়-অবনী খেলতে আসত, আমিও রামেন্দ্র-সুন্দরের অনুকরণে মাঝে মাঝে বলতাম, আসুন, নাস্তানাবুদ হোন, বসতে অজ্ঞান হোন—

অত্যন্ত বিরক্ত হলে নানা আমাদের বলতেন, আস্তাজ্ঞে হোক—বস্তাজ্ঞে হোক। তার ওপরেও রঙ ফলিয়ে একটা নূতন পরিভাষা তৈরি করে না নিলে চলবে কেন? তাই "ন"-এর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছি নাস্তাজ্ঞে।

অবনীও হেসে বলত, তা হলে কি আসব না? আসতেও বলছ আবার না-আসতেও বলছ, কোন্‌টা ঠিক?

কোনটাই নয়। উপক্রমণিকা পড়েছি, বিদ্যে জাহির করা চাই তো।

আচ্ছা, বল তো হাহা শব্দের কী রূপ?

কিছুক্ষণ একটানা হাসির পর শেষটা 'হাহা' বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলাম। সামনেই রামেন্দ্রসুন্দর। আমাকে দেখে তিনি আহ্বান করলেন, আসুন রাজাধিরাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ, আস্তাজ্ঞে হোক।

আশ্চর্য হলাম নানার মুখে এবম্বিধ উচ্চারণ শুনে। তিনি ধীরু, ধীরেন, খোকন বা খোকা বলেই আমাকে ডাকতেন। ডাক শুনেই বুঝতাম, তাঁর মন কোন্ সুরে বাঁধা আছে। আজ সম্পূর্ণ অন্যরূপ আচরণ দেখে অবাক হলাম। 'হাহা' শব্দের রূপ ছাড়া এমন কী করেছি, যার জন্যে এই অপরূপ সম্ভাষণ! এ তো অনুরাগের ভাষা নয়—রাগের পূর্বাভাষ।

গড়গড়ার ওপরে কলকের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, ওটা কী? পেলে কোথায়?

ওটা জয়মঙ্গল সিংয়ের বড় তামাক খাওয়া কলকে। হনুমান বলল—তোর নানা এত বড়, ওঁর বড় তামাক খাওয়াই উচিত, তাই!

ক্রোধে রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে কথা সরে না, তবু বললেন, হনুমান আর কি বুদ্ধি দিয়েছেন, শুনি?

সে বলল—ওটা লম্বা, ছুঁচলো আর ছোট কলকে হলে কি হবে! ওতে ভারি তেজ। দেখিস না, ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে জয়মঙ্গল সিং রোজ সকাল-বিকেল কেমন দম দেয়, এক নিশ্বাসে এক কলকে এক্কেবারে ছাই। সে প্রায়ই বলে কিনা, বড় কলকে ছোট তামাক, ছোট কলকে বড় তামাক।

তারপর?

তুমি তামাক খেতে ভালবাস, তাই আমি আর ঘি ওটাকে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে খুব যত্ন করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

এবার কি করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন?

হনুমান বলেছে ওর মধ্যে বড় তামাক ভরে আগুন দিয়ে টানলেই একদম প্রাণ ঠাণ্ডা।

সঙ্গে সঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দরের একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমারই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর কি!

জয়মঙ্গল সিংয়ের ডাক পড়ল। তারাপ্রসন্ন হন্তদন্ত হয়ে তাকে হাজির করতেই, নানার অলঙ্ঘ্য আদেশ জারি হল, এ বাড়িতে তোমার গঞ্জিকাসেবন চলবে না। আর ওই হনুমান যেন গেটের মধ্যে আর কখনও না ঢুকতে পায়, এ খেয়াল রেখো।

প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ বাক্যটি জয়মঙ্গল সিংয়ের ধূমায়িত মস্তিষ্কে প্রবেশ করলেও তার প্রকৃত অর্থ মালুম হয় নি। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মল্লিনাথ তারাপ্রসন্ন সচীৎকারে শুনিয়ে দিলেন, এ বাড়িতে গ্যাঁজা খাওয়া চলবে না, বুঝলে?

পরে নানীর কাছেও শুনলাম, ওটা নাকি অত্যন্ত খারাপ নেশা, তাই নানা অমন চটে গিয়েছিলেন।

এদিকে বিরসবদন জয়মঙ্গল সিং তখনই নীচে নেমে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে তার দেশোয়ালী ভাই পাশের বাড়ির দারোয়ানের জিম্মায় রেখে এল। এ কথা না বললেও চলে, তদ্বিরকারক তারাপ্রসন্ন এ বিষয়ে তদ্বিরের কোন ত্রুটি করেন নি।

শ্রীরামচন্দ্রের বিশিষ্ট সেবকের ভূমিকায় এই কলিযুগের হনুমান এর পর আমাদের বাড়িতে আর পোড়ামুখ দেখান নি।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দরের ভগ্নীপতি রজনীকান্ত ত্রিবেদী মশাই এসেছেন। ইনি 'টাকা স্বর্গঃ টাকা ধর্মঃ টাকা হি পরমং তপঃ' এই অর্থনীতির ছাত্র। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে একটি টাকা দিয়ে বললেন, একটা ভাল সার্কাস দেখান। আপনাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। উত্তরে নানা মৃদুহাস্যে মাথা নেড়ে তাঁর ভগ্নীপতিকে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে নিয়ে যাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি আমাকে আর রজনীবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই সেই ছ্যাকড়া গাড়ির পক্ষীরাজ সশব্দে ছুটে চলল। সোজা গিয়ে সাহিত্য-পরিষদে নেমেই সেই একটি টাকা জমা দিয়ে রসিদটা রজনীবাবুর হাতে অর্পণ করে বললেন, এই হচ্ছে আমার সার্কাস, বুঝলে? বাজে খরচ হয়ে গেল না কি?

আমি ভেবেছিলাম আজ নানার সঙ্গে এই প্রথম সার্কাসে চলেছি, না জানি কত

মজাই আজ দেখতে পাব! আমিও হতাশ, ওদিকে রজনীবাবুও বিস্ময়-বিকল। তিনি হাড়-কেপ্পন বলেই সর্বজনবিদিত। ষোলটি আনা বেনাহক গচ্ছা গেল ভেবে সেদিন রাত্রে তাঁর সুনিদ্রা হয় নি। তার জের এসে দেখা দিল পরদিন প্রভাতে। প্রাতে উঠেই রজনীবাবু ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে নালিশ করলেন, আপনার বল্লভ যে কাল আমার গোটা একটি টাকা পরিষদ্-ভাণ্ডারে জমা করে দিলেন, সেই টাকাটা কি একেবারেই ডুবে গেল? ফেরত পাওয়া যাবে না?

ইন্দুপ্রভা দেবী কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, সতীনের ঘরে গিয়ে পড়েছে তো? তবে আর আশা নেই।

রহস্য বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় রজনীবাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নানী মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন, আমাকে তো সবাই সুখ-কপালী বলে, তবে ওই সতীনের জালায় জলে-পুড়ে মলাম। সেটি আর কেউ নয়, তোমাদের দেবী সরস্বতী। এ কথাটা তাঁরই মুখে শোভা পায়, বলবার স্পর্ধা তিনিই রাখেন।

ভেতরের খবর নিয়ে বাইরে এসে দেখি, যাঁর নামে অন্দরে নালিশ, তিনি কিন্তু তখন সদরে বসে একটা চিঠি নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর দীনেশচন্দ্র সেনকে একটি জরুরী পত্র দিয়েছিলেন। তারই উত্তরে তিনি নানাকে যা লিখছেন, সেটা কিছুতেই পড়া যায় না, কেবলমাত্র নামটি উদ্ধার করা গেল।[২]

নানার হাতের লেখাও বিশ্রী। সাদা কাগজের ওপর কালি-ডোবানো একটা পিঁপড়ে যেমন আঁচড় কেটে চলে যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তাক্ষরও অনেকটা তেমনই।

নানাকে বিরক্ত করে তুলি : ওই বিশ্রী হাতের লেখা নিয়ে তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে কেমন করে?

নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে তিনি উত্তর দিলেন, আমার জন্যে না ভাবলেও চলতে পারে, নিজের হস্তাক্ষরটা ভাল করবার চেষ্টা কর।

এদিকে ইন্দুপ্রভার কাছে নালিশ ঠুকেও কোন ফল না হওয়াতে, রজনীবাবু আবার রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকে হস্তাক্ষর ভাল করার কথাটা তাঁর কানে আসতেই রামেন্দ্রসুন্দরকে ঠাট্টা করে বললেন, খোকা যা জানতে চায়, আমারও যে সেটা জানতে ইচ্ছে হয় রামবাবু। আপনার আর এক ভগ্নীপতি শরদিন্দুনারায়ণ আপনার সঙ্গেই স্কুলে পড়তেন কিনা, তিনি আপনার সম্বন্ধে সেদিন কী মন্তব্য করেছেন জানেন?

কই, না তো!

তিনি বলেন, রামবাবু এতবড় বিদ্বান অতবড় পণ্ডিত—এই নিয়ে তোমরা এত হৈ-চৈ কর কেন? আমরা একসঙ্গেই স্কুলে পড়তাম, তাঁর হাতের লেখার চাইতে আমার লেখা ঢের ভাল। তিনিও বুদ্ধিমান, আমিও কম ছিলাম না। তবে রামবাবু যা পড়তেন তা আর জীবনে ভুলতেন না, আর আমি যেটা পড়তাম তার পরদিনই—বাস্, একটা লাইনও মনে থাকত না। এইটুকুই যা তফাত!

কথাটি শুনে রামেন্দ্রসুন্দর উচ্চহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুলতেই রজনীবাবু বোধ হয় মনে করলেন, তাঁর বড়কুটুম্ব এখন বেশ খোশমেজাজেই আছেন, সেই নগদ একটি মুদ্রা এই ফাঁকে চেয়ে নিলে হয় না? তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বললেন, দিন না রামবাবু, দয়া করে আমার কালকের সেই টাকাটা?

এ যে দেখছি, ভবী ভোলবার নয়।

সশব্দে হাতবাক্স বন্ধ করে তিনি ভৃত্যকে ডাক দিলেন, ওরে দাও, একটা গাড়ি ডেকে দাও।

আর কোনও রকমেই টাকাটা উদ্ধারের আশা নেই দেখে রজনীবাবু অগত্যা তাঁর সেই ষোল আনার মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে গাড়ি আসতেই রামেন্দ্রসুন্দরও সোজা দীনেশ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়িতে ওঠবার সময় আমাকেও ডেকে নিলেন, তাই যেমন ছিলাম তেমনই উঠে পড়লাম।

রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখেই দীনেশ সেন বুঝলেন, কী হেতু আগমন! চিন্তাক্লিষ্ট মুখে নানা বললেন, আপনার চিঠি তো পড়া গেল না, কী লিখেছেন জানতে এলাম। বিষয়টা জরুরী।

দীনেশ সেন খুব খানিকটা হাসলেন, তারপরেই উক্তি: আপনি আজীবন যে পাপ করেছেন, তারই আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিয়েছি মাত্র।

রামেন্দ্রসুন্দর নির্বাক। বুঝতে পারেন না, কী এমন পাপকার্য তাঁর দ্বারা হয়ে গেল! ফেলে-আসা সমস্ত জীবনকে যেন এক লহমায় পড়ে ফেলতে চান। তাঁর এই বিমূঢ় ভাব দেখে দীনেশচন্দ্র হেসে বললেন, না হয় একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়লই। ব্যাপারটা কী জানেন? আপনার চিঠিখানা পড়া শুধু যে আমারই ক্ষমতার বাইরে তা নয়, আরও দু-দশজন যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অসাধ্য বলে উঠে গেলেন। তাই একটা পালটা জবাব দিয়েছি।

এবার রামেন্দ্রসুন্দর সহজ হলেন, মুখে দেখা দিল তাঁর নিজস্ব সুন্দর হাসি। সঙ্গে

যোগ দিলেন দীনেশচন্দ্র। পারস্পরিক আলোচনার ফলে পত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, কাউকে আর অক্ষরের গবেষণায় মন দিতে হয় নি।

তারপরেই আমরা ছ্যাকড়া গাড়িতে সমাসীন এবং উভয়ের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

১১ই আগস্ট, ১৯০৮ সন। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছে। কলকাতা কী যেন একটা অজানা আশঙ্কায় থমথম করছে। সে যুগের ব্রিটিশ রাজকর্মচারী আর পুলিস গোটা বাঙালী জাতটাকেই যেন সন্দেহের চক্ষে দেখে।

ভোরে ঘুম ভেঙে যেত রক্ত-গরম-করা গানের ছন্দে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। জন বারো-চোদ্দ কলেজের ছেলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে ছুঁড়ে, 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গাইতে গাইতে পথ দিয়ে সদর্পে চলে যায়।

নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ক্ষুদিরাম বসু কে? কেন ফাঁসি হল? কী করেছিল? আমায় বুঝিয়ে দাও।

তিনি সব কথা বলতে চাইতেন না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরতেই তিনি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে শেষ কথা বললেন, যদি ক্ষুদিরামের মত দেশকে ভালবাসতে পার, তবে তো বুঝি একটা কিছু হলে।

আমিও বিকেলে অমিয়-অবনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই তাদের গলা জড়িয়ে বললাম, দেখ্, রোজ ভোর রাতে উঠে আমাদের এই সামনের রাস্তায় ওই গান গেয়ে বেড়াব। তোরা দুজন, আমি আর ঘি—এই মোট চারজন।

অমিয় ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়, আর লেখাপড়া?

আমরা তো সামনেই টহলদারি করব, সূর্য উঠতেই যে যার ঘরে ঢুকে বই নিয়ে 'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' বুঝলি?

তাই ঠিক হল। একান্ত গোপনে ঘিয়ের কানে কানে এ কথাটা শুনিয়ে দিলাম। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে "আমার দেশ" গানটা চাইতেই তিনি লাল অক্ষরে ছাপানো একখানা কাগজ বের করে আমায় দিলেন। আমরাও আপন আপন খাতায় সমস্ত গানটা টুকে নিয়ে নানাকে সেই কাগজটা ফেরত দিলাম। সেই দিনই বিকেলে খেলাধুলো বন্ধ করে ওই গানের রিহার্সাল হল।

পরদিন খুব ভোরে আমরা সবাই বাড়ির সামনে প্রভাতফেরি শুরু করেছি। মিলিত কণ্ঠে গাইলেও কারও সঙ্গে কারও সুর মিলছে না। পরস্পরের সঙ্গে আমাদের

গলা না মিলুক হাত ছোঁড়ায় কিছুমাত্র বিরাম নেই। সে বিষয়ে আমাদের একতা একটা দেখবার জিনিস।

ইন্দুপ্রভা দেবী অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের উঠতে একটু বেলা হত। আমি তাঁদের কাছেই শুতাম। তিনিই রোজ আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিতেন। আজ ভোরেও আমাকে বিছানায় না দেখে নানাকে তুলিয়ে বললেন, খোকা গেল কোথায়?

নিদ্রাজড়িত স্বরে উত্তর এল, দেখ, কোথাও আছে—হয়তো বাথরুমে।

আমি দেখেছি, বাড়িতে কোথাও নেই।

অ্যাঁ, তা হলে?

ঠিক সেই সময়টায় আমাদের বাড়ির সামনেই গলা ফাটিয়ে চীৎকার হচ্ছে— "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

আওয়াজ কানে যেতেই রামেন্দ্রসুন্দর বলে উঠলেন, ওই যে মেষের দল ওখানেই আছে।

রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট এক নধরকান্তি ভুঁড়িয়াল পাহারাওয়ালা তখন সেই দিক দিয়েই যাচ্ছিল। তাকেই ঘিরে আমরা ঘুষি বাগিয়ে গান গেয়ে যাই। সেও তার তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি বগলদাবা করে মৃদু হাস্যে হাতের চেটোয় খৈনি টিপে চলেছে, সুরের আমেজে লাল-পাগড়ি-বাঁধা মাথাটা ঘন ঘন দুলতে থাকে, এক জোড়া বড় গোঁফের ফাঁকে হাসি ফুটেও যেন ফুটতে চায় না। হয়তো ভাবছে 'রামা হো রামা' বলে আমাদের সঙ্গে সেও যোগ দেবে কি না! এমন সময় সদর-দরজায় চোখ পড়তেই দেখি, রামেন্দ্রসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন, পশ্চাতে ইন্দুপ্রভা দেবী। কৃত্রিম রাগ দেখালেও তাঁর চোখে মুখে অকৃত্রিম আনন্দের আলো। স্থির পুত্তলিকাবৎ আমরা চারজন দাঁড়িয়ে গেলাম, মুখে একটি কথা নেই। নানা আমায় ডেকে বললেন, নাচন-কোঁদন যা করতে হয়, বাড়ির মধ্যে করো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিসের কাছে বীরত্ব দেখিয়ে লাভ নেই।

নানী মুরলার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে ধমকে দিলেন, তুই ব্যাটাছেলেদের মধ্যে ধেই ধেই করে লাফাচ্ছিস কেন?

বাঃ রে, আমি কী করলাম? ধীরেনদাই তো আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি আর পশ্চাতে দৃক্‌পাত না করে লক্ষ্মী ছেলের মত সোজা ওপরে গিয়ে বই খুলে বসলাম।

এই সময় রামেন্দ্রসুন্দর গেলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে, আমিও তাঁর সঙ্গে। সার্ সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, আরও খ্যাতনামা অনেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর একবার এখানে, একবার সেখানে, এর-ওর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিসফাস করে কী সব বলছেন আর হাতের লেখা একটা কাগজে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন। দেখে মনে হল, খুব ব্যস্ত। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর চিরন্তন ভঙ্গীতে ইংরেজী বক্তৃতা দিলেন। সম্মেলনে আর সব কী হল, কে কী বললেন, ঠিক মনে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী আর বাংলা দুই ভাষাতেই বলেছিলেন। বাংলায় তো কথাই নেই, ইংরেজীতেও অনর্গল বলে গেলেন।

স্থানটি সম্পূর্ণ অচেনা—তাই এটা তো জানা কথা, সেখানে কোনও সঙ্গী-সাথী পাব না; বাধ্য হয়ে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করেই থাকতে হল। তবে সুরেন্দ্রনাথের পিঠ ঠোকা আর রবীন্দ্রনাথের আদর করে হাত বুলনো ছাড়া আর কিছুই জমার ঘরে খুঁজে পেলাম না।

আট নম্বর মধু গুপ্ত লেনের বাড়িটা বেশ বড় হলেও সেখানে বৈদ্যুতিক আলোর তখনও প্রবেশাধিকার হয় নি। লণ্ঠনের আলো আর মোমবাতি দিয়েই কাজ চলত। টানা-পাখা টাঙানো ছিল শুধু হল-ঘরে, যেখানে নানা বসতেন।

ঘিয়ের সঙ্গে আমার কী একটা কথা-কথান্তর হওয়াতে সোজা সে চলল নালিশ করতে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। আমরা যে-কেউ তাঁর কাছে নালিশ করতে যেতাম, তিনি শুনতেন কি না জানি না, কিছুক্ষণ পরে একটি "হুঁ" উচ্চারণ করে বলতেন, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। ঘিয়ের ভাগ্যেও তাই হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর তিনি একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন। ফরিয়াদী নালিশ করতে গেল অথচ আসামীর ডাক পড়ল না, তাই আমি উঁকি মেরে দেখতেই ঘি তার বাবুদাকে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখিয়ে দিল: ওই যে ধীরেনদা।

আবার একটি কথা: হুঁ, এই, তুমি পাখা টান।

তাই পারতপক্ষে আমরা নানার কাছে নালিশ করতে যেতাম না। তাঁর কাছে এভাবে আটক হয়ে গেলে নিজেদের মুক্তির পথ নিজেরাই কখনও খুঁজে নিতাম।

ঘি কিছুক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার পর অকারণে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এই যে যাচ্ছি—

রামেন্দ্রসুন্দর বইয়ের স্তূপ থেকে মাথা তুলে বললেন, আবার কী হল?

ইন্দুমা আমায় ডাকছেন।

বেশ, যেতে পার।

কিছুক্ষণ পরেই ঘিয়ের পুনরাবির্ভাব: ধীরেনদা, তোমারও ডাক পড়েছে, শীগ্‌গির এস।

বইয়ের পাতা থেকে চোখ না তুলেই নানার আদেশ জারি হল: আচ্ছা, তুমিও যেতে পার।

দুজনেই বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘি যদিও বললে আর কখনও বাবুদার কাছে নালিশ করতে যাবে না, কিন্তু সে কতক্ষণ? অভিযোগ করতে গিয়ে আবার সে আটক পড়ে যেত। ব্যাপার বুঝে আমি ওসব নালিশ-সালিসির পথে কখনও পা বাড়াই নি।

আর একদিন কী একটা সামান্য অপরাধ করায় ঘি নানার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার শাস্তি পেয়েছে। ডাকনাম ঘি হলেও তার ভাল নাম ছিল মুরলা—একটি আটপৌরে, একটি পোশাকী, এটা আগেও বলেছি। সেই মুরলা দু পয়সা দিয়ে একটা বাঁশের বাঁশী কিনেছিল। সেটা তার ফ্রকের পকেটেই থাকত। চুপচাপ আর কতক্ষণ থাকা যায়? উত্ত্যক্ত হয়ে সে বাঁশীটা নিয়ে নানার কানের কাছে ফুঁ দিতেই তিনি কেড়ে নিয়ে বাক্সবন্দী করে বললেন, যা, এখন বিরক্ত করিস নে।

মুরলার আর মুরলী বাজানো হল না বটে, কিন্তু সে ছাড়পত্র পেয়ে গেল।

নাচতে নাচতে ছুটে এসেই ঘি আমাকে পরামর্শ দিল: ধীরেনদা, তুমিও একটা বাঁশী কিনে রাখ। বাবুদাদা আটক করলেই কানের কাছে বাজিয়ে দিও।

হঠাৎ একদিন চিঠি এল, পদ্মমা আসছেন। ইনি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জননী আর আমারও মায়ের মাতামহী। পত্র দিয়েছেন দুর্গাদাস ত্রিবেদী—রামেন্দ্রসুন্দরের ছোট ভাই। তিনিই নিয়ে আসছেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী ব্যস্তসমস্ত হয়ে শাশুড়ীর পূজার ঘর, শোবার ঘর, হবিষ্যির ঘর গোছাতে লাগলেন। হাজার হলেও শাশুড়ী, সমীহ করে চলতে হবে বই কি! গিন্নীপনায় একটু ব্যাঘাত হলেও, বহুদিনের-ফেলে-আসা ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাসটা আবার ঝালিয়ে নিতে হবে।

পদ্মমা এ দিকে খুব রাশভারী ছিলেন। কম কথা বলেন, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই চলাফেরা করেন, যাকে যেটা বলবেন সেটা তখুনি হওয়া চাই, তাই তাঁর সামনে এতটা বয়সেও ইন্দুপ্রভা দেবীকে প্রায় কনেবউয়ের মতই থাকতে হত।

পরদিন যথানির্দিষ্ট সময়ে পুঁটলি-পোঁটলা-ঘটি-বাটি-বোঝাই একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি আমাদের বাড়ির দরজায় এসে থামল। ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের চটির দ্রুত চটপট শব্দও স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দুর্গাদাস ত্রিবেদী নেমেই মাকে হাত ধরে নামালেন। অত বড় ভারী শরীর নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা সোজা কথা নয়। রামেন্দ্রসুন্দর হুমড়ি খেয়ে মায়ের চরণ বন্দনা করেই পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। পদ্মমাও বুড়ো ছেলের খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গজানো থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেয়েই আমাকে কোলে তুলে নিলেন, আবার তখুনি নামিয়েও দিলেন। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমার শরীরটা তখন বেশ নাদুস-নুদুস ছিল কি না।

নানার ভুঁড়ি নামিয়ে প্রণাম করবার ভঙ্গি আর পদ্মমার চক্ষুতারকাদ্বয় অবলুপ্তপ্রায় অবস্থায় অত বড় ছেলেকে চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা দেখে আমি তো হেসেই খুন। মনে খানিকটা সাহসও এল। এর পর নানা বা নানী যদি কোন কারণে বকেন, তা হলেই সটান পদ্মমার কোলে আশ্রয় নেব, চাই কি তাঁকে ধরে ওঁদেরও এবার দু-চারটে বকুনি খাওয়াব।

মায়ের হাত ধরে ত্রিবেদী মশাই উপরে গিয়ে ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে জিম্মা রেখে আপন কেতাবের স্তূপে ডুবে গেলেন। আমাকে পেছন পেছন ঘুরতে দেখে তাড়া দিয়ে বললেন, যাও, পড়তে বস গে, অনেক দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় আবার পদ্মমার ডাক: ওরে রাম, গঙ্গাস্নানে যাব তার বন্দোবস্ত করে দে।

আমিও পদ্মমার কাছে ছুটে গিয়ে বায়না ধরলাম, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

নানার গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল: কোথায় আছ হে দুর্গোদাস, মাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাও। একটা গাড়ি ডাকতে বল।

দুর্গাদাস ত্রিবেদী বেরিয়ে এসেই আপত্তি জানালেন, একে রাত্রে ঘুম হয় নি, তার উপর একটু জ্বরভাব হয়েছে।

তা হলে উমাপতিকে ডাক। ওর আবার কলেজের দেরি হয়ে না যায়।

উমাপতি বাজপেয়ী রামেন্দ্রসুন্দরের পিসতুতো ভাই। দাদার কাছে থেকে রিপন কলেজে তখন আই. এ. পড়তেন। রোজ সকালে উঠেই এমন গলা ফাটিয়ে পড়া মুখস্থ করতেন যে, মধু গুপ্ত লেনের এপার-ওপার সমস্ত বাড়ির লোকেরই ঘুম ভেঙে যেত। ইনি পরে কেমিস্ট্রিতে এম. এ. পাস করে ওই রিপন কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ডাক পড়তেই তিনিও হাজির। তাঁর ওপর আদেশ হল : যাও, মাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আন।

পদ্মমা ফরমান জারি করলেন, ওরে রাম, খোকাও আমার সঙ্গে যাবে।

মাতৃভক্ত সন্তান রামেন্দ্রসুন্দর কী আর করেন!

আমার সেদিনকার পড়া-ফাঁকি-দেওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি আমার দিকে তির্যগদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, বুঝেছি। মনে করলে বুঝি তোমার চালাকিটা ধরতে পারি নি? আচ্ছা, যেতে পার। মাকে যেন বিরক্ত করো না।

ব্যাপারের দৌলতে আমারও সেদিন গঙ্গাস্নানে পুণ্য সঞ্চয় হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি, নানীর মুখ বেজায় গম্ভীর। ঘি বললে, ইন্দুমা কদিন ধরেই কী একটা কাজের কথা বাবুদাকে বলছিলেন। তিনি রোজই ভুলে যান, তাই ইন্দুমা বাইরের ঘরে গিয়ে বাবুদাদার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন। আমি যে বললাম, এ কথা কাউকে বলো না।

আমি তখুনি নানার মুখের অবস্থাটা কী হয়েছে দেখতে ছুটে গেলাম। সেখানে প্রশান্ত মহাসাগর। কিছুই বোঝা গেল না, তিনি যথারীতি কেতাব নিয়ে আছেন।

খাবারের সময় পদ্মমা পাখা হাতে বসেছেন। নানা মুখ না তুলেই খেয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাঁর সঙ্গেই বসেছি।

পদ্মমার হাঁক শোনা গেল : বাড়ি থেকে যে আমসত্ব এনেছি, খোকা আর রামের জন্যে একটু দিয়ে যাও তো বউমা।

নানী ঘিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে এলেন না। পদ্মমার নীলাভ চোখে নির্বাক বিস্ময়।

ঝগড়ার ব্যাপারটা আমি ঘিয়ের মুখে আগেই শুনেছিলাম। এখন নানীর রহস্যজনক অন্তর্ধানে কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। দুষ্টুমি করে বললাম, নানী, তুমি নিজের হাতে দিয়ে যাও, নইলে খাব না।

এবার রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যানভঙ্গ হল, ধমক দিয়ে বললেন, চেঁচিও না, চুপ করে খেয়ে নাও।

বুঝলাম কর্তা-গিন্নীর সংবাদ গুরুতর। সেদিন রাতেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেল।

পদ্মমা সন্ধ্যের সময় খেয়ে-দেয়েই ঘুমুতে যেতেন। কাজেই রাত্রে ছেলেকে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো হত না। নানা খেতেন প্রায় দশটার সময়। কোনদিন আমি আগেই নানীর সঙ্গে খেয়ে নিতাম, কোনদিন বা নানার সঙ্গে। সে রাতে নানী

খেলেন না, রাগের চোটে ভাতগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে রাখলেন যে, আসবার পথে সেগুলো যেন রামেন্দ্রসুন্দরের নজরে পড়ে। যথাসময়ে নানা এলেন এবং সেই ভাতের বেড়াজাল ডিঙিয়ে খুব সন্তর্পণে নিজের আসনে বসেই নির্বিকার চিত্তে ঢাকনা খুলে খেতে লাগলেন।

নানা-নানীর ঝগড়াটা চাক্ষুষ দেখবার জন্যে আমি তখনও জেগেই ছিলাম। কিন্তু সে রকম কিছুই না দেখে আমি বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছি এমন সময় দেখি, নানী ছুটে এসে আমার পাশেই শুয়ে পড়লেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, ভাতগুলো অমন ছিটিয়ে দিলে কেন?

ছোটখাট একটি বকুনি দিয়ে নানী বললেন, তোর ওসবে দরকার কী? তুই ঘুমিয়ে পড়্, কাল সকালে পড়তে হবে না?

নানা গরমের দিনে তোশকের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে শুতেন, আর সেটা শোবার আগে ভিজে তোয়ালে দিয়ে নানী মুছে দিতেন। নানা বারো মাস একটা বড় সাদা নেটের মশারির মধ্যে শুতেন, এর অন্যতম কারণ আরশোলা-ভীতি, বলা যায় না তো, কখন উড়ে এসে গায়ে পড়ে!

একটু পরেই রামেন্দ্রসুন্দর এসে বিছানায় আমার অন্য পাশে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তাঁর নাসিকাগর্জন শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে নানী উঠে বাইরে যেতেই আমি পা টিপে টিপে তাঁর পিছু নিলাম। দেখি, নানী খেতে বসেছেন।

বললাম, কী? তখন যে বড় খেলে না, ভাত ছড়িয়ে দিলে?

নানীর কণ্ঠে রুদ্ধ বেদনার সুর। আপন মনেই বকবক করে বকে যান: যার জন্যে না-খাওয়া, ভাত ছড়িয়ে ফেলা, তার কি সব হুঁশ আছে? নিজের লেখাপড়া নিয়েই মত্ত। সংসারের কোন্ কাজটা চোখ তুলে দেখে?

তার পরই ঝাঁজ দিয়ে বলে উঠলেন, না খেয়ে তো মরতে পারি না!

বেশ, কাল সকালেই আমি পদ্মমার কাছে তোমাদের সব গুণের কথা বলে দেব।

আর ফোঁপরদালালিতে কাজ নেই। যা এখন, তুই শুয়ে পড়। কাউকে কিছু বলতে হবে না।

তা কি হয়? কথাটা পেটের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খায়।

ভোরে উঠেই পদ্মমার কাছে আরজি পেশ করা গেল। তার পরই নানার কাছে।

নানার মুখমণ্ডল মৃদু হাস্যে অনুরঞ্জিত, চোখে ঘনীভূত দৃষ্টি। তার পরই গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আমার 'ক্যাপিটাল পানিশমেণ্ট' ধ্বনিত হয়ে উঠল, যাও, এখুনি মাস্টার আসবে, পড়তে বসো গে।

'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'—শুনলাম এই কথাটি রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে।

বাস্, আর একটা কাজ পাওয়া গেল। ভৃত্য থেকে শুরু করে ভাই বোন মাসী নানা নানী, এমন কি পদ্মমাও বাদ গেলেন না।

একদিন কলেজের কী একটা জরুরী কাজ থাকায় নানা তাড়াতাড়ি খেতে বসেছেন, পদ্মমা কোন বিশেষ তিথি উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন। তখনও ফেরেন নি, কাজেই নানী হাতপাখা নিয়ে সামনে বসে আছেন। আমিও সুযোগ বুঝে, আমার গায়ের রঙের সঙ্গে নানীর গায়ের রঙ মিলিয়ে দেখছি, কে বেশী ফরসা! তা প্রায় একই রকম। ইন্দুপ্রভা দেবী খুব সুন্দরী ছিলেন—ইন্দুর প্রভাই ছিল তাঁর দেহে। বলতে নেই, আমার গায়ের রঙটাও তখন, শিকারের নেশায় দিনরাত বনে জঙ্গলে ঘুরে আজকের মত, এমন বিবর্ণ হয়ে যায় নি। নানার গায়ের রঙের সঙ্গে মেলাবার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও দেখা চাই বই কি! তাঁর বাঁ হাতখানা ধরে টানতেই তিনি চমকে বলে উঠলেন, ওটা আবার কী?

রঙ মেলাব।

হঠাৎ আবার এ খেয়াল জাগল কেন?

তুমিই যে বলেছ—সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। সব দেখা শেষ করেছি, এখন বাকী আছ তুমি। তোমার রঙ তো আর আমার সঙ্গে মেশানো যায় না, তাই গায়ের রঙ মিলিয়ে দেখলাম, আমি আর নানী স্রেফ হারিয়ে দিয়েছি।

নানার উচ্চহাস্য। বললেন, কথাটা যিনি লিখেছেন, তাঁর নাম জান?

না বললে জানব কেমন করে?

রবিবাবুর লেখা। মানে কী জান?

উঁহু। বলে দাও।

এর অর্থ গায়ের রঙ মেলানো নয়, বুঝলে?

তবে কী?

সবার মনে যে সুর অর্থাৎ ভাবধারা, সেই সর্বজনীন সুরের সঙ্গে যেন নিজেকে মেশাতে পারি, যেন আমিও তার যোগ্য হতে পারি—এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু এর মধ্যে রঙ পেলে কোথায় ?

স্বল্পভাষী রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের তারে কে যেন ঝঙ্কার তুলেছে, কী এক আবেশে বিভোর হয়ে তিনি বলে যান, রঙ আছে বই কি ! . প্রকৃতির রঙের খেলায় পৃথিবীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা নিয়ে যেন আমরা সমান তালে পা ফেলে চলতে পারি।

ওরে বাবা, ওই এক লাইনের মধ্যে এত কথা !

সেই জন্যেই তো তিনি এত বড় কবি।

কিন্তু তুমি শক্ত শক্ত কথা বলছ, একটু সহজ করে বল না।

এর মানে, সকলের মধ্যে সহজ সরল হয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হবে।

নানী গালে হাত দিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনছিলেন। মুখ দেখে মনে হল, তাঁরও যে ভাল না লাগছিল তা নয়। তবে স্বামী আহার বন্ধ করে অন্য জগতে চলে গিয়েছেন দেখে তাঁকে সজাগ করে দিলেন : আগে খেয়ে নাও তো, তারপর সাহিত্য-পরিষদে গিয়ে যত খুশি সবার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ো।

নানাও আবার ভোজ্যবস্তুর জগতে ফিরে এলেন। পাতে হাত দিয়ে ভাত ভাঙলেন।

ইংরেজী ১৯০৮ সন। অরবিন্দ ঘোষ ধরা পড়েছেন। কলকাতায় তুমুল আন্দোলন—পথে ঘাটে রকে দাওয়ায় সর্বত্রই চাঞ্চল্য আর চাপা আওয়াজ, চারিদিকেই মৃদু গুঞ্জন। নানার বৈঠকখানা পর্যন্ত বাদ যায় নি। অলিগলিতে সি. আই. ডি. ঘোরঘুরি করে।

খেলার সাথীরাও ফলাও করে আমার কাছে কত রঙ-বেরঙের ফানুস উড়িয়ে দিলে। শুনলাম, বোমা নাকি এমন একটা জিনিস, যা মানুষ ঘর বাড়ি সব এক লহমায় উড়িয়ে দিতে পারে। আর অরবিন্দ ঘোষ নাকি সারা বাংলায় সাহেব-সুবোদের বংশ ধ্বংস করবার জন্যেই সেই বোমা তৈরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। আমার জিদ চেপে গেল, তাঁকে দেখতেই হবে। তিনি তখন হাজতে। আলিপুরে তাঁর বিচার চলছে।

নানার কাছে কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম। কোন ফল হল না। চোখের জল না শুকোতেই পদ্মমার কাছে গিয়ে হাজির। আপীলে আমারই জয় হল।

নানাও তাতে অ-খুশী নন। মনেপ্রাণে তিনিও ঘোর স্বদেশী, কিন্তু বাইরে হৈ-চৈ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। ছেলেপিলেদের তিনি কখনই আশকারা দিতেন না।

হাইকোর্টে পরোয়ানা জারি হতেই তিনি হেসে বললেন, তোমার এ জিদ ভালই বলতে হবে। দেখা যাক, কবে যাওয়া ঘটে ওঠে!

সাত-সাতটা দিন চলে গেল, তবুও যাওয়ার নামগন্ধ নেই। রোজ ভোরে উঠেই নানাকে একবার করে তাগিদ দিয়ে যাই। ইতিমধ্যে তিনি কী বন্দোবস্ত করেছিলেন জানি না, সেই পরমলগ্ন এসে উপস্থিত।

একদিন দুপুরে একটা ছ্যাকৃড়া গাড়ি আমাদের নিয়ে ছুটে চলল আলিপুরের দিকে। পথে তিনি আর একজনকে তুলে নিলেন, তাঁকে চিনতে পারি নি।

আলিপুর কোর্ট লোকে লোকারণ্য। সবারই মুখে যেন একটা জিজ্ঞাসার ছাপ। ভারতবর্ষে সেই প্রথম 'স্টেট ট্রায়াল'। সঙ্গের ভদ্রলোকটি কাকে কী বলার পর রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে নিয়ে এজলাসের মধ্যে ঢুকলেন। পাশের একটা বেঞ্চিতে আমাকে বসিয়ে নিজেও বসে পড়লেন। আমার চোখ তখন ঘুরে বেড়ায়, কোথায় সেই বাঙালী বীর অরবিন্দ ঘোষ?

নানা দেখিয়ে দিলেন।

আমার বিস্ময়স্তব্ধ চোখ দুটি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। হাঁ করে চেয়ে আছি। পলক পর্যন্ত পড়ে না। দেখলাম, শান্ত সমাহিত ভাব, একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, দৃষ্টি কখনও উর্ধ্বে, কখনও নিম্নে—কারও দিকেই চেয়ে নেই, কী যেন একটা উদাসীন ভাব, যেন এ জগতের বাইরে।

তখন কে জানত, যে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে আজ দেখতে এসেছি, তাঁকেই আবার একদিন দেখতে ছুটে যাব সুদূর পণ্ডিচেরীতে—যোগীগুরু শ্রীঅরবিন্দের দর্শনাশায়। কৈশোরের সেই অস্ফুট বিস্ময় আমার পরিণত বয়সের সমর্পণের মধ্যে রূপ নিয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু চেতনার জগতে আমার সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা নিয়ে তিনি যে আশীর্বাদী পত্র দিয়েছেন, সেটা বাঁধিয়ে সযত্নে তুলে রেখেছি।

সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত কতক্ষণ ছিলাম জানি না, রামেন্দ্রসুন্দর একটা ধাক্কা দিতেই চমক ভাঙল।

চল, এবার যেতে হবে।

কি জানি কেন, ফেরবার পথে আমার মুখে আর একটিও কথা নেই। সেটা লক্ষ্য করেই রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, কী দেখলে? কী মনে হল?

উত্তর দেব কী? আমার মন তখনও আলিপুরের সেই বেষ্টনীর মধ্যেই আটকে আছে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি আবার বললেন, বেশ, যা দেখলে, বাড়ি গিয়েই লিখে রাখবে, কাল সকালেই দেখব।

সকালের অপেক্ষা আর করতে হল না, আমি তখুনি গিয়ে কী লিখেছিলাম মনে নেই। কী মন নিয়ে গেলাম, কী দেখলাম আর কী মন নিয়ে ফিরে এলাম—এরই বোধ হয় একটা অসম্বদ্ধ বিবরণ। নানা সেইটে দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে, আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, দুই গালে চুমুও খেলেন, যা তাঁর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এমন কি, সেদিন সন্ধ্যায় সেই লেখা তাঁর দু-চারজন অনুরক্ত বন্ধুদের কাছে পড়ে হাস্যোচ্ছল হয়ে উঠলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রসন্ন মনোভাব দেখে ধরে বসলাম: ডি. এল. রায়ের বাড়ি যাব, তাঁকে একবার দেখব। সবাইকে দেখি, তিনি কেন এখানে আসেন না?

নানার মস্তক আন্দোলিত হয়ে ওঠে। সে অনেক দূর, বলে পাশ কাটাতে চাইলেন।

বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। যিনি "বঙ্গ আমার, জননী আমার" লিখেছেন, যাঁর প্রতি ছত্রে রক্ত-পাগল-করা ছন্দ, যে গান কোরাসে সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে উঠত, যাঁর পরিচয় ছিল আমার কাছে সেদিন শুধু এই গানের রচয়িতা বলে তাঁকেই একবার শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্যে আমার এই উদগ্র বাসনার অচিন্তিত পরিসমাপ্তিতে মনটা কেমন যেন দমে গেল। অনুযোগ করে আবার বলি, তুমি তো আমাকে নিয়ে হাজার বার রবি ঠাকুরের বাড়ি যাও, সেও তো অনেক দূর।

অত কৈফিয়ত নিতে হবে না।

নানার মুখের ভাব দেখে নানী বা পদ্মমার কোর্টে আর নালিশ জানাতে পা বাড়াই নি। তখনকার মত আমার দ্বিজেন্দ্রদর্শন ধামাচাপা রইল।

দুপুরে নানার সঙ্গে বসে খাওয়া, তাঁর সামনে বসে পড়া, রাত্রে তাঁর কাছে শোওয়া, তাই এধার-ওধার কোথাও সরে যাবার কোনও ফাঁক ছিল না—চোখের পলকে হারাই এমনি ভাব।

একদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গেই খেতে বসেছি, সে বড় মজাদার কথা। হঠাৎ দুটো

আরশোলা দু দিক থেকে উড়ে এসে একেবারে নানার গায়ে পড়ল। সামনে একটা বাঘ দেখলে মানুষ যেমন আঁতকে ওঠে, মুক্তকচ্ছ রামেন্দ্রসুন্দর খাওয়া ফেলে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে অস্ফুট ভীতিবিহ্বল ধ্বনি, প্রায় দিগম্বর হবার শামিল। আমিও কী হয়েছে বোঝবার আগেই নানার সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাঁর কোমর ধরে দোদুল্যমান।

হৈ-চৈ করে নানী আরশোলা ধরবার জন্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিলেন। একটা কোথায় উধাও হয়ে গেল, আর একটা নানীর মুঠোর মধ্যে চিঁড়ে-চ্যাপটা। সেদিন নানার হরিমটর। নানী আমার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে এনে আবার খেতে বসালেন।

ব্যাপারটা বুঝে আমার বেদম হাসি পেল। নানীকে বললাম, এত বড় মানুষের ওই একরত্তি আরশোলা দেখে এত ভয়! এমন একটা মোক্ষম দাওয়াই তোমার হাতে থাকতেও কিনা নানা তোমার কথা শোনে না! দাঁড়াও, এবার থেকে তোমার হয়ে আমি নানার ওপর রোজ এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব।

আর্তকণ্ঠে নানীর বোঝানো শুরু হয়ে গেল : লক্ষ্মী ভাই, অমন কাজটি করিস নে, তা হলে তোর নানা পাগল হয়ে যাবে।

সে কথা শোনে কে? বালকের ধর্মই হচ্ছে, বারণ করলে সেই কাজটাই আগে করা। নানাকে বেকায়দায় ফেলবার এমন সস্তা সুযোগ আর বুঝি পাওয়া যাবে না!

পরদিন বিকেলেই আরশোলা-সংগ্রহ-সভা বসে গেল। বেশী খুঁজতে হল না। অমিয়দের ভাঁড়ার-ঘর আরশোলার ডিপো। ঘি, অমিয়, অবনী আর শৈল—সব এক জোট হয়ে বিস্কুটের একটা ছোট বাক্সে আরশোলা বোঝাই করে আমার হাতে দিলে। ঢাকনার ওপর অবনী বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলে : Presented to Ramendra Sunder Tribedi by his friends and admirers.

নানা কলেজ থেকে ফিরে ধড়াচূড়া ছেড়ে সবে তামাক খেতে বসেছেন, বাক্সটা তাঁর হাতে দিয়েই পিটটান।

বেশী দূরে যাই নি, গবাক্ষপথের ফাঁক দিয়ে তাঁর নাজেহাল অবস্থা দেখবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

বাক্সটার এপাশ-ওপাশ চারিদিকে পরীক্ষা করে হালকা মনে হওয়ায় নানা সেটাকে কানের কাছে ঝাঁকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর যেই না ঢাকনা খুলেছেন—গোটা কয়েক আরশোলা তাঁর গায়ে উড়ে বসতেই, আর যায় কোথায়?

স্প্রিংয়ের মত নানা লাফিয়ে উঠলেন, গড়গড়ার নলে আচমকা টান পড়ায় কলকের আগুন ফরাশের চাদরে। একটা চিৎকার করে নানা ছুটে গেলেন অন্দরে, একেবারে নানীর খাসমহলে। পদ্মমা তাঁর রামের চিরাভ্যস্ত কণ্ঠের ব্যতিক্রম শুনে ছুটে আসতেই নানী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, ও কিছু নয়, খোকার দুষ্টুমি— আরশোলা।

পদ্মমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল : ওঃ, তাই বুঝি! ভাবলাম না জানি কী একটা—

তিনি পূজোর ঘরে ঢুকে পড়লেন।

আমি কিন্তু সহজে রেহাই পেলাম না। জোর তদন্ত শুরু হল। নানীর বকুনি খেয়ে ঘি সব কথা ফাঁস করে দিলে। দু তরফা শাস্তির বিধান হল, নানীর কাছে স্বহস্তে কর্ণবিমর্দন আর নানার আদেশে সপ্তাহকাল আমার খেলাধুলো একেবারেই বন্ধ।

পাছে আমার এক ফোঁটা চোখের জলে তাঁর হুকুম নাকচ হয়ে যায়, তাই সটান পদ্মমার কাছে গিয়ে নানা বললেন, এবার যেন তুমি খোকার হয়ে কিছু বলতে এসো না, মা। খেলা বন্ধ করলেই ওর উপযুক্ত শিক্ষা হবে।

আমার পড়াশোনা আর খেলাধুলো নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যখন-তখন যে-সে হুকুম চালিয়ে যেতেন বটে, কিন্তু ঘিয়ের কাছে তাঁর শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাসটা জানিয়ে রাখি।

ঘি তখন সবে প্রথম ভাগ শেষ করে দ্বিতীয় ভাগ ধরেছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাকে শক্ত শক্ত বানান জিজ্ঞেস করেন। ঘি তাঁর কাছে কিছুতেই পড়া দেবে না, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ওঃ, তুমি এসব কবে ভুলে গিয়েছ বাবুদাদা, তোমার কাছে আবার পড়া দেব কী?

রামেন্দ্রসুন্দর যতই বলেন, মনে আছে কিনা, একবার আমাকে পরীক্ষা করেই দেখ না! ঘিয়ের ভীষণ আপত্তি : এসব তুমি ছেলেবেলায় পড়েছ—তোমার মনেও নেই, মনে থাকবার কথাও নয় ; আমি তোমার কাছে পড়ব না, পড়া দেবও না।

এই সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে সে চম্পট দেয়, আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। অগত্যা ঘিয়ের জন্যেও একজন প্রাইভেট মাস্টার রাখা হল।

সময়মাফিক নিয়মিত কাজকর্ম করার জন্যেই ঘড়ির সৃষ্টি। সেই নিয়মটি অনিয়মে নিয়ে এসেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। একদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নানার

বৈঠকখানার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তখন ঘড়িতে বারোটা। মালব্যজী চট করে তাঁর পকেট-ঘড়িটা বের করে দেখেন, তখন সবে দশটা। হেসে নানাকে তিনি হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, এ কী রকম, আপনার ঘড়িটা এত ফাস্ট কেন ?

নানা তেমনি মিষ্টি হেসেই ইংরেজীতে উত্তর দিলেন, দু ঘণ্টা এগিয়ে না রাখলে আমার কলেজের দেরি হয়ে যায়।

আমিও দেখতাম, যখন তিনি লিখতেন বা পড়তেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। ভৃত্য দেও-মারফত নানীর তাগিদ এলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যোগ-বিয়োগের পর নানার একটি মাত্র উত্তর : আচ্ছা, একটু পরে। আবার কখনও বা নিজেই ঘড়ি দেখে চমকে উঠে পড়তেন। আলুথালু কাপড়টা কোমরে ফাঁস দিয়ে বেঁধেই ডাক দিতেন, ওরে দাও, তামাক দাও।

ঝটপট কাকস্নান সারতেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্ন-আহার বেশ ধীরে-সুস্থেই চলত। তারপর এক ছিলিম তামাকে সুখটান দিয়েই সেই চিরন্তনী ছ্যাকড়া গাড়িতে একটার পূর্বে কলেজে প্রস্থান।

নানার এই বারোটা বাজার ব্যাপারে চিরাভ্যস্ত হয়েছিলাম বলে আমাদের চোখ ওঁর ঘড়িটার দিকে ফিরেও তাকাত না। ঘড়ির টিকটিক শব্দ এমন যে বেঠিক, কেইবা আগে জানত ? দেখে বলতে ইচ্ছে করে, তোমারি তুলনা তুমি, হে ঘটিকে !

ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে দেবার সাহস আমার ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে ঘি একেবারে বেপরোয়া। আমাদের কোন জরুরী খেলার প্রোগ্রাম থাকলে সে পড়ার ঘরের টাইমপিস ঘড়ির কাঁটা উলটিয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মাস্টার মশাইয়ের কাছে ছুটি করে নিত, তিনিও আপন পকেট-ওয়াচ দেখে ঠিক পেতেন না কোন্‌টা ঠিক। রামেন্দ্রসুন্দরের ঘড়ি দেখে লাভ নেই—ওটা চিরদিনই সব সময়কে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ঢিমে-তেতালায় চলতেন—তাঁর চলনে ছিল মন্থরতা, কলমে ছিল আগামী দিনের দ্রুত চলার ছন্দ। তারই সাক্ষী হয়ে বুঝি ঘড়িটা এত অসম্ভব ফাস্ট চলেছে !

সাহিত্য-পরিষদের কাজ নিয়ে ত্রিবেদী মহাশয়ের কাছে দৈনিক প্রায় দুটি লোক আসতেন—একজন রামকমল সিংহ আর একজন ব্যোমকেশ মুস্তফী। কখনও

একসঙ্গেই আসতেন, কখনও বা আগে পরে। রামকমলবাবুর হাতে একটা অ্যাটাচি স্যুটকেস—পরিষদ্-সংক্রান্ত কাগজপত্রে ভর্তি। মুস্তফীর হাতেও গোটাকয়েক তালি-দেওয়া ছোট্ট একটি গ্লাডস্টোন ব্যাগ। একদিন মুস্তফী মশায় আমাদের বাড়িতে ঢুকবেন, এমনি সময় পাড়ার নিয়মিত স্কুল-পালানো কয়েকটি অকালপক্ক ছেলে তাঁকে ঘেরাও করে কত কাকুতি-মিনতি, শেষটায় তাঁর ওপর মহাজুলুম লাগিয়ে দিল। উদ্দেশ্য থিয়েটারের পাস আদায় করা। পরে শুনলাম, এঁর পিতৃদেব অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নাকি রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধ অভিনেতা—সেই অপরাধে তাঁর এই বিপত্তি। গোলমাল শুনে রামেন্দ্রসুন্দর জানলায় মুখ বাড়িয়ে ওইসব ঘটনা চাক্ষুষ করেই পার্শ্বে সদা গরুড় পক্ষীর ন্যায় উপবিষ্ট তারাপ্রসন্নকে পাঠিয়ে দিলেন, ওদের কবল থেকে মুস্তফীকে উদ্ধার করবার জন্যে। তার সঙ্গে এটাও বলে দিলেন—ছেলেদের নামধাম ঠিকানা সব জেনে নিয়ে তাদের উদ্ধত আচরণের কথা যেন প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে জানিয়ে আসা হয়।

তারাপ্রসন্নবাবু হয়তো একা তাদের সম্মুখীন হতে সাহস পেলেন না—তাই নীচে গিয়ে 'দাও', দামোদর আর লালগোলার এক ভোজপুরী সেপাই জয়মঙ্গল সিং প্রভৃতি ফৌজ নিয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করতেই সকলে ছত্রভঙ্গ। আমিও মজা দেখবার জন্য 'অক্সিলিয়ারি ফোর্সে'র মত 'সব জনে পশ্চাতে।'

যা হোক, মুস্তফী মশায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে আশ্বস্ত হলেন, ক্ষণকাল পরেই তাঁর বিরস বদন সরস হয়ে উঠল। টানাটানির ফলে রাস্তায়-পড়ে-যাওয়া ব্যাগটি সযত্নে তুলে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসে হাঁফ ছেড়ে ফরাশে বসে পড়লেন।

আমি কিন্তু তারাপ্রসন্নবাবুর প্রত্যাবর্তনের পথে মনে পড়িয়ে দিতে ভুলি নি: নানা যে বললেন, এদের সব নামধাম ঠিকানা জেনে নিতে। কই, কিছুই তো করলেন না—আপনি যে বড় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলেন?

তিনি ঢোক গিলে বললেন, হ্যাঃ, ওসব নিতে গিয়ে ওই ব্যাদড়া ছেলেদের কাছে আমিও মার খেয়ে মরি আর কি! একটু পরেই বড়বাবু ওসব ভুলে যাবেন।

নানাকে বড়বাবু বলেই তারাপ্রসন্নবাবু ডাকতেন। ওপরে ওঠবার সময় তিনি বিড়বিড় করে বললেন, যত সব ছেলেদের বাঁদরামি!

এখানে একটা কথা বলে রাখি, চাকর বামুন ছেলেপিলে—কারও কোন দোষ-ত্রুটি হলেই, কথায় কথায় "বাঁদরামি করে না", "যত সব বাঁদরামি" এই ব্রজবুলিটা তাঁর জিভের ডগায় লেগেই থাকত। পান থেকে চুন খসলেই সেটা নানার কানে

পৌঁছে দিয়ে তবে তাঁর সুনিদ্রা হত। সুতরাং সকলেই তাঁর ওপর হাড়ে-চটা ছিল।

সেদিন আমার ঘাড়ে কেন যে ভূত চাপল জানি না, ফস করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললাম, আচ্ছা, তারাবাবু, সন্ধিবিচ্ছেদ করুন তো আপনার ওই বাঁদরামি।

আর যায় কোথায়! কাঁধের ওপর ভাঁজ-করা চাদরটা কোমরে জড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, বটে! দাঁড়াও এখুনি বড়বাবুকে বলে দিচ্ছি। যত সব বাঁদরামি!

যেমন বলা তেমনি কাজ। তখুনি কথাটি নানার কর্ণগোচর করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

সেদিন নানার মেজাজটা কেমন বিগড়ে ছিল। তার ওপর মুস্তফী মশাইয়ের খেদোক্তি শুনছিলেন: আজকাল ছেলেপিলেদের হল কী? এদের কি বাপ-মা শাসন করে না? পরকাল যে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল! ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর পরই যখন পরম অনুগত তারাপ্রসন্নের কাছে শুনলেন যে, তাঁর ঘরের ছেলেই ওই রকম কথা বলেছে, তিনি একেবারে আগুন হয়ে আমাকে তাড়া করলেন।

কোথায় খোকা, একবার এদিকে এস।

আসামী তখন ওঁর বৈঠকখানার সংলগ্ন বারান্দার এক কোণে। আমাকে দেখেই ছুটে ধরতে এলেন।

প্রাণের দায়ে আমিও রেলিং টপকে এক লাফ। রাস্তায় পড়ে দু-একবার ডিগবাজি খেয়েই ছুটলাম অমিয়-অবনীদের বাড়ি।

নানার চক্ষু চড়কগাছ! ব্যাপার বুঝে তিনি স্বয়ং এসে আমাকে আদর করে ডাকলেন। দ্বিতীয় রিপু তখন তাঁকে বর্জন করেছে। গায়ে হাত বুলিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, গুরুজনদের সঙ্গে কখনও ঠাট্টা করে কথা বলতে নেই।

তোমার সঙ্গেও না? মা যে বলেন, তোমার আর নানীর সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ!

তারাপ্রসন্নবাবু কি আমি? আর ঠাট্টা করলেও কাকে কী ভাবে কথা বলতে হয় সেটাও তো জানা চাই। তোমার নাম ধীরেন, এত অধীর কেন? নামের সঙ্গে কাজেরও মিল থাকা চাই তো!

ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হল না। আহারের সময় দেখলাম, নানীর মুখ বেজায় গম্ভীর, পদ্মমার চোখেও তিরস্কারের চিহ্ন। তাঁদের দিকে চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নিলাম। রামেন্দ্রসুন্দর কিন্তু আমার আজকের বীরত্বকাহিনী সবাইকে

শুনিয়ে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে বললেন, আজকের কাণ্ডটা একটু উঁচুদরের হয়েছে, সন্দেহ নেই, তবে লাফ-ঝাঁপে খোকা চিরদিনই সবাইকে টেক্কা দেয়।

নানীর মুখে বিস্ময়। নানা সেটা লক্ষ্য করেই বলে যান, হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয় নি।

সেবার লালগোলা গিয়েছি। খোকা তখন তার এয়ার গান নিয়ে মত্ত। একদিন আমারই পেটে মেরে দিল একটা কাগজের গুলি। চমকে উঠতেই ও দিলে এক ছুট—একেবারে দেড়-মানুষ উঁচু দেড়তলার বারান্দা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েই পালিয়ে গেল। ওকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বলাই উচিত।

নানীর কণ্ঠে উদ্বেগ: যাই কেন বল না, আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে, কখন কী যে করে বসে তার ঠিক নেই—

রামেন্দ্রসুন্দর কথাটাকে আর বাড়তে দিলেন না, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, ভূমিকম্পের সালে জন্মেছে কিনা, তাই আমাদের হৃৎকম্প করিয়ে ছাড়ে!

কথা-প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ব্যোমকেশ মুস্তফী যখন মারা যান, প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ছিল সাহিত্য-পরিষদ্‌, আর যাঁরা পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও অক্লান্তকর্মা সেবক তাঁদেরও তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞান করতেন। মুস্তফী মশাইয়ের মৃত্যুর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে শোক-সভার আয়োজন হয়েছিল, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে উঠে সেদিন এত বিচলিত হয়ে পড়েন যে, সংজ্ঞাহীন হবার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা "মৃত্যুর পর" থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করার সময় এমন ভাবে কাঁপতে লাগলেন যে, তাঁরও বুঝি শেষ হয়ে যায়! তাঁর মুখে একটি কথা শুনলাম: সাহিত্য-পরিষদ্‌ ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ সাহিত্য-পরিষদ্‌। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলা হয়। মনের ক্ষত অনেক দিন পর্যন্ত শুকোয় নি। খেতে-শুতেও অস্বস্তি, কেবল দীর্ঘশ্বাস আর হাহুতাশ। নানীর কাছে নানাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি: পরিষদের একজন দরদী বন্ধুকে হারালাম, আমার কী দুর্ভাগ্য! শুনতে শুনতে একদিন ইন্দুপ্রভা রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, আমি মরে গেলে তোমার এতটা দুঃখ হবে না তা জানি। শুধু বাইরে নয়, ঘরোয়া জীবনেও নানা সেই একই রামেন্দ্রসুন্দর। নানীর মন্তব্যে তাঁর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না।

অন্তরের অন্তস্তলে যাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন কোনও কথাতেই সেখানে

বিপরীত কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। এই জন্যেই তাঁকে নির্বিকার বলে মনে হত। ষড়রিপুর কোন একটি রিপুরও অধীন ছিলেন না তিনি। তাঁর সম্বন্ধে ঋষি রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই জীবন্ত সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল: "অক্রোধের দ্বারা তুমি ক্রোধকে জয় করিয়াছ—"

সাময়িক ক্রোধের যে স্ফুরণটুকু কখনও কখনও দেখা যেত সেটুকু কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যেই, তদূর্ধ্বে আর কিছু নয়। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেয়েছিলাম: ক্রোধের বশীভূত হলে জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া নিজের শরীরকেও পীড়া দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে ফোঁস করে ভয় দেখালে ক্ষতি নেই—কাউকে কামড়ানো উচিত নয়।

তিনি ছিলেন খাঁটি গুণগ্রাহী; গুণের সমাদর করতে কখনও কার্পণ্য করেন নি—যা আজকাল অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় না। হিংসা তাঁর মনে স্থান পায় নি, লোভ তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। তিনি দলাদলির মধ্যে ছিলেন না বা কখনও গোষ্ঠীপতি হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর দেখি নি—পরস্পরের পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখে নি—সব কিছুর উর্ধ্বে রামেন্দ্র-সুন্দর ছিলেন সর্বদিক দিয়েই সর্বাঙ্গসুন্দর। সাহিত্য-পরিষদ্‌ই ছিল তাঁর চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

তিনি ছিলেন নির্বিকার—নিন্দাস্তুতির বাইরে। একটি ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার কী একটা বাংলা কাগজে কে একজন তাঁর বিরুদ্ধে লিখে-ছিলেন—সেটি দু-তিনবার পড়ার পর নানার বিকারহীন মন্তব্য শোনা গেল:

কী জানি, হয়তো আমার কোনও ত্রুটি আছে, আমি তো বুঝতে পারি না।

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, অজাতশত্রু কথাটি অভিধানেই শুধু পাওয়া যায়—কোনও মানুষের সম্বন্ধে খাটে কিনা জানি না। এমন যে বিদ্যাসাগর, তাঁকেও তো লোকে নিন্দে করতে ছাড়ে নি। সে কথা বলতেই বিদ্যাসাগর নাকি উত্তর দিয়েছিলেন—'কই, আমি তো সে ব্যক্তির কোনো উপকার নি!' তোমার বেলাতেও ঠিক তাই।

রামেন্দ্রসুন্দর আর কিছু বললেন না, শুধু একবার মুচকে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

রামকমল সিংহ দু বেলাই আসতে শুরু করেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের এখন সর্বদাই ব্যস্তভাব। ত্রিবেদী-তাপসের ধ্যানের ধারণা, তাঁর সাধনার ধন যেন ফুলে ফলে রূপায়িত হতে চলেছে। প্রতিভাদীপ্ত

চোখ দুটি কখনও যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে, আবার কখনও দেখেছি পরিষৎ-সংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধানে তাঁর কুঞ্চিত ললাটের রেখাগুলি সুপরিস্ফুট।

কলেজ থেকে বাড়ি না ফিরেই সোজা সাহিত্য-পরিষদে যান, আসেন রাত্রি সাতটা-আটটায়। তাঁর বুকে ডাক দিয়েছে যেন অজানা দেশের এক নূতন প্লাবন, নূতন স্বপ্ন ; ফিরে পেয়েছেন যেন হারানো দিনের নূতন শক্তি, নূতন উদ্দীপনা, নূতন যৌবন। নানার কথামত একদিন তারাবাবুর সঙ্গে কলেজে গিয়ে তাঁর সঙ্গেই সাহিত্য-পরিষদে গেলাম। নানা তারাবাবুকে বলে দিয়েছিলেন, খোকাকে নিয়ে কলেজে এসো, সেখান থেকেই সাহিত্য-পরিষদে যাব। কালই প্রতিষ্ঠার দিন।

তাঁর বড় সাধের এই সাহিত্য-পরিষৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যেন সমগ্র সাহিত্য-রসপিপাসুদের সাগ্রহে আহ্বান করে বলতে চায়, এস, এস আমার বুকে, দীনা বঙ্গ-ভাষাকে নূতন যত্নে, নূতন রত্নে, নূতন ভূষণে সাজিয়ে দাও, আমাকে সার্থক কর, তোমরাও পরিতৃপ্ত হও।

সে সময় পরিষদের দরজার ঠিক সামনেই কর্পোরেশনের রেল-লাইন পাতা ছিল, তার ওপর দিয়ে কলকাতার যত আবর্জনা-বোঝাই খোলা গাড়ি যাতায়াত করত। নানা সেই রেল-লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বুঝি ইট-কাঠে তৈরী সেই নব-নির্মিত নিকেতনের মৌন ভাষা কান পেতে শুনছিলেন। তাঁর চোখে মুখে কত যে ইন্দ্রধনুর সাত রঙের তুলি বুলিয়ে গেল! নানার মুখে আগে যে রঙ দেখা যায় নি, তারই বর্ণচ্ছটা আমার বালক মনেও একটা গভীর রেখাপাত করেছিল সন্দেহ নেই। তিনি সেখানেই একা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামকমল সিংহ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, তারাবাবু, আরও দু-চারজন লোক আমাকে নিয়ে পরিষদের এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে-ফিরে দেখাতে লাগলেন।

দেবদারুপাতায় সাজানো তোরণদ্বার, নীচে-ওপরে দরজা-জানলায় কত বিচিত্র রঙের পর্দা! কে যেন আর একজনকে বলে উঠলেন, আজ যেন নববধূটির বেশ ধারণ করেছে এই পরিষদ্।

নানার কাছে আগেই শিখেছিলাম, পরিষদ্ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। কিছুক্ষণ মাথা দুলিয়ে ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কথাটির মর্মার্থ উপলব্ধি করে বালক হয়েও প্রবীণদের মধ্যে গায়ে-পড়া একটা ডেঁপোমি করে বসলাম।

ফিরে প্রশ্ন করি, তা হলে একে কে বিয়ে করতে আসবে?

বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথের এক টুকরো হাসি ; তারপরেই

মাথা দুলিয়ে কিস্তিবন্দী উত্তর : আর আসবে কী? তোমার নানার সঙ্গেই তো বিয়ে হয়েছে। যাও না, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে এস। একেও দ্বিতীয় পক্ষের নানী বলতে পার।

আমিও ছুটলাম তাঁর কাছে। বাইরে এসে দেখি, তিনি ঠিক সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে কত কী ভাবছেন, জন্মজন্মান্তরের কত-না অকথিত বাণী আজ যেন তাঁর কাছে ভেসে আসে। তাঁর চোখে ঘনিয়ে-আসা কত-না যুগের স্বপ্ন—হয়তো সেই ইট-কাঠের বীণায় তিনি শুনছেন কত নবজীবনের অনাহত ঝঙ্কার—পরিষদের অন্তরালে কোন্ আগামী দিনের স্বকল্পিত মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত দেখে আপন মনেই হেসে উঠেছেন।

অদূরে ইঞ্জিন এসে পড়েছে—ঘন ঘন হুইসিল। রামেন্দ্রসুন্দরের সেদিকে মোটেই হুঁশ নেই। তাঁর ভুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে ধমকে উঠলাম, শীগ্গির সরে দাঁড়াও, গাড়ি এসে পড়ল যে!

রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান ভঙ্গ হল। সেই দুর্গন্ধবাহী ট্রেন চলে যাবার পর তিনি আমার হাত ধরে পরিষদের দিকে এগিয়ে গেলেন। যাবার সময় তাঁকে শাসন করি : আগে বাড়ি চল, তোমার কাণ্ডকারখানা নানীকে আর পদ্মমাকে বলে দিয়ে তোমায় মজা দেখাব।

ভারিক্কী চালে বলি : আমার মতন তোমার সঙ্গেও পথেঘাটে লোকজন দিতে হবে দেখছি!

পরিষদের বিয়ের কথা তখন আর কিছুই বলা হল না, ভেতরে ঢুকেই ভদ্র-লোকদের বললেন, আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, খোকাই আমাকে চাপা-পড়ার দায় থেকে বাঁচিয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস। ভোরেই পূর্ণকুম্ভ নিয়ে গৃহপ্রবেশ হয়েছে। গ্রুপ ফোটো তোলা হল, তাতে পূর্ণকুম্ভ হস্তে ব্যোমকেশ মুস্তফী দণ্ডায়মান। বিকেলে সভা-সমিতি। আজ আর ঘড়ির যোগ-বিয়োগের প্রশ্ন নেই—আজ যেন নানাকে দেখেই ঘড়িকে চলতে হচ্ছে। ভোরে উঠেই পরিষ্কার দাড়ি কামিয়ে নিয়ে পরিষদের গৃহপ্রবেশ করে এসেছেন। তাঁর আচরণে আজ সবই উলটো। পুথিপত্তরের বালাই নেই, বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করছেন আর কখনও বা থমকে দাঁড়িয়ে ভুঁড়িটা রেলিঙের ওপর রেখে নীচে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন, সে চাউনির মধ্যে বিশেষ কোনও অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। রোজ সকালে কত যে লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত

তার সীমাসংখ্যা নেই। তাদের তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলে বিদায় করছেন। আজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসার বালাই নেই। এমন যে রামকমল সিংহ, ব্যোমকেশ মুস্তফী—যাঁরা এলে আর দু ঘণ্টার আগে নড়ার নাম নেই, তাঁরাও পরিষদ্ থেকে নানার সঙ্গেই এসেছেন; কিন্তু আজ বারান্দায় পায়চারি করবার সময়েই কত কী বুঝিয়ে দিয়ে নানা খাড়া পায়েই তাঁদের বিদায় দিলেন। আজ আমারও ছুটি—বেরালের মত তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নানা একবার গিয়ে পদ্মমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন, আবার ভাণ্ডার-ঘরে নানীর কাছে গিয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—সব কিছুই তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম। একবার নীচে গিয়ে রাস্তায় নেমেই আবার উঠে আসেন।

বিকেলে নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ল। ঘণ্টা দুই আগেই নানা আমাকে নিয়ে সেই চিরন্তন কর্কশ-ঘর্ঘরবিঘোষিত ছ্যাকড়া গাড়িতে পরিষদের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বললেন, আজ তোমার ডি. এল. রায় আসবেন, তাঁকে যত পার দেখো। এ কথা শুনে প্রাণটা কেমন যেন আনন্দে নেচে উঠল। তাঁকে বলি, তিনি আসবেন? বেশ, আমাকে চিনিয়ে দিয়ো।

পরিষদে পৌঁছে দেখি, সেই পরিচিত দুটি মূর্তি দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান, এঁরা আর কেউ নন—স্বয়ং রামকমল সিংহ ও ব্যোমকেশ মুস্তফী।

নানার মুখে হাসি ধরে না। কী ছুটোছুটি! চঞ্চলতায় যেন আমাকেও হারিয়ে দিতে চান। আজ যেন তাঁর জীবনে নূতন একটা জোয়ার এসেছে।

একে একে সব এসে পড়লেন—কলকাতার কোন মনীষীই বোধ হয় বাদ পড়েন নি। সেদিন এত বিপুল জনসমাগম হয়েছে যে, স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় সভা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। নীচে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন নিলেন, উপরতলায় সারদাচরণ মিত্র। বলাই বাহুল্য, যেখানে রবীন্দ্রনাথ সেখানেই রামেন্দ্রসুন্দর ঘোরাঘুরি করছেন—মাঝে মাঝে ওপরে গিয়েও একবার দেখে আসছেন। একটা সোফায় রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন, আমি তাঁরই কোলে। হয়তো ওজনে কিঞ্চিৎ ভারী হওয়ার দরুন ক্ষণকাল পরেই আমাকে তাঁর পাশেই বসিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে রইলেন। এমন সময় শুভ্রথানপরিহিত খালি পায়ে কে একজন গৌরবর্ণ উজ্জ্বল পুরুষ টেবিল-অর্গানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চলার পথে দেখলাম, পায়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। ডাইনে বাঁয়ে দুটি বালক কি বালিকা, এখন ঠিক স্মরণে নেই, দু পাশে দাঁড়িয়ে। নানা কোত্থেকে ছুটে এসে আমার কানে কানে বললেন, ওই যে ডি. এল. রায়।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ উজাড় করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথ আমায় সব্যসাচীর মত অব্যর্থ দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বললেন, কাকে দেখছ? দ্বিজুবাবুকে?

তাঁর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললাম, না না, দ্বিজুবাবুকে নয়—ডি. এল. রায়কে। যিনি "বঙ্গ আমার জননী আমার" লিখেছেন—তাঁকেই দেখছি।

ওঃ!—বলেই রবীন্দ্রনাথ নীরব।

কার সামনে কী কথা বলছি, সে বয়সে তখন কি আমার অতটা জ্ঞান ছিল? যা মনকে নাড়া দিত, তাই বলে ফেলতাম।

সাদা আর্ট-পেপারে ছাপা ডি. এল. রায় -রচিত গানের প্যাম্পলেট বিলি হয়ে গেল। আমিও একটা পেলাম।

তিনি গাইতে লাগলেন—

"আজি গো মা তোর চরণে জননী
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান।"

আমার বেশ মনে আছে, নবনির্মিত এই পরিষদ্-ভবনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই এই গানটি রচিত হয়েছিল। দু পাশের সেই ছেলে না মেয়ে দুটিও ডি. এল. রায়ের সঙ্গে কোরাসে গান গেয়ে চলেছে। তাঁর সুরের মাদকতা আমার সেদিনের কচি মনকেও ডুবিয়ে দিয়েছিল। গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কারও দিকে দৃক্‌পাত না করে বা একটু না বসেই সোজা খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলাম, মুখ থেকে বেরিয়ে এল: ওই যাঃ, চলে গেলেন?

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অন্যান্যের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেও আমার ওপর নজর রাখছিলেন, তিনি আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে অদূরে উপবিষ্ট রামেন্দ্রসুন্দরকে ইশারায় ডাকতেই তিনিও তক্ষুনি উঠে এলেন। নানা ঝুঁকে পড়তেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, আপনার দৌহিত্রটি দ্বিজবাবুর স্বদেশী গানের খুব অনুরক্ত দেখছি। ওর কণ্ঠে সঙ্গীত আছে, ওকে আবৃত্তি শেখান।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিনীত হাস্য মুক্তার মত ঝরে পড়ল। তিনি বললেন, মাস্টারের

কাছে আপনার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি ও শিখেছে। কালই আপনার কাছে নিয়ে যাব।

রূপের রাজা, সুরের রাজা রবীন্দ্রনাথের মৃদুহাস্য : বেশ তো, আমি ওকে আবৃত্তির ভঙ্গীটা দেখিয়ে দেব। পরিষদ্-ভবনে সেদিন কত লোক, কত রকমের সব বক্তৃতা দিলেন, কিছুই বুঝি নি। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উঠে বললেন, এখানে সবাই রবিবাবুর গান শুনতে চাইছেন, তিনি গাইলে আমরা সবাই আনন্দিত হব।

রবীন্দ্রনাথও তখুনি চোখ বুজে, খালি গলায় স্বভাবসিদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে গান জুড়ে দিলেন। রজনীকান্ত সেনও সেদিন গান গেয়েছিলেন।

এখনও অনেকেই জীবিত আছেন, যাঁরা পরিষদের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সকলেই যেন জাতীয় জীবনের জাগ্রত চিন্তায় উন্মুখ—অনাগত ভবিষ্যতের আশায় উজ্জ্বল।

সভা ভঙ্গ হল। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান করে সবাই বিদায় নিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় একজনের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে ?

নানা তৎক্ষণাৎ আমাকে সংশোধন করে দিলেন : কারও দিকে অমন আঙুল দেখাতে নেই—অভদ্রতা।

বেশ, আর দেখাব না। বল উনি কে ?

বড় হও, মানুষ হও, সবাইকে জানবে, চিনবে। উনি হচ্ছেন অমৃতলাল বসু।

দেখলাম, স্প্রিংয়ের মত পাক-দেওয়া পাটের মত শুভ্র সুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে নেমে এসেছে। মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকেই তিনি দেখছিলেন।

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

আমার যেন সেদিন কেমন আনমনা ভাব—যেন সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তন নানার দৃষ্টি এড়ায় নি, গাড়িতে উঠতেই তিনি বললেন, আজ যেসব দেখলে আর তোমার যা মনে হল, সব লিখে আমাকে দেখিও, বুঝলে ?

হুঁ, বুঝেছি বইকি, কোনও কিছু দেখলেই যে আমায় লিখতে হবে, সেটা আর না বললেও চলে।

রামেন্দ্রসুন্দর হেসে চুপ করে যান।

পরদিন কলেজ থেকে নানা আসতেই আমার ডাক পড়ল : চল, রবিবাবুর কাছে যেতে হবে। আজ সকালেই বলেছিলাম, "দুই বিঘা জমি", "পুরাতন ভৃত্য" আর

"প্রার্থনাতীত দান"—যা তোমার জানা আছে—সেগুলো ভাল করে পড়ে-রাখবে, হয়েছে তো সব ?

হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তবে একবার তুমি একটা আবৃত্তি করে দেখিয়ে দাও না।

কলেজের ধড়াচূড়া না খুলেই তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন। আমার হাত থেকে কবিতার পুস্তকখানা নিয়ে তুলতে তুলতে তিনি শুরু করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন কিছু একটা আবেগ দিয়ে পড়তেন, তখন অকারান্ত শব্দগুলি প্রায় সবই আকারান্তে পরিণত হত। যেমন নবশতদল কথাটি তাঁর মুখে "নাবা শাতা দাল" শোনাত। এমনি করে তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন। মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললাম, তোমার মত করেই আবৃত্তি করব, না, আমি আমার নিজের মত করে বলব ?

যা তোমার ইচ্ছে।

তখন আর কোনও কথা হল না। তাড়াতাড়ি মুখে কিছু দিয়েই অ্যামেরিকান কপ সাদা সার্ট পরে নানা পাক-দেওয়া চাদরখানা কাঁধের এক দিকে ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর একটি লাঠি নিয়ে তাঁর কলেজ-প্রত্যাগত সেই প্রতীক্ষমাণ ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে বসলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে।

'কথা ও কাহিনী'র পাতায় চোখ বুলিয়ে আমিও ওই তিনটি কবিতা নিজের মনেই হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে চাপা গলায় আবৃত্তি করে যাই। নানাও আমার রিহার্সালে মাঝে মাঝে যোগ দিয়ে চলেছেন—কখনও বা দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিচ্ছেন। এমনি অবস্থায় আমরা জোড়াসাঁকোর বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। নানা আমার হাত ধরে নামালেন। তাঁর কাছে আজ আমার খুব খাতির। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কবিতা আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করে শোনাতে যাচ্ছেন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা—তাই বুঝি আনন্দ ও শুচিতার আলো তাঁর মুখে লুকোচুরি খেলছিল ! তখন কি আর অতশত বুঝতাম !

যাই হোক, শেষটায় নানা নাতি-সমভিব্যাহারে রবীন্দ্র-দরবারে হাজির হলেন। দেখলাম, তাঁর বৈঠকে অনেক নর-নারীর মেলা বসেছে।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রবেশ করেই আভূমি প্রণত হলেন। দেখাদেখি, আমিও তাঁর চরণে মাথা নীচু করবার আগেই তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। কেন যে আমার প্রণাম নিলেন না, তা আজও আমার কাছে রহস্য হয়ে আছে।

আমরা ঢুকতেই বেশীর ভাগ সভাসদ্ বিদায় নিলেন। নানাকে সাদরে আহ্বান

জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ টেবিলের অপর প্রান্তে বসালেন। এ-কথা সে-কথার পর আমার পালা এসে পড়ল।

অপূর্ব স্নেহমাখা চোখ দুটি তুলে রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে চেয়ে বললেন, এবার তোমার আবৃত্তি শুনব।

আমি সটান জুড়ে দিলাম—

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই
আর সবি গেছে ঋণে।"

তারপর একটা—তারপরেও একটা।

তাঁর মুখ দেখে মনে হল, তিনি খুব খুশী হয়েছেন। হয়তো আমার কণ্ঠে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে নানাকে বললেন, কেমন, বলেছিলাম না কাল, কেমন সুরেলা গলাটি! আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি কত আদর করলেন। কোন্ কোন্ স্থানে স্বরের উত্থান-পতন, কোথায় একটু থামা, কোথায় ঝড়ের মত বলে যাওয়া, এবং সেটা কেন, কী তার মানে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

পরম উৎসাহিত রামেন্দ্রসুন্দর আরজি পেশ করলেন: খোকার গলায় আপনার স্বর কেমন বেজে ওঠে, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

তাই না কি? বেশ তো, শোনাও দেখি একটা।

আমিও সাহস পেয়ে, হুবহু রবীন্দ্রনাথের স্বরে আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলাম। শেষ হতেই রবীন্দ্রনাথকে বলি, নানা আপনার পদ্য (তখন কবিতা বলি নি) কেমন করে আবৃত্তি করেন, শুনবেন?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে তাকাতেই নানা আমার দাবি মঞ্জুর করলেন। ঠিক তাঁর মতই দুলতে দুলতে, আকারান্ত শব্দের দোলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমার কণ্ঠে সাকার হয়ে উঠল।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ নামিয়ে চাপা হাসি আর চক্ষু বুজে রবীন্দ্রনাথের অধরে মৃদু হাস্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব আবৃত্তিভঙ্গিমায় তাঁর "বন্দী বীর" পড়ে শোনালেন। আমিও প্রাণ দিয়ে সেই অপরূপ কণ্ঠমাধুর্যের সুধা পান করে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শেষ হতেই বললাম, আমার তো ওটা মুখস্থ নেই। যদি বলেন, বই দেখে এখনই আপনাকে শোনাতে পারি।

দ্বিরুক্তি না করে তিনি কবিতাটি আমার হাতে তুলে দিলেন।

এবার উৎসাহ পেয়ে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে "বন্দী বীর" কবিতাটি আমার নিজস্ব ভঙ্গিমায় আবৃত্তি করে গেলাম। শেষ হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথ আমায় টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কত আশীর্বাদ করলেন। আর রামেন্দ্রসুন্দরকে ডেকে কানে কানে কী যে বললেন, শোনা গেল না। তবে বুঝলাম নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে কিছু না হয়ে যায় না। আমি বড় বড় চোখ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে নানা বললেন, যাও, বাইরে ওই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও, আমি আসছি।

প্রায় পনরো-বিশ মিনিট পরে নানা হাসিভরা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল, আজ যেন তিনি আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

ফেরবার পথে নানা স্বয়ং দোকানে নেমে গরম গরম জিলিপি কিনে ঠোঙা-ভর্তি আমার হাতে দিয়ে বললেন, নাও, পেট ভরে খাও।

তিনি জানতেন, ওই দ্রব্যটি আমার বিশেষ প্রিয়।

তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, সব আমার ? ঘিকে দিতে হবে না ?

রামেন্দ্রসুন্দরের উচ্ছল কণ্ঠ শোনা গেল : না, না, এ সবই তোমার।

স্বয়ং দোকানে গিয়ে মিষ্টান্ন কেনা ইতিপূর্বে আমি তাঁর কখনও দেখি নি।

তবুও ঘিয়ের জন্যে কয়েকটা রেখে বাকিগুলো নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

তখন শুরু হল আমার আবৃত্তির যুগ। রামেন্দ্রসুন্দরের কাজও কিছু বেড়ে গেল। তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। আমিও এ-কবিতা সে-কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গী তালিম নিয়ে আসি। বাড়িতেও সুবিধে পেলেই তার মহড়া চলে। যেন একটা নেশা চেপে গেল। একদিন নানী ঝঙ্কার তুললেন : তোমাদের দুটির জ্বালায় আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি। দু দণ্ড সময় নেই যে তোমার কাছে বসে দুটো কথা বলব !

রামেন্দ্রসুন্দর সলজ্জ হাস্যে উত্তর দিলেন, আহা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে, তুমি বোঝ না কেন ? খোকার গলায় কী যে চমৎকার লাগে !

উৎসাহিত হয়ে বলতে গেলাম : নানাও খুব ভাল আবৃত্তি করে, শুনবে ?

বাধা দিয়ে নানী বলে উঠলেন, থাম তো বাছা, তোমাকে আর দালালি করতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুরুব্বিয়ানার অকালমৃত্যু।

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'—ঘরে যখন সুবিধে নেই, বাইরেই তখন আসর জমাতে হবে। বেছে নিলাম সাহিত্য-পরিষদের নীচের কামরা। ভক্তবৃন্দও বেশ জুটে গেল। ওদের কাছেই চলে আবৃত্তি আর ভাষণের পরিক্রমা। নানা তখন 'মায়াপুরী' নামে কী একটা লিখেছেন। আমিও নীচের ঘরে আমার অনুরক্ত শ্রোতৃবর্গের কাছে হাত-পা নেড়ে নানার ভাষণভঙ্গীর অবিকল অনুকরণে একটা বই থেকে পড়ে যাই। রামকমল সিংহ আপিসে কাজ করছিলেন—তিনি তো আছেনই, তা ছাড়া আরও দু-দশজন পরিষদের লাইব্রেরির পাঠক বই ফেলে আমার বক্তৃতা উপভোগ করতে লাগলেন। কখনও বা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে আবৃত্তি চালাই, কখনও বা অন্যান্য দু একজন মনীষীর বক্তৃতা, গ্রামোফোন-রেকর্ডের মত হুবহু নকল করি। সাহিত্য-পরিষদের নীচের তলায় আমিই সেদিন এক মজাদার বৈঠক বসিয়ে দিলাম। প্রথমটা, রামেন্দ্রসুন্দর তার বিন্দুবিসর্গও টের পান নি; কিন্তু কে একজন আমার কীর্তিকলাপ তাঁর কানে পৌছে দিলে সভা ভঙ্গ হবার পরই, তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। আমার বক্তৃতার কতটুকু তিনি শুনেছিলেন জানি না, কিন্তু এবার তাঁর কণ্ঠ জলদগম্ভীর: বাড়িতে যা কর তা কর, এখানে আর বিদ্যে জাহির কোরো না।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নানার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমি জানতাম, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁরই ভাই। জানবার একটা কারণও ঘটেছিল, যেহেতু নানী তখন প্রায়ই গ্রামোফোনে "তুমি কি রোহিণী" বাজাতেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম: তোর নানার কাছে যে হীরেন দত্ত আসেন, তাঁরই ছোট ভাই অমর দত্তের গলা।

নানা বাড়িতে নেই, আমি প্রাণ খুলে অমর দত্তের ভঙ্গীতে বলে চলেছি, "তুমি কি রোহিণী? পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলাম", এমন সময় হীরেন দত্ত এলেন। আমি তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেই জিজ্ঞেস করলাম, অমর দত্ত আপনার ছোট ভাই? আপনি নিশ্চয়ই তাঁর থিয়েটার দেখেছেন, রেকর্ড শুনেছেন!

স্বভাবগম্ভীর হীরেন্দ্রনাথের উদাসীন উত্তর: না। তার পরই কথার মোড় ফিরিয়ে প্রশ্ন: কিসের আবৃত্তি চলছিল?

শুনবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করে দিলাম: "রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধর্ম, সেই ভ্রমরকে—"

হীরেন্দ্রনাথ উঠে পড়লেন: আচ্ছা, তোমার নানাকে বোলো আমি এসেছিলাম।

মাঝপথে হঠাৎ কী হল, ভেবে পেলাম না।

নানা ফিরে আসতেই বললাম, হীরেন দত্ত এসেছিলেন, তোমায় জানাতে বলেছেন। আমি তাঁকে "তুমি কি রোহিণী"টাও শুনিয়ে দিয়েছি।

নানার চক্ষু কপালে। আমার কর্ণদ্বয়ে মোলায়েম পাক দিয়ে বললেন, কৃতার্থ করেছ, আর কখনও অসভ্যতা করবে না।

অপরাধী জানিল না কিবা দোষ তার। নানীর কাছে নালিশ ঠুকে দিলাম। সব শুনে তিনি যেন আঁতকে উঠলেন : করেছিস কী? ওঁদের কাছে এসব কথা বলতে গেলি কেন?

বাঃ রে, আমি তো আবৃত্তি করেছি শুধু।

তা নয়, থিয়েটার যারা করে, তারা নাকি লোক ভাল নয়, তাদের নকল করতে নেই।

তা আগে বল নি কেন? আচ্ছা, রেকর্ডে যাদের কথা শুনি, তারা সব কে?

নানী একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, এসব ওই বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের শয়নকক্ষে একসঙ্গে বাঁধাই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছিল—নানী মাঝে মাঝে পড়তেন। খেলাধুলো বাদ দিয়ে, একদিন বিকেলে খুব তন্ময় হয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়ছিলাম। পেছন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর এসে হাতের মোটা বইটা কেড়ে নিয়ে বললেন, এসব পড়ে না—উপন্যাস পড়বার সময় এখনও হয় নি। বাধা দিয়ে বলি, নানী ওই যে রেকর্ডখানা বাজান, "তুমি কি রোহিণী" তাঁর কাছেই শুনেছি নাকি এই বইয়ের মধ্যে সব আছে। তাই পড়ে দেখছিলাম, কে রাসবিহারী, কে গোবিন্দলাল আর কে রোহিণী! এটা জানা দরকার।

খুব হয়েছে, আর জেনে কাজ নেই।

মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। এমন জায়গায় বইটা কেড়ে নিলেন, তারপর কী আছে, সেটা জানবার জন্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল। রাগ হল, দুঃখ হল, অভিমান হল। যখন পড়তেই পেলাম না তখন হয় পুড়িয়ে ফেলব, নয়তো বইয়ের পাতাগুলো এমন ছিঁড়ে রাখব যে আর অক্ষরই চেনা যাবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর বইটা নিয়ে তাঁর শোবার ঘরের উঁচু তাকের উপর তুলে রাখলেন। তিনি বেরিয়ে যেতেই আমার প্রক্রিয়া শুরু হল। গ্রন্থাবলীর পাতাগুলো কত রকমে ছিন্নভিন্ন করা যায়, তার একটা নমুনা রেখে দিলাম। আজও সেটা নমুনা হয়েই

জেমো নূতন বাড়িতে রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থাগারে সযত্নে সংরক্ষিত আছে, প্রদর্শনীতে দিলেও লোকে তাকিয়ে দেখবে।

অবসর-মাফিক একদিন নানী বইটা নামিয়ে পড়তে গিয়ে দেখেন—সেটা শুধু আমার নয়—নানীরও অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এমন কুকাণ্ড কে করেছে, নানীরও মস্তিষ্কে এল না। হদিস না পেয়ে নানাকে বইখানা দেখাতেই আমার ডাক পড়ল: কে এমন কষ্ট করে বইয়ের পাতাগুলো ছিঁড়লে, তুমি কিছু জান?

জানব না? আমিই তো করেছি।

অ্যাঁ, হঠাৎ এই সুবুদ্ধিটা হল কেন?

তুমিই তো বলেছ, ও-বই পড়তে নেই।

তাই বলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে?

নয় তো কী? যে বই পড়া যায় না—সেটা ঘরেও রাখতে নেই। হয়তো তোমার নিষেধ সত্ত্বেও লোভ সামলাতে পারব না, আবার হয়তো কোনদিন টেনে পড়তে বসব। তার চেয়ে বরং নানী যা বলেন—ও আপদ দূর করাই ভাল।

হুঁঃ, দেখতে পাচ্ছি, তোমার কোন কাজেই যুক্তির অভাব হয় না। তোমায় বারণ করেছি বলেই কি তোমার নানীও পড়বে না?

কেন আমি কি তোমার পর?

সে কথা নয়। বয়সের একটা ধর্ম আছে। আগে বড় হও, তখন শুধু পড়া নয়, উপন্যাস লিখলেও কোন দোষ হবে না।

আজ আর শাস্তিবিধান হল না, শুধু ন্যায়ের বিধান দিয়েই এ যাত্রায় নানা আমায় মুক্তি দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব। তখন কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। চিরপ্রথানুযায়ী তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো ছিলেন চ্যান্সেলার আর ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন সার্ আশুতোষ। গলা থেকে হাঁটুর নীচে ঝুলে-পড়া কালো রঙের গাউনে ঢাকা রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ-সাজা দেখে আমি হেসে লুটোপুটি খাই। নানা আমায় সঙ্গে নিয়ে সেনেট-হলে একটা ভাল জায়গায় বসিয়ে একজনের জিম্মায় রেখে গেলেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, সবাই নানার মত সাজপোশাক করেছে, কারও কারও গলার দিকটায় লাল-নীল রঙের বাহার।

যাঁর জিম্মায় নানা আমাকে রেখে গেলেন, এটা কী, ওটা কী, এই সব প্রশ্নবাণে

তাঁকে জর্জরিত করে তুললাম। তিনিও যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় সবাই উঠে দাঁড়াল। শুনলাম, চ্যান্সেলার আসছেন। দেখলাম, তাঁর আসার সে কী ভঙ্গী, সে কী সমারোহ, যারা এল মিলিটারী কায়দায় তরোয়ালের ঝনঝন শব্দে যেন সবাইকে সচকিত করে তুলতে চায়। তারপরই হেলতে-দুলতে উত্তর-দক্ষিণে ঘাড় বেঁকিয়ে যিনি এলেন, শুনলাম, তিনিই লর্ড মিণ্টো। তাঁর পেছনেই যিনি, পাশের ভদ্রলোকটি চিনিয়ে দিলেন, তিনিই ভাইস-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কে ভাইস-চ্যান্সেলার তখন আর কী বুঝব? দেখেছিলাম কেবল তাঁর বড় বড় ঝুলে-পড়া এক জোড়া গোঁফ, তখনও তিনি 'নাইট' উপাধি পান নি। তারপরেই বড়লাটের এডিকংবর্গ সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ।

বড়লাট গিয়ে মঞ্চে বসলেন। পাশেই আশুতোষ; আরও সব কে কে যেন বসলেন। নূতন মুখ, নূতন সব মানুষ দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে উঠেছিলাম। নানা কোথায় দেখতে পাচ্ছি না কেন—এই প্রশ্ন করে পাশের লোকটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি।

আশুতোষ বড়লাটকে কী বলতেই তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, লেট দি কনভোকেশন বি ওপেন্‌ড্।

কনভোকেশন আরম্ভ হল। কালো শামলা গায়ে এক-একটি ছাত্রের দল মঞ্চের কাছে যায় আর সাদা কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে আসে। শুনলাম ওরই নাম ডিপ্লোমা। আশুতোষ ইংরেজীতে একই কথা বার বার উচ্চারণ করে কাগজ দেওয়া পর্ব শেষ করলেন। তার পরই শুরু হল তাঁর বক্তৃতা।

আমার দৃষ্টি কিন্তু বরাবর বড়লাটের দিকে। তিনি তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছেন। সামনে যে এতগুলি ব্যাপার ঘটে গেল, তার সঙ্গে যেন তাঁর কোনই সংযোগ নেই। বক্তৃতা শেষ করে আশুতোষ একবার বড়লাটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে কী বলতেই লর্ড মিণ্টো সজাগ হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন, লেট দি কনভোকেশন বি ক্লোজ্‌ড্।

তারপর যে কায়দায় তাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের প্রস্থানেও সেই মিলিটারী কায়দার পুনরাবৃত্তি।

বাঁচা গেল।

অনেকক্ষণ নানাকে না দেখে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে বললাম, উঃ, কতক্ষণ তোমায় দেখি নি, কোথায় ছিলে?

অমন করে না, সবাই দেখতে পাবে।

তাঁর সঙ্গে গিয়ে সেনেটের প্রকাণ্ড বারান্দায় দাঁড়ালাম। কেউ বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে জটলা করছে—এই সব আনন্দের বিচিত্র খেলা দেখছি। এমন সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নানার কাছে এসে আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে?

আশুতোষকে আমি বাড়িতে নানার কাছে আসতে দেখি নি। নানা আমার পরিচয় দিতেই আশুতোষের প্রথম প্রশ্ন: হোয়াট ইস ইওর নেম?

আমি বললাম, মাই নেম ইস ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

আশুতোষ সংশোধন করে দিলেন: শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়ে দিলেন: নামের আগে 'শ্রী' দিয়ে বলতে হয়।

শ্রী কি বিশ্রী কে জানে বাপু! এখন হলে নানাকে বলতাম, নিজের নামের আগে নিজেই শ্রী ব্যবহার করব কেন? দশজনে যদি বলে, তবেই তো তার সার্থকতা। হয়তো এই জন্যেই রূপশ্রী রবীন্দ্রনাথ শেষ দিকটায় নিজের নামের আগে শ্রী কথাটি বর্জন করেছিলেন।

আশুতোষ রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে চলে যেতেই, আবার কে একজনকে দেখতে পেয়ে নানা তাঁর সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে তুললেন। আমার একটু দূরেই গুটি পাঁচেক মহিলা প্রায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তাঁদের চোখে মুখে আজ অফুরন্ত হাসির ঝিলিক। মাথায় শ্লেট ক্যাপ, গায়ে সেই কালো গাউন—সে এক দেখবার মত। গুটি গুটি পা ফেলে আমি তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাঁ করে এর-ওর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছি, নানা আমাকে ডাক দিলেন। কাছে আসতেই বললেন, অমন করে মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকতে নেই, ওটা অসভ্যতা।

দোষই হোক আর গুণই হোক, বাল্যকাল থেকেই আমার কেমন একটা ঝোঁক ছিল, কোনও জিনিস তন্নতন্ন করে না বুঝে আমি নানাকে রেহাই দিতাম না। বাড়ি ফিরেই প্রশ্ন করি, তুমি যে আমায় তখন বকলে, কেন? আমি তো নানীর দিকে, ঝিয়ের দিকে, ঝিদের দিকে কতবার তাকাই, তখন তো অসভ্যতা হয় না, ওদের বেলাতেই বা হবে কেন?

নানা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন, সব কথায়ই 'কিন্তু' 'কেন' করতে নেই, বড় হও তখন বুঝতে পারবে। যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নেই, তাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়।

সেবার ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন। নানা কখনও বিদেশে আনন্দ-ভ্রমণে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পরিষদ্‌ই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা ও সাধনার স্বর্গ। কায়া থাকলেই যেমন ছায়া থাকবেই, আমিও ঠিক তেমনই তাঁর সঙ্গেই আছি।

ভাগলপুরের বর্ধিষ্ণু জমিদার সূর্যবাবুর বাড়িতে নানা আমায় তিন-চার দিনের জন্যে রেখে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে, একটা উঁচু জমির উপর একতলা বাড়ি। আমার ওপর কড়া নজর রাখতে তারাবাবু আর দামোদরকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে কিন্তু পরিষদের অন্যান্য রথীবৃন্দের সঙ্গেই ডেরাডাণ্ডা গাড়লেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে নানা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, কত জনে কত কী সব বক্তৃতা করতেন, কিছুই বুঝতাম না। একজন বক্তা তাঁর ভাষণের সময় সামনের একটা কালো বোর্ডে চক-পেন্সিলে লিখে উপমা দিলেন: কী একটা শব্দ+ ব্রাহ্মণ=গাধা।

এ ধরনের আরও কী সব কথা বলতেই চারিদিকে হুলস্থুল পড়ে গেল। পরে শুনলাম, তিনি জাতিতে কায়স্থ। যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম শরৎচন্দ্র।

অনেকে বেরিয়ে গেলেন, আবার অনেকে হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন—সম্মিলনের অবস্থা কাহিল। নানার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। ভেবে ভেবে তাঁর পেট খারাপ হয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করেছি, রামেন্দ্রসুন্দর যদি কখনও দুর্ভাবনায় পড়তেন, তখনই মুক্তকচ্ছ হয়ে ঘন ঘন যাতায়াতের প্রাবল্য দেখা দিত।

সনাতনপন্থী জন কয়েক গোঁড়া ব্রাহ্মণ একেবারেই বেঁকে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে। রামেন্দ্রসুন্দর ও আরও কতিপয় সাহিত্যরথী করজোড়ে সকলকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বলা সত্ত্বেও ফল হল না। যিনি মূল গায়েন, তাঁর কাছে সবাই ধরনা দেওয়াতে তিনি পরদিনই প্রকাশ্য সভায় তাঁর ভুলত্রুটি স্বীকার করলেন, কাজেই সমস্ত জিনিস সহজ সরল হয়ে গেল। দুশ্চিন্তাকাতর রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ আবার হাস্যসুন্দর হয়ে উঠল।

একদিন ভাগলপুরের গঙ্গায় রামেন্দ্রসুন্দর এবং অন্যান্য মনীষীরা প্রায় সব একসঙ্গেই স্নান করতে নামলেন। তার ফোটো নেওয়া হয়েছিল। সে ছবি এখনও আছে। আমি স্নানের অনুমতি পেলাম না, তাই ঘাটের ওপর থেকেই বাধ্য হয়ে তাঁদের জল-কেলি দেখলাম। রামেন্দ্রসুন্দরের উচ্ছল কলহাস্য বুকে নিয়ে যেন গঙ্গা বয়ে চলেছে। অতগুলি কৃতী সন্তান স্নানপর্ব শেষ করে উপরে উঠে এসে পবিত্র হয়েছিলেন কি না

জানি না—তবে এঁদের বুকে নিয়ে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গাই বুঝি হেসে উঠেছিলেন।

আমি যেখানে ছিলাম, সেই বাড়িতেই বহরমপুরের হরিবাবু নামীয় এক ভদ্রলোক আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর ভাল নাম বনবিহারী সেন—ইংরেজীতে লিখতেন Von Vehari Sen. কী বিপুল মোটা, যেদিকে যেতেন সকলেই তাঁকে হাঁ করে চেয়ে দেখত, গর্দানা ফেরাতে পারতেন না, তাই সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়ে বক্রদৃষ্টিতে মানুষের দিকে তাকিয়ে হাঁসফাঁস করে কথা বলতেন, ফাঁকে ফাঁকে নাক ডেকে উঠত। ঘুমুলেই লোকের নাক ডাকে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় নাসিকাগর্জন ইতিপূর্বে কখনও শুনি নি। তাঁকে কখনও কাত হয়ে শুতে দেখি নি। তিনি যখন মেঝের ওপর পড়ে থাকতেন, বুকটা আড়াই ফুট উঁচু—যেন সাঁওতাল পরগণার একটা ছোটখাট পাহাড়। দেহে অসীম শক্তি, খেতেও পারতেন প্রচুর, ডজন ডজন লুচি, গামলা-ভরা মাংস, সের ওজনের সন্দেশ—সব অক্লেশে উড়িয়ে দিতেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টাক।

সমবয়সীও পেয়ে গিয়েছিলাম, তার নাম নরেন। আর চাই কী? কে কাকে ধরতে পারে এই খেলা নিয়ে আমরা সেদিন মেতে উঠেছি। নরেনকে ধরবার জন্যে তাড়া করতেই সে সামনে ওই পাহাড়ের বাধা দেখে তার পেটের ওপরেই পা দিয়ে পার হয়ে গেল। সঙ্গেই সঙ্গেই একটা 'হোঁক' শব্দ শুনলাম। আমিও থমকে দাঁড়াই নি। একই উপায়ে আমিও পার হয়ে গেলাম।

এ কথাটি নানার কানে উঠতেই আমাদের ডাক পড়ল। নরেনের বড়দা বয়সে প্রবীণ, তিনিও রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বসে কী সব কথা বলছিলেন। প্রথমেই মূল আসামীর সাক্ষ্য শুরু হল। তাকে চেপে ধরে তার দাদা জিজ্ঞাসা করতেই সে ছেদ-হীন কথায় বলে গেল, গঙ্গার বুকে ভাসমান বয়ার দোলন দেখবার জন্যেই নাকি সে ওঁর বুকে ঝাঁপ দিয়েছিল, নইলে আর একটু হলেই ধীরেন যে ধরে ফেলত!

আর কোনও কথাটি না বলে নরেনের দাদা তার কর্ণমর্দন করে বুঝিয়ে দিলেন: আমিও বাধ্য হলাম তোমার মাথার দোলনটা কেমন লাগে, তাই দেখতে।

তার পরই আমার পালা। নানা আমায় জিজ্ঞেস করতেই মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম, নরেন যখন হরিবাবুর পেটের ওপর পা দিয়ে পার হয়ে গেল, আমি দেখতে পাই নি, আমি ঠিক তার পেছনে। হঠাৎ ওঁর পেটে আমার পা পড়তে একটা শব্দ শুনেই থেমে গেলাম। আমি তো হরিবাবুর কাছে তখুনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

আমি যে ইচ্ছে করে কখনও এমন কাজ করতে পারি না, তা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে।

আমার জবানবন্দী শেষ হয়ে গেল। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, বেকসুর খালাস পেলাম।

তিন দিন ধরে সাহিত্য-সম্মিলন বেশ জমজমাট! সুরেশ সমাজপতি পুঁথির সাধু-ভাষায় কবিত্ব মিশিয়ে দরাজ গলায় চমৎকার ভাষণ দিলেন—মাঝে মাঝে এক-একটা দাঁতভাঙ্গা শব্দ ঝন্‌ঝন্‌ করে আমার কানে এসে লাগে। প্রসঙ্গক্রমে কার মস্তিষ্ক চর্বণের কথা উল্লেখ করেছিলেন মনে নেই, কিন্তু তাঁর সেই মন্তব্যে সভাস্থ সকলের হাস্যকলরোল আজও ভুলতে পারি নি। তেমনি আজও মনে পড়ে সেই সভাতেই বাগ্‌দেবীর করুণা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেন ঝরণাধারার মত নাচের ছন্দে নেমে এলো—কী সুন্দর, কী মিষ্টি ভাষা—যেন এস্রাজে ছড়ের কাঁপন দেওয়া কড়ি মধ্যমের টান!

সাহিত্য-সম্মিলনের বিজয়া-অধিবেশন সমাপ্ত। একটা প্রকাণ্ড গ্রুপ ফটো নেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে নিয়ে এসে তাঁর পাশেই বসিয়ে দিলেন। এমন সময় আকারসদৃশ প্রাজ্ঞ সুরেশ সমাজপতি মশাই আমাকে তুলে পাশের চেয়ারে বসিয়ে নিজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কী সব কথা জুড়ে দিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সেই ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণী-পুস্তিকায় ছবিটি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। ফটোতে আমার নম্বর সাত—লাকি সেভেন্‌ কি না জানি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল। যথাপূর্বং ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে আমিও নানার সহযাত্রী। সার্‌ জগদীশ বসু চলেছেন। রাস্তায় কিছুটা জলপথ। নদীর বুক চিরে স্টীমার ছুটে চলেছে। ডেকের উপর খুব দাপাদাপি লাগিয়েছি। আমার হুড়োহুড়ির ঠেলায় কেউ বা শশব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আবার কেউ বা এই প্রাণ-চঞ্চল সজীবতায় কুণ্ঠিত আনন্দ প্রকাশ করছেন।

ঘুরে-ফিরে সার্‌ জগদীশ বসুর কেবিনের কাছে দাঁড়াই। তাঁকে দেখে আমার কেমন জানি খুব ভাল লেগেছিল। তাঁর চোখে একটা জাদু ছিল। নানার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিলাম, উনিই সার্‌ জগদীশ বসু—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। আর একটা কৌতূহলের ব্যাপারও সেখানে ছিল। কেবিনের সামনেই একটা কাঠের টবে কী একটা গাছ কাপড় দিয়ে সযত্নে মোড়া, যেন বোরখা-ঢাকা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। আমি কাপড় সরিয়ে সবেমাত্র একটা পাতায় টান দিয়েছি, সার্‌ জগদীশচন্দ্র

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আমায় বাধা দিয়ে বললেন, গাছের পাতা ছিঁড়ো না খোকা, ওদের ব্যথা লাগে।

গাছের ব্যথা! অবাক হয়ে গেলাম। এমন তো হামেশাই কত ছিঁড়ে ফেলি। ছুটে গেলাম নানার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, গাছ আবার ব্যথা পায় নাকি? সার্ জগদীশ বোস আমায় বললেন। তুমি বুঝিয়ে দাও তো!

রামেন্দ্রসুন্দর তখন তাঁর দলবলের মধ্যে আসর জমিয়েছেন। সংক্ষেপে বললেন, তোমার কান ধরে টানলে তুমি যেমন ব্যথা পাও, পাতা ধরে টানলে ওদেরও তেমনই লাগে।

নানা তো চমৎকার বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু আমার মনের খটকা গেল না। আমার তো প্রাণ আছে, গাছেরও আছে নাকি? কী ভৌতিক কাণ্ড রে বাবা!

ময়মনসিংহ পৌঁছে নানা আমাকে মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর প্রাসাদে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জিম্মায় রেখে সাহিত্য-সম্মিলনের ধুরন্ধরদের সঙ্গে উধাও হলেন।

একা একা আমার তো খাবি খাওয়ার অবস্থা। ভাগলপুরে সমবয়সী নরেনকে পেয়েছিলাম। এখানে সঙ্গী হলেন মহারাজা সূর্যকান্ত, কখনও বা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। আমার মুখে টুঁ শব্দটি নেই—একবার এঁর মুখের দিকে তাকাই আরবার ওঁর মুখের দিকে। যদিও আমার ধূমকেতু তারাপ্রসন্ন খবরদারি করবার জন্যে সেখানেই অধিষ্ঠান করছিলেন, তবুও সেই ভোরে একবার উঁকি দিয়ে কোথায় যে তাঁর অন্তর্ধান হত সারা দিনেও আর পাত্তা পাওয়া যেত না।

যাই হোক, মহারাজা সূর্যকান্ত আমাকে আদর করে কাছে বসিয়ে কত শিকারের গল্প বললেন। সেই সব কাহিনী শুধু শোনা নয়, আমি যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করলাম। তাঁর বাড়িতে কত জীব-জানোয়ারের ট্যান-করা চামড়া, স্টাফ-করা বাঘ-ভল্লুকের মাথা টাঙানো রয়েছে। আমার চোখ দুটো সেগুলিতেই আটকা পড়ে যেত। তিনি নিজে প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। আমার এই সব দিকে ঝোঁক দেখে সম্মিলনের পর আমায় নিয়ে একদিন শিকার দেখিয়ে আনবেন—এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কিন্তু নানার প্রবল আপত্তি—অনুমতি পাওয়া গেল না, তাই শিকার দেখা তখন কার্যকরী হয়ে ওঠে নি।

নানা ডেকে পাঠালেন, চল, একটা মজার জায়গায় নিয়ে যাব।

সন্ধ্যায় এক অন্ধকার জনসভায় ঢুকলাম। গিয়ে দেখি, আচার্য জগদীশচন্দ্র

উদ্ভিদের জীবন আর মৃত্যুর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিছুই বুঝি নি, কেবল দেখলাম, গাছের প্রাণ থাকলে কী সতেজ ও সাবলীল, আর মরে গেলে কী রকম মাথা নীচু করে লুটিয়ে পড়ে।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এখানে এসেও সেদিনকার সেই বিবরণী লিপিবদ্ধ না করে রেহাই পেলাম না। সবটা না বুঝেই আমার লিখিত সেই কতকটা আংশিক অসংবদ্ধ কথাসমষ্টির প্রলাপ দেখে রামেন্দ্রসুন্দর হেসেছিলেন—মুখ দেখে মনে হল তিনি নিতান্ত অখুশী হন নি এবং শেষ পর্যন্ত সেটা সার্ জগদীশচন্দ্রকে দেখিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন।

ময়মনসিংহের মহারাজার "ক্যাসল"টি বেশ সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরে ধূসর পাহাড় দেখা যায়। অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ জলরেখা। ক্যাসলের সুপ্রশস্ত বারান্দায় বসে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর দুজন সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমিও গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার দিকে তাকিয়ে মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, অঙ্ক কোন্‌টা তোমার বেশী ভাল লাগে?

উত্তর দিলাম, সব কটাই, কেবল শেষেরটা বাদ দিয়ে।

মহারাজার মুখে সবিস্ময় প্রশ্ন: বল কি? ত্রিবেদী মশাইর নাতি তুমি, অঙ্কে ভয় থাকলে চলবে কেন?

একজন সেক্রেটারি বোধ হয় রসিকতা করেই বললেন, অঙ্কে মাথা নেই বুঝি?

উত্তর দিলাম, আজ্ঞে, যা বলেছেন, ওটা আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

মহারাজা ওই অঙ্ক নিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, বল তো, লিখে নয়—মুখে মুখে, আমার সম্পত্তির আয় যদি এত টাকা হয় আর যদি এত টাকা ব্যয় করি, তা হলে কী হবে?

কী বিভ্রাট! একেবারে পাঁচ ঘরের বিয়োগ? আমারও যে বুদ্ধিবিয়োগ হওয়ার উপক্রম! সেদিন আমার চন্দ্রশুদ্ধি ছিল কি না জানি না, বহু কষ্টে মনে মনে হাত-পায়ের বিশ আঙুল গুনে হিসেব করে ঠিক উত্তরটাই দিয়ে ফেললাম।

এত টাকা দেনার দায়ে পড়তে হবে।

মহারাজার মন্তব্য: এই ঠিক আমার মত, না?

তারপরেই তাঁর কড়ে আঙুল থেকে বেশ বড় একখানা কমলহীরে-বসানো আংটি খুলে আমার মাঝের আঙুলে পরিয়ে দিলেন : এটা নাও, তোমায় দিলাম।

আমি কী করব? কিছুতেই নেব না। সেক্রেটারিদ্বয়ের মধ্যে একজনের বোঝানো শেষ হলে অপরের পালা শুরু হয়।

মহারাজাও আংটি নেবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি শুরু করতেই একজন সেক্রেটারি আমাকে উঠিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে কী ভাল কথাই না বোঝাতে লাগলেন : ইংলিশ-কাট স্পট্‌লেস কমলহীরে—পনর-ষোল হাজার টাকা দামের কম নয়, কেমন নীল আভা, দেখেছ? গুরুজনের কথা শুনতে হয়। 'না' বলতে নেই।

আমার অবিচলিত কণ্ঠ : লাখ টাকা হলেও নেব না।

তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে উপদেশ দিলেন, আচ্ছা, তুমি মহারাজার কাছে এখন ওটা নাও, পরে না হয় আমাকে দিয়ে দিয়ো, আর আমাকে যে দিয়েছ, সে কথাটা যেন কাউকে বলে দিয়ো না, বুঝলে লক্ষ্মীটি!

ছানাবড়ার মত চোখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি, তিনি আমায় ঠ্যালা দিয়ে বললেন, কই, কিছু বললে না তো?

এমন সময় রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আসরে অবতীর্ণ হলেন।

প্রমাদ গনলাম। গুরুজনের কথা শুনি নি, এঁরা যদি বলে দেন? না জানি ভাগ্যে কী আছে!

রামেন্দ্রসুন্দর আসতেই আমি ছুটে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম করে বসতে বললেন।

মহারাজার অন্তরে নানার জন্যে একটা বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল। প্রকৃতপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি পদক্ষেপে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত যে, কেউ একবার তাঁর সংস্পর্শে এলে আর তাঁর কাছে মাথা না নামিয়ে পারত না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহিমচন্দ্রকে বহুদিন ধরেই রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষণাধীনে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় কই? শেষটায় বহু অনুরোধ-উপরোধ, বহু সুপারিশের ফলে নানা রাজী হয়ে কিছুদিন মহিমচন্দ্রকে 'প্রাইভেট' পড়িয়েছিলেন।

মহারাজা ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, দেব-দ্বিজে অচলা ভক্তি, 'তৃণাদপি সুনীচেন'—এই ছিল তাঁর আদর্শ। আমি দেখেছি, আমার ঠাকুরদা ও বাবার পা ছুঁয়ে তিনি প্রণাম করতেন। কিন্তু আমার মত বালকের পায়ের ধুলো নিতে এলেই আমি পালিয়ে যেতাম।

রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। এবার দুই বৈষ্ণবে ভাব-বিনিময় শুরু হয়ে গেল। নানা একথা-সেকথার পর আমার দিকে ফিরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী? শান্তশিষ্ট হয়ে আছ তো?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই মহারাজা আমার পক্ষ সমর্থন করে বললেন, না, কিছু করে নি, খুব ভাল ছেলে।

যিনি আমায় আংটিটা নিতে বলছিলেন, তিনি কিছু বলবার আগেই অপর সেক্রেটারি আমার সম্ভ আংটি-প্রত্যাখানের ইতিহাস নানার কানে সবিস্তারে পৌঁছে দিলেন।

আমি সাফাই গাইলাম: তুমিই তো বলেছিলে কারও কাছে কোনও জিনিস চাইতে নেই, কেউ কিছু দিলেও নিতে নেই, ওতে দিন দিন লোভ বেড়ে যায়।

দেখলাম, দুনিয়ায় যত আনন্দ আছে, সব যেন নানার চোখে জমাট—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দিকে ফিরে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রথম আমার সামনে তারিফ করে বললেন, বেশ বুদ্ধিমান, কোন কথা একবার শুনলে আর ভুল হয় না, তবে বড় চঞ্চল। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে, হঠাৎ মাথায় পোকা কামড়ে ওঠে, তখনি, বাস্ এক দৌড়, খানিকটা ছুটোছুটি করে পড়তে বসে।

নানার জনৈক বন্ধু বললেন, আহা, তা করুক, ছেলেমানুষ। রোগা প্যানপেনে চোখে-জলপড়া ছেলের চাইতে একটু প্রাণচঞ্চল হওয়া ভাল, আমাদের মত ওরা কি আর জবুথবু হয়ে বসে থাকে, না থাকতে পারে?

নানা সহাস্যে আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, কী, এবার বেশ মনের মত কথা হয়েছে, না?

চুপ করেই ছিলাম। মনে মনে অবশ্য বললাম, নিশ্চয়ই।

আমার প্রশংসার আবহাওয়া তখন বেশ জমজমাট। সুর কেটে দিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। বললেন, ত্রিবেদী মশায়, আপনি তো আমার জিম্মায় দিয়ে গেলেন। ছেলে দিনে বেশ ভাল, রাত্রে কিন্তু আমার পাশের খাটে ওর তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। ঘুমের ঘোরে মাথায় বালিশ ঠিক থাকে না, পাশের বালিশ পড়ে যায়, গায়ের চাদর কোমরে জড়িয়ে থাকে। আলো জেলে আমি সব গুছিয়ে দিই। আবার কিছু পরেই দেখি, যে-কে-সেই! নানা আফসোসের সুরে বললেন, তা হলে তো আপনার বড্ড কষ্ট হয়, সারারাত ঘুম হয় না!

আমার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা ছেলে যা হোক, ঘুমের ঘোরেও দুষ্টুমি!

মহারাজা সবিনয়ে বললেন, আহা, না না, ছেলেপিলেরা ওরকম করেই থাকে।

বলাই বাহুল্য, কলকাতায় ফিরে এলে, চিরাচরিত নিয়মে ময়মনসিংহে কী দেখলাম, কী মনে হল, কী বুঝলাম—সব কথা লিখে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখাতে হল।

তখন আমার তর্জমার যুগ চলেছে। বাংলা থেকে ইংরেজী, আবার সেই ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ করে মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হত। এই ডবল মেথড ট্রানস্লেশন আমার নিজেরও খুব ভাল লাগত। ইংরেজী কোনও শব্দের অর্থ জানা না থাকলে, স্বয়ং অভিধান খুলে জুৎসই অর্থ বের করে তবে অনুবাদ করতাম। এই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের আদেশ। আর যে অংশটুকু তর্জমা করতে হবে তা তিনি স্বয়ং দাগ দিয়ে দিতেন।

শীতলচন্দ্র রায় ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠ জামাতা। তাঁকেও বাধ্য হয়ে বারো মাসই আমাদের বাড়িতে থাকতে হত। কারণ গিরিজা মাসীকে নানী কাছাছাড়া করতেন না।

কথায় আছে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। একদিন শীতলচন্দ্র রায় তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সামনে গিয়েই বলি, শীতল—কোল্ড্, চন্দ্র—মুন, রায়—জাজ্‌মেণ্ট অর্থাৎ কোল্ড্ মুন জাজ্‌মেণ্ট। আজ থেকে ওই নামেই ডাকব, কী বলেন মেসোমশাই?

তিনি থমকে হয়তো একটু ভেবে নিলেন, তার পরই বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে তো! আচ্ছা, এঁর নাম ভূতনাথ প্রধান, তর্জমাটা কী হবে বল তো?

উত্তরটাও রেডি-মেড: কেন? ঘোস্ট হাস্‌ব্যাণ্ড্ চীফ। মনে করেছিলাম, আমার এই মুরুব্বিয়ানায় সবাই খুশী হয়ে লোকজন ডেকে আমার বুদ্ধির তারিফ করবেন। ওমা, এ যে উল্টো বুঝলি রাম! যাঁদের বললাম, তাঁরা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তারাপ্রসন্নবাবুর আর তর সইল না। ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে তিনি আমার জ্যাঠামির নমুনা তাঁর বড়বাবুর কাছে পৌঁছে দিতেই নানার ঘর-ফাটা হাসি শোনা গেল।

তারাবাবু ছিলেন আমাদের বাড়ির রয়টার, কোন টুকিটাকি খবর পেলেই অবসর-মাফিক রামেন্দ্রসুন্দর বা ইন্দুপ্রভা দেবীর কানে টুনটুন করে বলাই ছিল তাঁর কাজ। নানা শুনেও শুনতেন না, তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তান্বেষী মন কোন্ বিজ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করত কে জানে, খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চমক-ভাঙা সুরে হঠাৎ বলে বসতেন, অ্যাঃ, কী সব বকে যাচ্ছে? কিছুই বুঝলাম না।

সেদিন আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তলব পড়ল না। বুঝলাম, ভয় নেই।

পরদিন আমরা একটা কুকাণ্ড করে বসলাম।

বৈকালে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ফেরিওয়ালা অবাকজলপান ঘুগনিদানা, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না—প্রভৃতি রঙ-বেরঙের চটকদার বুলি আউড়ে পথ চলত। বাল্যকালে অবাকজলপান খেতে খুবই ভালবাসতাম। কিন্তু নানার বারণ ছিল, রাস্তার কোন খাবার যেন পেটে না যায়। তাই নানী প্রায়ই স্বহস্তে অবাকজলপান তৈরি করে দিতেন। অবাক না হলেও শুধু জলপানই চলত। রাস্তায় শালপাতার ঠোঙায় ঠাসা অবাকজলপানের স্বাদ আমাদের কাছে যেমন সুস্বাদু লাগত, ঘরের তৈরী হাজার ভাল হলেও তেমনটি যেন পেতাম না। আমার মাসতুতো বোন ঘি এ বিষয়ে প্রধান পাণ্ডা। অমিয়, অবনী ও শৈল সকলেই অবাকজলপানের খুব ভক্ত ছিল। বৈকালে খেলতে আসবার সময় তারা আমার জন্য অবাকজলপান কিনে পকেট ভর্তি করে লুকিয়ে নিয়ে আসত। একদিন নানী পকেটে-ঝুলে-পড়া ঠোঙার মাথাটা দেখেই বামাল সমেত অবনীকে পাকড়াও করে নানার কাছে হাজির করলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আদেশ হল, ওরা যখন খেলতে আসবে, তখন দারোয়ান জয়মঙ্গল সিং আর দামোদর ওদের পকেট কোমর সব তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশের পর তবে যেন আসতে দেয়।

নানীকে বলে দিলেন, অমিয়-অবনীর মাকেও যেন এ খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়, ওইরকম গর্হিত কাজ তারা যেন আর না করে।

মনে মনে ভাবলাম, তাদের আর দোষ কী? আমার জন্যেই বেচারীদের এই দুর্নাম! একটু দুঃখ হল বইকি! আবার বন্ধুত্বের গর্বে বুক যে না ফুলে উঠল, তাও নয়। এর পর নানা দুজন সি. আই. ডি. আমার পেছনে লাগিয়ে দিলেন। জয়মঙ্গল সিং আর দামোদর—পাড়ার লোকেরা নাম দিয়েছিল, বুলডগ আর ফক্স টেরিয়ার। ফক্স টেরিয়ারই বটে—দামোদর আমায় মানুষ করেছিল কিনা। তাই কী রকম খ্যাঁক খ্যাঁক করে কর্তব্য পালন করতে হয়, হাড়ে হাড়ে আমায় বুঝিয়ে দিত। বুলডগের কথা আর কী বলব? কারণে অকারণে এমন গুরুগম্ভীর নিনাদ তুলত যে পাড়ার ছেলেদের ত্রাহি ত্রাহি ডাক।

নানা ওদের স্পষ্টই বলে দিলেন, ফিরিওয়ালা আওয়াজ দিলেই তারা যেন সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে গলি পেরিয়ে যায়। অবাকজলপান খেয়ে আমার একবার কলেরার মত হয়েছিল, তাই বুঝি এই কঠোর অনুশাসন।

মস্তিষ্কের উর্বরতা আমাদেরও কম ছিল না। ঘি পরামর্শ দিল : অমিয়দাকে বলে দাও যেন ফেরিওয়ালার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে নেয়। রোজ ঠিক পাঁচটার সময় যথাসময়ে সে হাঁক দিয়ে রাস্তা পার হয়ে যাবে, আমাদের গার্জেন সি. আই. ডিরাও নিশ্চিন্ত হয়ে আপন আপন কোটরে ঢুকে যাবার পর ফিরিওয়ালা ঘুরে এসেই আমাদের বাড়ির পাশের ছোট গলিতে দোতলার জানলার ঠিক নীচেই দাঁড়াবে। আমরা ডাক শুনেই সব তৈরী হয়ে থাকব। সে এলেই আমরা থলিতে পয়সা রেখে দড়ি ঝুলিয়ে নীচে নামিয়ে দেব, তার মধ্যে সে অবাকজলপান দিলেই আমরা টেনে ওপরে তুলে নেব।

সচিৎকারে বললাম, সাবাস ঘি সাবাস, মাথায় সত্যিই তোর ঘি আছে।

সর্বান্তঃকরণে প্রস্তাবটি আমাদের গোপন বৈঠকে গৃহীত হল। সোৎসাহে অমিয় বলল, আমি সব বন্দোবস্ত করে দোব'খন, কিছু ভয় নেই।

তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ভয় নেই বুঝলাম, ভরসাও যে পাই না।

এক্ষুনি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি।—বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফিরিওয়ালার একটা গুণ ছিল, সে ঠিক পাঁচটায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেত। তার চিৎকার শুনলেই আর সময় দেখবার প্রয়োজন হত না। চিরন্তন প্রথানুযায়ী রামেন্দ্রসুন্দরের ঘড়িতে ঠিক তখন সাতটা।

সেদিনটা অবশ্য অবনীই চালিয়ে দিল। তার পকেটে চার পয়সা ছিল, তাতেই পাঁচ ঠোঙা অবাকজলপান পাওয়া গেল। কিন্তু তারপর? কাল? কাজেই সর্বদা পয়সার ফিকিরে থাকি, কখনও বা কারও পাকা চুল তুলে, কখনও বা পদ্মমার পা টিপে, কখনও নানীর কাছে আবদার করে, কখনও 'কোল্ড্ মুন জাজ্‌মেণ্ট' অর্থাৎ শীতলচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে, কখনও বা উমাপতিবাবুর কাছে পয়সা চেয়ে নিতাম। অভাবে স্বভাব নষ্ট—এমন কি, জমাদার জয়মঙ্গল সিংয়ের কাছে ভিক্ষে চাইতেও কসুর করি নি। তবে সব সময়েই সতর্ক থাকতাম, যেন আমার এই পয়সা-সংগ্রহের ব্যাপারটা নানা বা তাঁর 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' তারাপ্রসন্নর কর্ণগোচর না হয়। তারাবাবু সর্বদাই দু হাতের ওপর ভর করে রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে চেয়ে ফরাশে বসে থাকতেন, ঠিক যেন গ্রামোফোন কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

অবাকজলপানের ভাগীদার আমরা পাঁচজন। তাই অবনী সেদিন আমার মুখের সামনে হাতের পাঁচ আঙুল ঘুরিয়ে বলতে শুরু করেছে :

আমরা পাঁচটি ইয়ার দাদ্ধা ;
আমরা পাঁচটি ইয়ার—

অবনীকে জিজ্ঞেস করি, ওটা কার লেখা রে ?

আরে যাঃ, তাও জানিস নে ? এটা যে ডি. এল. রায়ের।

তবে দেখে নে ডি. এল. রায়ের কেরামতিটা ! তার সঙ্গে আরও দুটো লাইন জুড়ে দিস ঃ

অমিয় অবনী ঘি ও শৈল ধীরেন সবার ডিয়ার।
অধিকন্তু তারাপ্রসন্ন মোদের ওভারসীয়ার।

অমিয়ের একটানা খিকখিক হাসি, বলল, বাঃ, ধীরেন তো বেশ মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে ! যাই, একবার শৈলকে ডেকে এনে শুনিয়ে দিই।

শুধু তোর বোনকে নয়, ঘিকেও ডেকে আন্। আমি নানার কাছে চললাম।

নূতন যে-কোনও কথাই হোক না কেন, নানাকে না জানিয়ে স্বস্তি পেতাম না।

গিয়ে দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে চায়ের পেয়ালা। তিনি অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মশায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম চুমুক দেবার নাম নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরকে সচেতন করে বলি, চা জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল যে, খেয়ে নাও।

নানা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, মুখে লাগিয়ে দেখেন একেবারে বরফ। ফরাশে কাপটি নামিয়ে রাখলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর চা পান করতেন না, তাঁর কাছে থেকে আমারও সে অভ্যাস হয় নি, আজ পর্যন্ত আমি ও-রসে বঞ্চিত। এখন অবশ্য দেখি, বাংলার ঘরে ঘরে সেটা জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যাভূষণ মশাই উঠে যেতেই নানাকে জেরা করি, তুমি তো চা খাও না, তবে আজ কেন ?

জানি, তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। বড় সর্দি লেগেছে, তাই তোমার নানী আদার রস দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খাওয়া তো খুব হল, যাই, নানীকে আর এক কাপ গরম গরম চা আনতে বলি। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তোমায় খাইয়ে দিয়ে যাবেন। নইলে আবার ঠাণ্ডা হবে।

রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য ঃ আর নানীকে কেন ? তোমার মত কড়া গার্জেন থাকলেই চলবে।

যার জন্যে এসেছিলাম, সেটা আর বলা হল না।

অবাকজলপানের কথা বলছিলাম। পয়সা যোগাড় করা সহজ নয়, তবু যার

যেদিন পালা, তাকে যেমন করেই হোক এক আনা পয়সা যোগাড় করে রাখতেই হবে।

অবনী খুব ভেবেচিন্তে হিসেব করে বললে, আমরা এক বাড়িতে তিনজন, আমাদের ঘাড়েই চাপটা বেশী হয়ে গেল। তা যাক, আমরা দুজন না-হয় জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে কোনরকমে বন্দোবস্ত করে নেব, কিন্তু শৈল ?

জবাবটা ঘিয়ের জিভের ডগায়।

সে তার বাবার কাছে চেয়ে নেবে, তার জন্যে ভাবতে হবে না—না না, আর তোমরা বাগড়া দিয়ো না, এই ঠিক রইল, মেলাই বুকনি দিলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

যাই হোক, মধু গুপ্ত লেনের মোড়ের মাথায় আমাদের গুপ্তচর অমিয় চটপট খরগোশের মত ছুটে গেল। ফিরিওয়ালাকে ভাল করে সমঝে দিয়ে ফিরে আসতেই জয়মঙ্গল সিং আর দামোদর তার সব-কিছু পরীক্ষা করে ভেতরে ঢোকবার ছাড়পত্র দিলে। অমিয় এসেই খুব বাহাদুরি দেখিয়ে বলল, সব ঠিক করে এসেছি, সে নাকি আমাদের হালচালের কিছু খবর রাখে, তাকে জয়মঙ্গল সিং সাবধান করে দিয়েছে যেন সে আমাদের বাড়ির কাউকে অবাকজলপান বিক্রি না করে। আমাকে সাহস দিয়ে সে কী বললে জান ?—আমি পুইসা পাইলে বিক্রি করবু না কেনে ? ওই শোন তার নাকীসুরের ডাক।

আমরা পাঁচজনেই উঠে গোয়েন্দা যুগলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করলাম। দুজনেই এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। ফিরিওয়ালা যাবার পরই তারা আপন আপন আস্তানায় ঢুকে পড়ল। ফিরিওয়ালাও চুপ করে ফিরে এসেই পাশের গলিতে ঢুকে একটা জানলার নীচে দাঁড়িয়ে উপরে চেয়ে দেখল। আমরা নির্বিবাদে কুয়ো থেকে জল তোলার মত দড়ি নামিয়ে অবাকজলপান তুলে নিলাম। সেও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

চারদিন চোরের একদিন সাজা। ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন হাত চালিয়ে থলে-ভর্তি অবাকজলপান যখন টেনে তুলছি, সেই ফিরিওয়ালার পাশেই দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের নীল চক্ষু আমাদের দ্বিতলের জানলা-ভরা পঞ্চমুণ্ডির ওপর বুলিয়ে গেল। ফিরিওয়ালা কখনও রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখে নি, তাই পা টিপে আসতে দেখেও সে কিছু সন্দেহ করে নি।

দামোদর ও জয়মঙ্গল সিংয়ের 'গেট অব ফায়ার' যদিও পার হয়েছিলাম, এবার পড়ে গেলাম একেবারে 'গেট অব থাণ্ডারবোল্ট'-এর সামনে।

ঘাটে মড়া পুড়িয়ে আসার মত তখন আমাদের মনের অবস্থা। গুরুগম্ভীর রামেন্দ্রসুন্দর ঊর্ধ্বমুখী হয়েই বজ্রনির্ঘোষে প্রশ্ন করেন, কটা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে দিলাম।

ওপরে আমার বৈঠকখানায় তোমরা সবাই এস।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। আজ বুঝি কারও নিস্তার নেই। পরস্পরের মুখ দেখে ফিসফিস করে বললাম, উনি তো এ গলিতে কখনও পা দেন নি, কে আমাদের এমন শত্রুতা করলে?

আমরা সব মাথা নীচু করে নানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি সর্বাগ্রে শালপাতার পাঁচটা ঠোঙা নানার সামনে রেখে আত্মসমর্পণ করলাম। তাঁকে ওই সব দিতে আমার যে কতখানি কষ্ট হয়েছিল, তা আর কী বলব! রামেন্দ্রসুন্দর সবারই মুখ-চোখ ভাল করে দেখে নিলেন। প্রথমেই আমার জেরা শুরু হল: এটা কার বুদ্ধি জানতে চাই। নিশ্চয়ই তোমার?

আমি একবার ঘিয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে রইলাম। নানার কণ্ঠস্বর রেখাব, গান্ধার, পঞ্চম ছাড়িয়ে একেবারে নিখাদে দাঁড়িয়ে গেল: শীগ্‌গির বল।

আমাদের গুপ্ত সমিতির কথা কেমন করে বলি? অবনীই আমাকে পরিত্রাণ করলে। সে ঘিয়ের পরামর্শের কথা আর অমিয় যে ফিরিওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল সবিস্তারে সব ফাঁস করে দিলে। ভাবলাম, প্রহারেণ ধনঞ্জয় না হয়ে যায় না।

তিনি আমার শাস্তি বিধান করলেন: সবাই তোমার সামনে জিলিপি খাবে, তুমি খেতে পাবে না। ঘিয়ের সাজা হল: তুমিও সাত দিন ভাত পাবে না, রুটি খেতে হবে। ঘিয়ের গলা দিয়ে রুটি নামত না, এটা রামেন্দ্রসুন্দরের জানা ছিল।

অমিয়-অবনীরাও বাদ গেল না, তাদেরও এখানে সাত দিন আর খেলাধুলো করা চলবে না। আমার ওপরেই ডবল ট্যাক্সেশন আদেশ হল, সাত দিন আমারও খেলাধুলো বন্ধ। নানীকে ডেকে আমাদের গুণাবলীর সব বৃত্তান্ত খুলে বলে, এক-একজনের শাস্তির মেয়াদটা শুনিয়ে দিলেন।

নানী প্রথমটা আমাদের বুদ্ধির বহর দেখে হেসে বাঁচেন না। রামেন্দ্রসুন্দর নানীকে তাড়া দিয়ে বললেন, তুমিও খুব হাস! এতেই তো ছেলেপিলেদের মাথা খাওয়া যায়।

নানী কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের অজ্ঞাতে আমাকে জিলিপিও খাওয়াতেন আর ঘিয়ের ঘি-ভাতও বন্ধ করেন নি।

ঝিকে বললাম, দেখ্ ভাই, নানার কানে কে এ কথাটা তুললে তার সন্ধান আমাদের নিতে হবেই হবে।

আর খোঁজাখুঁজির দরকার হল না। আমাদের রত্নপ্রবর তারাবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই ঠোঁটের-উপর-ঝুলে-পড়া ঘন গোঁফের জঙ্গল থেকে নোংরা দাঁতগুলি বেরিয়ে এল। তিনি আমাদের আপ্যায়িত করে বাধিত করলেন: বড়বাবুকে দেখিয়ে দিয়ে মজাটা কেমন টের পাইয়েছি তো? তোমরা বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। যত সব বাঁদরামি, তোমরা কী কর না-কর, সব লক্ষ্য রাখি, হুঁঃ।

উত্তম করেন।

আর কিছু বলার সাহস হল না, কি জানি একটু কিছু ছন্দপতন হলেই আবার সেটাও নানার কানে উঠবে।

আমি যেমন রামেন্দ্রসুন্দরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম আবার সবচেয়ে বেশী ভয়ও করতাম। কী রাশভারী লোক ছিলেন তিনি! তাঁর কাছে আমাদের এতটুকু বাজে কথা বলার সাহস হত না।

রামেন্দ্রসুন্দরের পাণ্ডিত্য, তাঁর বিদ্যার অপরিমেয় গভীরতা যে কতদূর যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেন বা তাঁর রচনাবলী পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন। তাঁর সাবলীল রচনাভঙ্গীর একটা বিশেষত্ব আছে। বিজ্ঞানের নীরস প্রবন্ধগুলি তাঁর অনমুকরণীয় সহজ সরল কবিত্বময় ভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিত্ব মেশাতে চেয়েছেন সেখানেই যেন সুর কেটে গিয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্বীয় রচনাবৈশিষ্ট্যে তিনি সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন—যেন বৈজ্ঞানিক কারখানায় গলিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে ঝাঁজ ছিল না—কি আচরণে, কি কথায়, কি লিখনভঙ্গীতে নিজেকে জাহির করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। যা খাঁটি সত্য বলে তাঁর মনে হত, তাই তিনি করে যেতেন। স্বকীয়তায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ, প্রতি কার্যে ফুটে উঠত তাঁর বিদগ্ধ মনের পরিচয়।

তাঁর অসীম বিদ্যাবত্তা বোঝবার বয়স তখন হয় নি। আজও তাঁকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করবার শক্তি রাখি না। যে চোখ নিয়ে দেখলে তাঁকে সত্যি দেখা যায় সেই

চোখও তখন আমার তৈরী হয় নি। তাই সাধারণ বালকের ঝাপসা চোখে তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, শুয়েছি, খেলাধুলা করেছি—তার মধ্যে সেই অসাধারণকে খুঁজে পাওয়ার কোনও প্রয়াসই ছিল না। অভিশাপ ছিল আমার স্বল্প বয়স আর বুদ্ধির অভাব। আমার জীবনের দীর্ঘ ন-দশ বছর তাঁর কাছে কাটিয়েছি, এক দিক দিয়ে এ যেমন আমার সৌভাগ্য, আর এক দিকে তেমনই আমার দুর্ভাগ্য যে, কিছুটা বোঝবার আগেই তাঁকে হারিয়েছি। এত কাছে পেয়েও যে সেই বিরাটের মহিমাকে বুঝতে পারি নি, সেই দুঃখই আজ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে।

সর্বত্যাগী কথাটি শোনা যায়। অনেকেই অনেক প্রকার ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আত্মাভিমানবর্জিত রামেন্দ্রসুন্দরের ত্যাগশক্তিকে আজও বাঙালী সম্যক্ উপলব্ধি করে নি। তিনি তাঁর সমস্ত ধীশক্তিকে যদি নিছক বিজ্ঞানের পটভূমিকায় ঢেলে দিতেন বা ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে যেতেন, তা হলে হয়তো তিনি আজ জগতের কাছে অমর, বিশ্ববন্দিত, সর্বজনপূজ্য হয়ে থাকতেন। তা হয় নি কেন, আলোচনা করলেই দেখতে পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, বঙ্গভাষার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বঙ্গভারতীর চরণে আজীবন অর্ঘ্য দিয়ে গিয়েছেন। তাই, ঐহিক সুনামের দিকে তাঁর কোনকালেই কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, অদূরভবিষ্যতে, একদিন বাঙালী জাতি তাঁর এই অনাড়ম্বর ত্যাগের ঐশ্বর্য অবনত-মস্তকে স্বীকার করে নেবে।

তিনি যে কত অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, নির্লিপ্ত মানুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি একদিন কাকে যেন সঙ্গে এনেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের একটা সার্টিফিকেট পেলে সেই ভদ্রলোকের কাজের সুবিধে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর কোন সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। সবিনয়ে বললেন, আমি তো ওঁকে জানি না, আমায় মাফ করতে হবে।

তিনি যে শরৎকুমারের অনুরোধ রাখতে পারলেন না, এজন্য তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠল একটা করুণ মিনতির সুর, যেন কতই অসহায়!

আবার এও দেখেছি যাকে তিনি ভাল করে চিনতেন বা জানতেন সে যদি প্রশংসাপত্র চাইত তবে ওই লোকটি সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটুকুই লিখে দিতেন। একদিন ওইরকম একটা সার্টিফিকেট লিখে পরিচিত ভদ্রলোকটির হাতে দিলেন।

আগন্তুক বললেন, নামের নীচে এম. এ., পি. আর. এস., প্রিন্সিপাল, রিপন কলেজ—লিখে দিলে তাঁর কাজের নাকি বিশেষ সুবিধা হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ দেখে মনে হল, যেন তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ। বহু সাধ্য-সাধনার পরে তিনি শেষটায় রাজী হলেন। ভদ্রলোকটি চলে যাবার পরই নানাকে ধরে বসলাম : তুমি যা, তাই লিখতে এত সঙ্কোচ কেন?

তিনি চুপ করে রইলেন। আমি ছাড়বার পাত্র নই, ধরে বসলাম, তোমাকে বলতেই হবে, কেন, কিসের জন্যে তোমার আপত্তি?

নানা এবার উত্তর দিলেন : নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশংসা শোনা, নিজের টাইটেল নিজের হাতে বসিয়ে দেওয়া—শুধু অশোভন নয়, গুরুতর অন্যায়। আমি বাধ্য হয়ে আজ এই অন্যায়টা করে বসলাম, কী করব, উপায় নেই।

মাতব্বরের মত আমিও বললাম, তোমার নামেই তো পরিচয়। তা ছাড়া জানই তো, অসম্ভব জেনেও শ্রীরামচন্দ্র সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছিলেন—সেটা কি তাঁর অন্যায় হয় নি? তবু তো তাঁকে তা করতে হয়েছিল। তুমি সত্যি কথাই লিখেছ, কুণ্ঠা কিসের?

নানা চমকে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, একটা সুন্দর হাসি তাঁর অধরে ফুটে উঠল।

বারাণসীর ভারত ধর্মমণ্ডলের পণ্ডিতগণ রামেন্দ্রসুন্দরের স্বধর্মনিষ্ঠা ও গভীর ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়েছিলেন। 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা'য় সম্পাদকরূপে তাঁর নাম "বিদ্যাসাগর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" ছাপা হয়েছিল। মুদ্রিত পত্রিকাটি তাঁর হাতে আসতেই তিনি লাল পেনসিল দিয়ে পঞ্চাশবার 'বিদ্যাসাগর' কথাটি কাটলেন, পেনসিলটা তাঁর হাতবাক্সেই থাকত। ভাব দেখে মনে হল, যার বুদ্ধিতে এই কাণ্ডটা ঘটেছে, তাকে সামনে পেলে তিনি একহাত দেখে নিতেন।

বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম : বিদ্যাসাগর একজনই জন্মেছেন, আর দ্বিতীয় নেই।

তখুনি একটা পত্র লিখে মুদ্রাকরকে জানিয়ে দিলেন, বারান্তরে তাঁর নামের পূর্বে ওই বিশেষণটি আর যেন ব্যবহার না করা হয়।

নানার কাছেই শুনেছিলাম, তিনি যখন এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসেন, বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে দেখতে চান। রামেন্দ্রসুন্দর কান্দী

স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়টি বিদ্যাসাগরের নির্দেশমত কান্দীর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ স্থাপন করেন। তাই এর উপর বিদ্যাসাগরের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে সেখানে পরিদর্শনে যেতেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে যান এবং তাঁকে প্রণাম করিয়ে আনেন। বিদ্যাসাগর নানাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেবার সময় নানার কী ভাবের উদয় হয়েছিল, সে কথা আমার কাছে বলতে গিয়ে আবেগে নানার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন প্রথম ভাগ শেষ করে সবে দ্বিতীয় ভাগ পড়তে শুরু করেছেন, নূতন বাড়ির বাইরের দাওয়ায় বসে দেখতেন, কে একজন উড়িয়ার মত, রুক্ষবেশ, পরুষ মূর্তি, মাথায় পুস্তকের বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সকলেই বলত, তিনিই বিদ্যাসাগর। জেমোতে কান্দী স্কুলের অনেক ছাত্রের নিবাস, তাই বই বয়ে নিয়ে গিয়ে গরিব ছাত্রদের বাড়িতে পাঠ্যপুস্তক তিনি স্বহস্তে বিতরণ করতেন। শৈশবেই বিদ্যাসাগরের সেই করুণাঘন মূর্তি তাঁর অন্তরের জ্যোতির্মঞ্চে তিনি স্থাপন করেছিলেন। উত্তরকালে স্বরচিত একটি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের দেবোপম চরিত্রের কথা উল্লেখ করে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন, এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আর একদিন দেখলাম, কে একজন আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর সামনে বসেই রামেন্দ্রসুন্দরের বহুবিধ গুণের ব্যাখ্যা শুরু করে দিলেন, তাতে কমা নেই, সেমিকোলন নেই, ছেদ নেই। সেখানে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। যতবার নানা কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চান, ভদ্রলোকটি নাছোড়বান্দা, তিনি কেবলই সকলের সামনে সমানতালে স্তবস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

শেষটায় অপারগ হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর করজোড়ে বললেন, কী বলছেন, আমার চাইতে কত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আছেন, তাঁদের পায়ের নখেরও যোগ্য নই আমি, এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে বইকি। দয়া করে বলবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।

তারপরই ভদ্রলোকটির মুখে ঋতুপরিবর্তন। আর কোন কথা তিনি বলেন নি।

কতখানি সৌজন্য, বিনয় ও অনুভূতি থাকলে মানুষ এমন কথা বলতে পারে, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়।

আর একটি কথা বলি। রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র, কৃষ্ণা চতুর্থী। তাঁর জন্মদিনে কোনও উৎসব হওয়া দূরে থাক, এমন কি কবে তাঁর জন্ম-

দিন, সেটা তাঁর খেয়ালেও থাকত না। আজকাল যেমন এখানে-সেখানে অলিতে-গলিতে যে-কেউ নিজের জন্মদিনে নিজেই মেতে ওঠেন, সেকালে কিন্তু দেশের কৃতী সন্তানদের জন্মোৎসবেরও ঢক্কানিনাদে প্রচার করার তেমন রেওয়াজ ছিল না, আর থাকলেও, সে পথে যে রামেন্দ্রসুন্দর পা বাড়াতেন না, এটাও সুনিশ্চিত।

"এ ভরা বাদর মাহ্ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" যে অর্থেই বিদ্যাপতি লিখুন না কেন, নানার ভরা ভাদরে জন্ম হলেও তাঁর মন্দির কখনও শূন্য থাকত না—কেতাবের জঙ্গলেই তিনি পূর্ণ হয়ে থাকতেন। সেটা আরও ভরে উঠত, যখন পদ্মমা কলকাতায় থাকলে ঠাকুর-বাড়িতে পুজো দিতেন, তারপর ছেলের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, স্বয়ং পায়েস রান্না করে, স্বহস্তে কচি খোকার মত তাঁকে খাইয়ে দিতেন। অনুপস্থিত থাকলে পদ্মমা নানার জন্মদিনের আগেই ইন্দুপ্রভা দেবীকে একখানা চিঠি না লিখে স্বস্তি পেতেন না; যদিও ওদিনটির কথা নানীকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, সেটি তাঁর মনের খাতায় লাল অক্ষরেই লেখা ছিল। গিরিজা মাসীই তাঁর হয়ে আসন পেতে, প্রদীপ জেলে, নানাকে বরণ করে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, পায়েস খাইয়ে দিতেন। কলের পুতুলের মত নানা হাঁ করতেন, অমন উপাদেয় পরমান্ন যে তাঁর মুখে, কিছুমাত্র বোঝবার উপায় নেই, এমনি নির্বিকার। মাঝে মাঝে আমি তাঁকে চেপে ধরে বলতাম, জন্মদিনে পেট ভরে পায়েস খেতে হয়, উৎসব করতে হয়, জান না?

দু-একটি উদাহরণ দিতেই রামেন্দ্রসুন্দর একটি মিঠে তাড়া দিয়ে বলতেন, আমি এমন কি কেষ্টবিষ্টু যে আমার জন্মদিন পালন করতে হবে?

সে তো আর তুমি করবে না, করবে-দেশের লোক। এই যে সেদিন কয়েকজন গণ্যমান্য লোক এসে তোমার জন্মোৎসবের কথা বলতেই তুমি হাত জোড় করে তাঁদের ফিরিয়ে দিলে—কেন? কিসের জন্যে? এতে দোষের কী আছে?

আমার কথার জবাব পেলাম না। কন্যার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি: তোমাদের সব হল তো? এবার নিষ্কৃতি দাও।

আর একদিন একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল। রামেন্দ্রসুন্দর কলেজ থেকে ফিরে এসে প্রায়ই সাহিত্য-পরিষদে যেতেন। সেদিনও কোন জরুরী সভার আয়োজন হয়েছে, নানা জলযোগ সেরেই আমাকে ও তারাপ্রসন্নবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষীর সমাগম হয়েছে। আপনভোলা মানুষ রামেন্দ্র-সুন্দরের সাদা উত্তরীয়ের এক প্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল, তারাবাবু তাড়াতাড়ি

সেই চাদর উঠিয়ে তাঁর গলায় জড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, পকেট থেকে রুমাল বের করে সযত্নে জুতোর ধুলো পর্যন্ত মুছে দিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর হাত ঝাড়া দিয়ে তারাপ্রসন্নকে সরে যেতে বললেন। এই ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায় নি, অনেকেই মুখ-টেপাটেপি করে হেসেও ছিলেন। দেখলাম সদাপ্রসন্ন-রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অবশ্য তখন আর কিছু বোঝা গেল না। যথানিয়মে সভাভঙ্গ হল, যে যাঁর স্থানে প্রস্থান করলেন। আমরাও আপন আবাসে ফিরে যাবার জন্যে ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে বসলাম।

অল্পদূরে যেতে-না-যেতেই রামেন্দ্রসুন্দরের গর্জন শোনা গেল: তারাপ্রসন্ন, তুমি আজ সবার সামনে আমাকে এমন অপমান করলে কেন? রবিবাবু আছেন, শাস্ত্রী মশাই আছেন, আরও অনেকে আছেন, আমি কি পয়গম্বর? জুতো ঝেড়ে দেবার মানে কী? তুমি কি মনে কর, চাটুকারি করলেই গুরুভক্তিটা বেশী দেখানো হয়?

বাড়ি না-আসা পর্যন্ত কত কথাই যে তিনি বলে গেলেন, সব মনে নেই, কী যে ভীষণ রাগ, থরথর করে কাঁপছেন।

তারাবাবুর মুখ চুন। কথাটি নেই।

বাড়িতে এসেই আমার প্রধান কাজ হল, জনে জনে এই শুভসংবাদ পরিবেষণ করা।

তারাপ্রসন্নর ওপর সবাই বিমুখ। আপন আপন গায়ের ঝাল মিটিয়ে বললেন, বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, ঘরের শত্রু বিভীষণের আরও কিছু উত্তম-মধ্যম হলে যেন ভাল হত।

আমি টিপ্পনী কাটলাম: এর পরেও আর হবার কী বাকি থাকল?

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরেব সতীর্থ ও রিপন কলেজের অধ্যাপক। গ্রীষ্মকালে নানা বাড়িতে প্রায় খালি গায়েই থাকতেন, একমাত্র বিশিষ্ট লোকজন আসবার খবর পেলেই তিনি গায়ে জামা দিতেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু আবার এককাঠি সরেস, তিনি তাঁর বাড়ি থেকে নগ্নগাত্রে শুধু একটি মটকার চাদর গলায় ঝুলিয়ে প্রায়ই রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, হাতে একটি বংশদণ্ড—চলতি কথায় লাঠি। দুজনকে খালি গায়ে বসে অনেক প্রাণের কথা বলতে দেখেছি। একদিন শুনলাম ক্ষেত্রমোহনবাবু আক্ষেপ করে বলছেন,

তোমার আর কিছু হল না—না গভর্মেণ্ট কলেজ, না বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের মত এই রিপন কলেজেই পচে মর। বৈজ্ঞানিক হয়েও বৈজ্ঞানিক তোষামোদটা শিখলে না! রসিকতা করে বললেন, এ যুগের মানুষ হবার চেষ্টা কর।

নানার সহাস্য উত্তর শোনা গেল: আমি যা আছি এই অমানুষ হয়েই মরতে চাই।

কোনও গভর্মেণ্ট কলেজে চাকরি নিলে তাঁর অনেক বেশী অর্থ উপার্জন হত এবং এরকম অনেক প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু তবুও দেশীয় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে তিনি অন্যত্র যেতে চান নি, কারণ স্বাদেশিকতাই ছিল ঋষিকল্প রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মূলমন্ত্র। পয়সার জন্যে তিনি কখনও আদর্শ ত্যাগ করেন নি। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে জজ মরিশ সাহেবের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যেদিন মুক্তি পান, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে তাঁকে গাড়ি করে ছেলের দল টেনে এনেছিল—নানাও তার মধ্যে ছিলেন, তিনি তখন কলেজের ছাত্র। তাই উত্তরজীবনে নির্ভীক স্পষ্টবাদী সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজ ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও যেতে চান নি। সুরেন্দ্রনাথেরও রামেন্দ্রসুন্দরের উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তাঁর হাতেই রিপন কলেজের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শুধু কলেজ-পরিচালনা নয়, রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যাপনা-খ্যাতি একটা প্রবাদের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদের তিনি এমনভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, কারও আর বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাস্য থাকত না। শুধু সিলেবাসের কথাটুকুই নয়, তার বাইরেও তিনি অনেক কিছু শিখিয়ে দিতেন। অন্যান্য কলেজের বহু ছাত্রই নিজের নিজের ক্লাস বাদ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের ক্লাসে এসে যোগ দিত এবং আপন আপন কলেজে প্রফেসারদের কাছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করত। রিপন কলেজ থেকে বেরিয়ে যেসব ছাত্র অন্যান্য কলেজে ভর্তি হত, তারাও অধ্যাপকদের কাছে এমন অনেক বিষয়ে বলত যে, তাঁরা বিস্মিত হয়ে যেতেন, আর যখন শুনতেন যে তারা পূর্বে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র ছিল, তাঁরা সসম্ভ্রমে বলে উঠতেন, ওঃ, ত্রিবেদী'স্ পিউপিল্!

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মশায় প্রায়ই লালগোলায় যেতেন। তাঁর রচিত নাটকের যে কোনও স্থান উল্লেখ করলেই হড়হড় করে সমস্ত দৃশ্য মুখস্থ বলে

যেতেন—নিজের রচনা হলেও এতটা যে কেউ মনে রাখতে পারে, এটাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকত।

এক-এক সময়ে আবার লক্ষ্য করেছি, তিনি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, তার পরই গান বা কবিতার লাইন বলে যেতেন আর একজন সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখত।

আমাদের ঠিক পাশেই, অমিয়-অবনীদের গা-লাগা বাড়ির নীচের তলায় কিছু-দিন থেকে পাড়ার লোকেরা ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই চিরসবুজ গীতিনাট্য 'আলিবাবা'র রিহার্সাল দিচ্ছিল। ঘি, শৈল, অমিয় তিন জনেই অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে আমাদের বাড়ির নীচের জানলায় দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে—সবারই মনে নৃত্যগীতের পুলক জেগে ওঠে। আমাদের আর তাদের জানলা সামনাসামনি। মাঝে শুধু একফালি ছোট গলির ব্যবধান, মাত্র দু-তিন হাত ছাড়াছাড়ি, কাজেই কোনও অসুবিধা নেই। ঘিয়ের গলা বেশ মিষ্টি। সে গুনগুন করে আপন মনেই সুর ভেঁজে যায়, "বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দোব না" এবং আরও দু-একটা গান; এবং সেই অনুকরণে ঘরের দুয়ারে খিল এঁটে অমিয়, তার ভগ্নী শৈল আর ঘি গানের সঙ্গে নৃত্য চালায়। প্রথম দু-একদিন খেলার সময় এদের পাত্তা নেই দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তারপর আমি আর অবনী রীতিমত অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করলাম, ওরা এখন নিজেদের মধ্যেই নাচের পাঠশালা খুলেছে।

আমিও দলে ভিড়ে গেলাম। অবনী আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে না। প্রাত্যহিক-খবর-সংগ্রহকারী তারাবাবু ঠিক সন্ধান পেয়েছেন। ঘরে তখন "আয় বাঁদী তুই বেগম হবি" গানের সঙ্গে খুব উল্লম্ফন চলছে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত! জানলার ধারে নানার সিংহনাদ!

দাঁড়াও, ভাল করে এবার বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।

সপ্তমে গলা চড়িয়ে বললেন, চলে এস।

সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসতেই, এসবের মূল'গায়েন কে জেনে কঠোর শাস্তিবিধান হল। অবনী আমাদের দলে না থাকায় বাদ পড়ে গেল, সে আজ শুধু দর্শক।

আমরা লম্বা বারান্দায় সোজা নাকেখৎ দেওয়া শেষ করে, পরস্পরের কান ধরে সবে বৈঠক দিতে শুরু করেছি, এমন সময় খটমট বুটের আওয়াজ তুলে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে, মাঝে মাঝে তারস্বরে চিৎকার শোনা যায়: রাম বাড়ি আছ হে?

অবিনাশচন্দ্র বসু এসেই আমাদের কসরতের বহর দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

কী হে রাম, এদের কানের মাস্‌ল্‌ শক্ত করার নতুন আখড়া খুলেছ নাকি?

নানা বলে উঠলেন, এই যে এস—আমার ভাগীদার এস।

আমাদেরও ছুটি হয়ে গেল।

অবিনাশবাবুর কথা নানার কাছে আগেই শুনেছি। তিনি একদিন আমার মাস্টার মশাইকে বলছিলেন: আমি আর অবিনাশ একসঙ্গেই পি. আর. এস. দিই। তখন আট হাজার টাকা পাওয়া যেত। আমরা ব্রাকেটে প্রথম হওয়াতে ভাগ করে পাওয়ার কথা, কিন্তু পরীক্ষকদের সুপারিশমত এবং আগের টাকা মজুত থাকায় আমরা দুজনেই পৃথক পৃথক স্কলারশিপ পেয়েছিলাম।

পরীক্ষার ফল যখন বেরুল, তখন নাকি তাঁরা দুজনে 'বাঘবন্দী' খেলছিলেন। কথাটি শুনে আমি অবাক হয়ে নানাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা অমন ধাড়ী বয়সেও 'বাঘবন্দী' খেলতে নাকি?

একটা উত্তর শোনা গেল: হুঁ।

এর মধ্যেই এসে পড়ল বিশ্বকর্মাপুজো, সেদিন কলকাতায় আকাশ-ভরা ঘুড়ির লড়াই, অমিয়-অবনীরাও আমাদের প্রকাণ্ড ছাদে দাপাদাপি করে ঘুড়ি ওড়ায়। নানা কী জানি কেন, এসব দেখতে পারতেন না, বিশেষতঃ মেয়েদের ঘুড়ি ওড়ানো। তবু তাঁর চোখের ওপরেই আমাদের পাশের বাড়ির উষা, বয়স প্রায় আঠার-উনিশ, প্রায়ই ঘুড়ি ওড়াত, সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে ছাতে শুকোতে দিত—তার কী তদ্বির, কী তোয়াজ, সে এক দেখবার মত। আজ তার সঙ্গেই অবনীর আকাশে লড়াই চলেছে, এক-একবার উষা গোঁত্তা মেরে ঘুড়িটাকে সোজা নীচে নামিয়ে আনে, বেচারী অবনীর ঘুড়ি লাট খেয়ে খেয়ে মাথা দুলিয়ে উত্তর-দক্ষিণ নাচতে থাকে। উষা কখনও দু হাত ঊর্ধ্বে বাড়িয়ে লাটাইয়ের সুতো ছেড়ে দেয়, আবার খপ খপ আওয়াজ করে কখনও বা জোর গুটিয়ে নেয়, সঙ্গে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ। পিঠের ওপরে সাপের মত লম্বিত বেণী দুলে দুলে উঠছে। সূর্যকিরণে সদ্য-পালিশ-করা চুড়ির ঝিকিমিকি আমাদের চোখেও ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি। মাঝে মাঝে আমি, স্নি, অমিয় আর শৈল গোটা ছাদময় ছুটে যত রঙ-বেরঙের ঘুড়ি কেটে আমাদের ছাদে এসে পড়ে, তাই কুড়িয়ে নেবার জন্তে দৌড়-ঝাঁপ চালাই। কার ভাগ্যে কটা জুটল তার হিসেবনিকেশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে; বিরতির ফাঁকে আমরা এক-একবার উষার ঘুড়ি-ওড়ানোর কায়দাটা দেখে নিই। এমন সময় সমস্ত আশায়

জলাগুলি দিয়ে অবনীর ঘুড়িটা গেল কেটে। উষার কী ফুর্তি, চোখ-মুখ হাসিখুশিতে ভরা!

এ পরাজয় অসহ্য, বিশেষ একটি মেয়ের কাছে। অবনী ফের চোখ-মুখ লাল করে নতুন ঘুড়িতে সুতো বাঁধল, আমার সেটিকে ধরে উড়িয়ে দেবার ভার। এমন সময় রামেন্দ্রসুন্দরের আবির্ভাব। এর আগে তাঁকে কখনও ছাদে দেখা যায় নি। পশ্চাতে তারাপ্রসন্ন। নানার ঘূর্ণিত লোচনের দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমাদের মাথা ঘুরে গেল। যে যেখানে ছিলাম সেখানেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনি ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে একবার উষার দিকে চেয়ে, তারপর আমাদের প্রত্যেককে দেখে নিলেন। অবনীর হাত থেকে লাটাইটা পড়ে যেতেই সেটা গড়িয়ে আল্‌সের কোণে আশ্রয় নিল। ওদিকে ঘুড়ি ঠোক্কর খেয়ে কার দুয়ারে যে মাথা ঠুকে পড়ল, তা দেখবার অবসর তখন ছিল না। নানা কলেজ-ফেরতা চোগা-চাপকান না-ছেড়েই লাঠি হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছেন। হনুমানগুলো যেমন হুপহাপ শব্দে পালিয়ে যায়, অমিয় অবনী শৈল বাপ-বাপ করে এক ছুটে চম্পট, ধরা পড়ে গেলাম আমি আর ঘি।

নানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন, তোমাকে হাজার বার বলেছি, কক্ষনো ঘুড়ি ওড়াবে না।

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই বললাম, আমি তো ঘুড়ি ওড়াই নি। কেমন করে ওড়াতে হয় তাও জানি না।

ওদিকে কী দেখছিলে?

উষাদি মেয়েছেলে হয়েও কেমন ব্যাটাছেলেকে হারিয়ে দেয়—বুঝলে নানা, অবনীর একটা ঘুড়ি কেমন—

হাত-ইশারায় ঘুড়ি কাটার ভঙ্গী দেখিয়ে দিলাম।

আর কী দেখছিলে?

আর দেখছিলাম, ঘুড়ি কেমন সোঁ সোঁ করে ওপরে ওঠে, আবার সাঁ-সাঁ করে সোজা নীচে নেমে আসে, আর মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ হেলতে-দুলতে আকাশপথে চলে, ঠিক যেমন রাত দশটায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে লোকগুলো কী সব খেয়ে যেন এধার-ওধার টলতে টলতে যায়।

উপমা শুনেই রামেন্দ্রসুন্দরের চক্ষুস্থির!

শুধু একটা কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল: খুব হয়েছে, নীচে নেমে এস।

ঠিক মাটির পৃথিবীতে বিচরণ না করলেও এবার নানা বুঝলেন যে, আমরা যেখানে থাকতাম, তার আবহাওয়া ঠিক বাসোপযোগী নয়। অনেক পরে শুনেছিলাম অল্প কিছুটা দূরেই একটা নোংরা পল্লী ছিল, নাম হাড়কাটা, কেউবা ইংরেজীতে বলত 'বোন্-কাট্ লেন'। রোজ রাত দশটার পর রাস্তা দিয়ে মাতালের চিৎকার আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল—কালাকাল মানত না, ঊর্ধ্বতন চোদ্দ পুরুষের সপিণ্ডকরণ করে ছাড়ত। অনেক বিশ্রী কথার মানে বুঝতাম না। ক্রমেই হৈ-হল্লা এতটা বেড়ে উঠল যে, নানা অতিষ্ঠ হয়ে তারাপ্রসন্নকে শীগ্‌গির একটা ভাল পাড়ায় বাড়ি খোঁজ করে উঠে যাবার কথা বললেন।

দু-একদিন পরই রামেন্দ্রসুন্দরকে নিজের বাড়িতে গানের আসরে বসে থাকতে দেখেছিলাম। শরৎকুমার লাহিড়ী—এস. কে. লাহিড়ী, বুক-সেলার অ্যাণ্ড পাবলিশার—একজনকে নিয়ে নানাকে গান শোনাতে আসবেন।

এস. কে. লাহিড়ীকে রামেন্দ্রসুন্দর আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, আমার বাড়িতে কিছুই বাদ্যযন্ত্র নেই।

লাহিড়ী মশাই নানার কথা শেষ না হতেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ওসব কিছুই চিন্তা করবেন না ত্রিবেদী মশাই, সঙ্গে ডুগি-তবলা হারমোনিয়ম সব আসবে।

আজ সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসর। রাত্রে আমার পড়া নেই, মাস্টার মশাইও গান শুনবেন।

গানাৎ পরতরং নহি—এই শাস্ত্রবাক্যটি রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি, বরং গানকে তিনি পর করেই রেখেছিলেন। আজ দেখলাম তার ব্যতিক্রম, এই প্রথম আর এই শেষ।

অনুরোধে মানুষ ঢেঁকি গেলে—তাই বুঝি তিনি স্বগৃহে এই বিড়ম্বিত ভার গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিয়-অবনীকে গান শোনার নিমন্ত্রণ করা গেল। অবনীর গোড়াতেই আপত্তি। দুটো জিনিসকে সে প্রাণপণে এড়িয়ে চলে, এক ক্রিকেট-খেলা আর এক মার্গ-সঙ্গীত। কেন বিরূপ, জিজ্ঞেস করলেই সে নাক উঁচিয়ে বলত, ক্রিকেট-খেলা দেখাও যা, ক্লাসিক্যাল গান শোনাও তাই, ও দুটোতেই ধৈর্যচ্যুতি হয়।

তবুও অবনী আমার পিঠে গুঁতো দিয়ে জানতে চাইল: বলি, আধুনিক না ওস্তাদী?

আমি ওসব জানি-টানি না—গান হবে, এই পর্যন্ত।

অবনীর টাটকা উত্তর : আধুনিক হলে ক্ষতি নেই, বেশ ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে চুটকি তাল দেওয়া যায়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল ! ওরে ব্বাবা:, ও যেন থামতেই চায় না, ওতে আমি নেই।

বেশ তো, ভাল না লাগে উঠে পড়িস—কেউ তো হাত-পা বেঁধে ধরে রাখবে না ! এখন থেকেই অত মাথাগরম কেন ?

আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে অবনী পিট্‌টান দিল। অগত্যা আমি আর অমিয় কোনও রকমে পাসপোর্ট যোগাড় করে ঘরের এক কোণে জায়গা নিলাম।

যিনি আজ গাইবেন, তাঁর নাম রজনীকান্ত সেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁরা সবাই হাজির হলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ঢালাও ফরাশে তাঁদের সাদরে আহ্বান করে বসালেন। কিঞ্চিৎ আপ্যায়নের পর গান আরম্ভ হল—যতদূর মনে পড়ে রজনীকান্ত প্রথমে গাইলেন : 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', তার পরেই 'পাতকী বলিয়া কি গো'।

সাহিত্য-পরিষদের কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত আছেন, তার মধ্যে একজন দু-একটা হাসির গান গাইতে কান্তকবিকে অনুরোধ জানালেন।

রজনীকান্ত সেন গান ধরলেন : 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত পানতুয়া শত শত।'

সেটা শেষ হতেই—'বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিছি পায়'।

এর পর গাইলেন—'বুয়োরে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে'।

গানের মাঝে মাঝে সবাই সশব্দে হেসে উঠছিলেন। কিন্তু নানার মুখে নির্বিকার নিরালম্ব ভাব। গানটি শেষ হতেই বললেন, এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যাক, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' গানটা শুনতে বড় ইচ্ছে হয়।

কান্তকবি ঈষৎ মৃদুহাস্যে গানটি শুরু করলেন।

এতক্ষণে নানার মাথা দুলতে লাগল। গানের আসরে বেরসিক রামেন্দ্রসুন্দর সুরসিক হয়ে উঠলেন। সম-ফাঁকের বালাই নেই, অন্তরের কথা ভাবের লয়ে রূপ পেয়েছে, তাই মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনলেন। এর পরই আসর ভঙ্গ হল। সামনেই চিকের আড়ালে নানী ও মাসীমারাও বসে ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে নৈশ আহারের বন্দোবস্ত করতে চলে গেলেন।

শেষ গানটি ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর অন্যান্য গানের সময় কোন রকমে তাল বজায়

রাখছিলেন, কেবল হাসির গানের সময় তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন।

এর পর কদিন হরদম আমার মুখে 'বুয়োরে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে' গানটিতে গোটা বাড়িতেই যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম। সবারই কান ঝালাপালা। শেষটায় নানীর ধমকানিতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলাম, আমার যুদ্ধ থেমে গেল।

এদিকে বাড়ি খুঁজে খুঁজে তারাপ্রসন্নবাবুর জুতোর সুখতলা ছিঁড়ে গেল। যাক, বহু কষ্টে ভক্ত অনুচর তারাবাবু সাহিত্য-পরিষদের কাছাকাছি পার্শীবাগানে একটা ভাল তেতলা বাড়ি ঠিক করলেন। সামনের মাসে পয়লা তারিখেই উঠে যাব, আর মাত্র বাইশ দিন বাকি।

গিরিজা মাসী আবদার ধরে বসলেন: এ বাড়ি ছাড়বার আগে, মা ও বাবার একসঙ্গে ফোটো তুলিয়ে রাখব।

তারপর আমাদের গ্রুপ তোলা হবে। পরদিনই বিকেলে ফোটোগ্রাফার এলেন, তিনি আমাদের দূর-আত্মীয়। নানা চেয়ারে বসে থাকবেন, নানী পাশে নানার স্কন্ধে হাত রেখে দাঁড়াবেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী আজ একটু সাজসজ্জা করবার সুযোগ পেয়েছেন। ভাল করে চুল বেঁধে চওড়া কালোপাড় শাড়ি পরে কপালে সিঁদুরের টিপ দিলেন, নানাকে ধপধপে কাপড় জামা পরিয়ে গিরিজা মাসী ওপরের ছাদে নিয়ে গেলেন।

একটা ঝি তাড়াতাড়ি অগুরু-সেণ্ট ঢেলে নানীর কাপড়ে মাখিয়ে দিয়ে বললে, ফটক উঠলে ছবিতেও গন্ধ থাকবে, তাই বুদ্ধি করে সেন্‌সেন্‌ নিয়ে এলাম, ইন্দুমা।

কথা শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল, নানা কিন্তু গম্ভীর। নানীর মুখে আজ আনন্দের ঢেউ। আমরা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। ফোটোগ্রাফার নানার থুতনিতে হাত দিয়ে এধার-ওধার ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, পা দুখানা কখনও সামনে টেনে এনে একটা পা ভেতরে ঠেলে দিচ্ছেন, কোঁচাটা পাট করে ঠিক পায়ের উপর রাখছেন, ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে তাঁকে হাসি-হাসি মুখ করতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত কসরত, তিনি তখন কোন্ গবেষণায় মগ্ন কে জানে! মাঝে মাঝে অবস্থা-বিপর্যয়ের সঙ্গে তাল রেখে ক্যামেরার দিকে আড়চোখে চাইছেন বটে, কিন্তু মুখখানা ক্রমেই গম্ভীরতর হয়ে উঠল। নানার মাথায় গিরিজা মাসী আজ টেড়ি কেটে দিয়েছেন, এ অত্যাচারও আজ তাঁকে এই প্রথম সইতে হল।

ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা-স্ট্যাণ্ডকে এগিয়ে আর পিছিয়ে নিয়ে লেন্স ঘুরিয়ে

ফোকাস ঠিক করে নিচ্ছেন, আর ঘন ঘন মাথায় কালো কাপড়ের ঘোমটা টেনেই 'উঁহুঃ, হল না' বলে আবার অবগুণ্ঠন ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন।

নানার আজ মহাবিপদ। ফোটোগ্রাফারের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর মুখে যেন কিছুতেই হাসি ফুটতে চায় না। নানী একটু সুর চড়িয়ে বললেন, একবার মনেই কর না তোমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছ, পরিষদের মাথায় আর একতলা কেমন করে চাপানো যায়।

যেই না বলা, নানার মুখে হাসি উথলে উঠতেই ওদিকে লেন্সের ঢাকনা খুলে গেল।

ফোটোগ্রাফার সোৎসাহে বললেন, এবার ঠিক হয়েছে।

তা আর হবে না? ওঁর কাছে এর চেয়ে মনের মত কথা আর কী থাকতে পারে?

নানার একটি আপ্তবাক্য কানে এল : যাক, এবার পরিত্রাণ পেয়েছি তো!

তারপরই আমি নানাকে স্থানচ্যুত করে তাঁরই ভঙ্গিমায় চেয়ারে বসে পড়লাম, নানীও আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। একটু হাসি ফোটাবার জন্যে নানাকে বহু সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন হয় নি। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি মুখে লেগেই আছে। ফোটো তোলার পর নানাকে বললাম, দেখা যাক, কে জেতে, কে হারে, কার হাসির কায়দা মানানসই হয়!

নানা সে কথা শুনলেন কি না জানি না, নানীকে বললেন, যাই একবার পরিষদে, একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

নানী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কাজ কোন্‌দিন না থাকে তোমার? আজ একটু সাজ-পোশাক করেছেন কিনা, তাই বুঝি নানাকে একটু বেশীক্ষণ কাছে রাখবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু নানার ভাবগতিক দেখে তিনি বিড়বিড় করে আর সব যে কী বললেন শোনা গেল না, ততক্ষণ নানা চৌকাঠ পার হয়ে নীচে নেমে গিয়েছেন।

সংসারে থেকেও নানার উদাসীন নির্লিপ্ত ভাব। সব-কিছুর ভার নানীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আপন কাজ করে যেতেন, সে দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তাঁর পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। কিন্তু তিনি যদি ঘোর সংসারী হতেন, তা হলে অত নিখুঁতভাবে হয়তো পরিষদ্‌কে গড়ে তোলা সম্ভব হত না। সাংসারিক ব্যাপারে নানীই ছিলেন সর্বেসর্বা, এই কারণে ভুল বুঝে অনেকেই তাঁকে স্ত্রৈণ ভাবত। কিন্তু তিনি তা কখনই ছিলেন না—এ কথা আমি জোর গলায়

বলতে পারি। ইন্দুপ্রভা শুধু তাঁর সমধর্মিণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহকর্মিণী, সহমর্মিণী।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণেও রামেন্দ্রসুন্দর সাধারণতঃ যেতে চাইতেন না। যেখানে নেহাত না গেলে নয়, ইন্দুপ্রভা দেবী দুদিন আগেই নানার কোর্টে তপোভঙ্গের মামলা রুজু করে দিতেন। তাই, কালেভদ্রে কখনও যদিই বা তাঁকে যেতে হত, তিনি একবার দেখা দিয়েই চলে আসতেন, ভোজনপর্বে যোগ দিতেন না। লোক-লৌকিকতা, আদর-আপ্যায়ন, এ সবই ইন্দুপ্রভা দেবীর রাজত্ব।

একদিন একটি বিশিষ্ট আত্মীয় এবং বন্ধু এসে নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে বিয়েতে যোগদানের জন্যে নানাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা যে রামেন্দ্রসুন্দরের খেয়াল থাকবে না, এটা ধরে নিয়েই তিনি তাঁর ভগ্নীকে সটান অন্দরমহলে পাঠিয়ে ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে পাকা কথা আদায় করে নিলেন। তাঁরা চলে যেতেই নানীও নানার দরবারে হাজির। রামেন্দ্রসুন্দর বিনা বাক্যব্যয়ে নিমন্ত্রণপত্রখানি তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

নানী এক লহমায় চিঠিখানার নিম্নাংশে চোখ বুলিয়েই স্বামীকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, এ কথা লেখার মানে কী? নিমন্ত্রণ করলেই যে লৌকিকতা করতে হয়, এটা তো সবারই জানা আছে।

লঘুহাস্যে নানার মুখ ভরে গেল। গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে উত্তর দিলেন —পাছে তোমরা ভুলে যাও!

আমি নীরব শ্রোতা—ওদিকে ভক্তিমান তারাপ্রসন্নের বিশদ ব্যাখ্যা,—তা বুঝি জানেন না ইন্দুমা? ওটা লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ নয়, ওর মানেই যে উল্টো—আশীর্বাদের পরিবর্তে লৌকিকতা প্রার্থনীয়।

তারাপ্রসন্নের এই মাথা দুলিয়ে বলার ভঙ্গী দেখে ইন্দুপ্রভা দেবীরও উচ্চহাস্য সপ্তগ্রাম ছাপিয়ে উঠল। একটি মোক্ষম কথা বলে দিয়েছি, এমনি একটা বাহাদুরি-ভাব নিয়ে তারাপ্রসন্নবাবু বড়বাবুর দিকে চাইলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অটুট গম্ভীর—প্রিয় শিষ্যকে নূতন খেতাবে বিভূষিত করলেন—কণ্ঠে নিদারুণ বিরক্তি,—লোকের একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। যখন-তখন যা নয় তা বলাটাই বাহাদুরি?—আহাম্মক!

গুরুদম্পতির চিত্তবিনোদনের আশায় এমন একটা মল্লিনাথের টীকা মাঠে মারা গেল! হায় রে, কী দুর্দৈব! তার পরেও কী না রামেন্দ্রসুন্দরের এবম্বিধ আরবী

উপাধি বিতরণ! ভারাক্রান্ত তারাবাবুর শির অবনত, দৃষ্টি ভূলুণ্ঠিত, মনের গতিটা এই যে ধরণী যদি তখুনি দ্বিধাবিভক্ত হয়, তিনিও যেন সীতার মত পাতাল প্রবেশ করতে পারলেই বেঁচে যান।

সামাজিক প্রথা নিয়েই হোক, আর যে-কোনও বিষয়েই হোক না কেন, কেউ যদি চটুল রসিকতা করে, রামেন্দ্রসুন্দর তা' মোটেই পছন্দ করেন না। ইন্দুপ্রভা দেবীও তা' জানতেন। তিনিও আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর রোজ পরিষদের সভায় যান, নানীও গা ধুয়ে চুল বেঁধে মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে ছাদের সভায় যোগদান করেন। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, এ-বাড়ি ও-বাড়ির সঙ্গে কথার আদান-প্রদান চলে।

কী রান্না হল, কর্তা কী করেন, ছেলে কী পড়ে, মেয়েটির মুখে ভাত দিচ্ছেন কবে? বড় মেয়েটির কোথায় বিয়ে ঠিক করলেন, কত ভরি সোনা দিতে হবে, জামাই কেমন, কোন্ অফিসে কাজ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যথাবিধি উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর আদি-হীন অন্তহীন সমস্যার সমাধান অসমাপ্ত রেখেই আবার ঠিক সন্ধ্যায় নীচে নেমে আসেন, তার পরই চিরনূতন, চিরপুরাতন ঘরকন্নার কাজে লেগে যান।

তিনি ছিলেন পাকা গিন্নী, কে ঠিক সময়ে খেতে পেয়েছে, না-পেয়েছে, ঝিরা সব কোথায়, কাকে কোন্ সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে, কার কাপড়-জামা হারিয়েছে— দিনের পর দিন দেখে চলেছেন।

দিন ঘনিয়ে এল, আমরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আমি, ঘি, অমিয়, অবনী, শৈল খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে সবাই ছাদে বসে কম্পিটিশনে কেঁদে যাচ্ছি, দু দিন থেকে পড়তেও মন বসে না। অমিয়, অবনী, শৈলকে আর দেখতেও পাব না, তাদের সঙ্গে খেলাও চলবে না। শৈল তো আমার কোলে মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমাদের মধ্যে বয়সে বড় অবনী, সে ততটা বেসামাল হয় নি, ভারিক্কি চালে বললে, আমাদের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। এর পর কে কোথায় ছিটকে যাব, আর হয়তো দেখাই হবে না, আর বহুদিন পরে যদিই বা দেখা হয়, আমাদের আজকের মুহূর্ত আর ফিরে পাব না; আর কেউ কাউকে হয়তো চিনতেও পারব না, সব হারিয়ে যাবে।

আমাদের আলাপ চলতে থাকে, বিলাপ চলতে থাকে, শেষটায় যখন প্রলাপের কোঠায় এসে পৌছল, রামেন্দ্রসুন্দর হঠাৎ ছাদে উঠেই আমাদের এই অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়ালেন। এ কথাটি কেমন করে তাঁর কানে গিয়েছিল, জানি না। তিনি

আসতেই আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললাম, কাদের সঙ্গে খেলব? আর তো ওরা ওখানে যাবে না।

নানা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে ওই রকম ভাল বন্ধু জুটিয়ে দেব। ছিঃ, কেঁদো না, তা ছাড়া তারাপ্রসন্ন কি রবিবারে ছুটির দিনে এদের ওখানে নিয়ে যাবে।

কথায় কি আর মন মানে? বুক ছাপিয়ে কান্নার ঢেউ বয়ে যেতে লাগল।

আমাদের চলে যাবার দিন উপস্থিত। সব জিনিসপত্র আগেই চলে গিয়েছে। আমরাও গাড়িতে উঠব, এমন সময় শৈল, অমিয়, অবনী ছুটে এসে বুকফাটা কান্না জুড়ে দিল।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণবর্জনের সময় কতখানি দুঃখ পেয়েছিলেন জানি না, আমাদের কষ্ট যেন সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে জলভরা চোখ নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে বসলাম। সেও আমাকে বয়ে নিয়ে চলল কোন্ এক অজানা জগতে, যেখানে চিরপরিচিত পথ নেই, চিরাভ্যস্ত জন-কল্লোল নেই, আর নেই আমার শৈল, অমিয় আর অবনী।

পার্শীবাগানে এসেই আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম। রামেন্দ্রসুন্দর আমার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমাকে কাছছাড়া করতেন না। অনেক রকম কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে রাখলে কী হবে? বুকটা টনটন করে উঠত। আমার খেলাঘরের বিশ্বে আমি যেন নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। একবার এপাশের জানলা দিয়ে দেখি, আবার ওধারের জানলায় দাঁড়াই। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন স্বনামধন্য রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু ও আর সব ভাইয়েরা। তখন তাঁদের পিতৃদেব চন্দ্রশেখর বসুও জীবিত ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে। তারা কেউ আমার সঙ্গে মিশতে চাইত না। দেখলেই জানলা বন্ধ করে দিত বটে, খড়খড়ির ফাঁকে তাদের চোখগুলো জলজল করে উঠত। আমি আজ যেন বিশ্বের দলছাড়া।

রামেন্দ্রসুন্দর ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে সুনীল বলে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজশেখর বসুর বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ছেলেদের সঙ্গেও খেলাধুলা করতে বললেন। তারা কেউ আমার চেয়ে বয়সে বড়, কেউ বা ছোট, ঠিক সমবয়সী কেউ নেই। গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যার সঙ্গেও আলাপ হল, কিন্তু ঠিক শৈলর মত নয়। পাড়াটির ব্রাহ্ম পরিবেশ।

বাড়ির সামনে টানা প্রাচীর-ঘেরা একটা পুষ্করিণী, সারকুলার রোডের মুখে একটা বহু পুরনো বাড়ি, সেটাই ছিল ন্যাশনাল কলেজ। সার্ পি. সি. রায়্ ওখানেই থাকতেন। আমরা যেখানে উঠলাম, তার কয়েকখানা বাড়ির পরেই সার্ জগদীশচন্দ্র বসুর বসতবাটি।

এবার সুন্দর তেতলা বাড়ি পাওয়া গেল। ফ্যান, ইলেকট্রিক লাইট সবই আছে। রামেন্দ্রসুন্দর আসার পরদিনই পাখার কনেকশন সব কাটিয়ে দিলেন, বিজলী বাতির আলোগুলি বজায় রইল। পাখার নীচে থাকলে কী জানি যদি আমার বদ অভ্যাস হয়ে যায়, সেজন্যে শুধু আমার কারণেই বাড়ির সব পাখাগুলো বন্ধ হয়ে গেল।

তেতলা থেকে একতলা পর্যন্ত একা-একাই ভূতের মত ঘুরে-ফিরে আসি। সমস্ত বাড়িটা যেন আমায় গিলে ফেলতে চায়, আমার মনের অবস্থা দেখে ঘিও আর এক তিল আমার সঙ্গ ছাড়ে না। তবু মনটা কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে, স্বস্তি পাই না।

আমরা এক রবিবারে এখানে উঠে এসেছি—আবার আসছে রবিবারে অমিয় অবনী শৈল আসবে, তারই আশায় দিন গুনে যাই। প্রথম প্রথম দুই-একটা রবিবার তারাবাবু তাদের নিয়ে এসেছিলেন, তার পর আর কেউ এল না। ওদের বাপ-মা তারাপ্রসন্নকে বলে দিয়েছেন, অত দূরে ছেলেদের পাঠানো আর নাকি তাঁদের সুবিধে হবে না। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

মনের ক্রিয়া বুঝি শরীরেও ছোঁয়াচ লাগায়। কী জানি কী হল! হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলাম। জ্বর ছাড়ে না, রেমিটেণ্ট ফিভার। রামেন্দ্রসুন্দর হোমিওপ্যাথির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ডাক্তার ডি. এন. রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা রোজই আসেন। আমাদের লালগোলার সবাই অ্যালোপ্যাথির ভক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর আমার মা-বাবাকে খবর দিলেন না, ঠাকুরদাদাকেও না—কী জানি, যদি তাঁরা অস্থির হন! নিজেও কলেজে ছুটি নিলেন। লোকজন এলে উঠে গিয়ে তাদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিদায় করে আবার এসে চেয়ারে বসে বই পড়েন—মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে কী ভাবেন, নানীও তাঁর গৃহস্থালীর কাজকর্ম গিরিজা মাসীর উপর ছেড়ে দিয়ে হরদম আমার শয্যাপার্শ্বে থাকেন। নিয়মিত স্নান-আহ্নিক পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সময় একদিন শুনেছিলাম তিনি নানাকে বলছেন: তোমার কাছে তো একসঙ্গে বসবার বরাত করে আসি নি, ভাগ্যে খোকার অসুখ হয়েছিল!

নানীকে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, আর কিছুদিন তোমার এই ভাগ্যটা বজায় থাকলে আমি যে আর টিঁকব না। আর যে পারি না নানী, আমার বড় কষ্ট!

বালাই, ষষ্ঠীর ধন—ও-কথা মুখে আনতে নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে একটানা অমনভাবে কখনও বসতে পান নি বলেই তিনি দুঃখের সঙ্গে ওই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গীটা অন্য রকম শুনিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেই নানীকে আবার বললাম, শৈল অমিয় অবনীরাও আর আসে না, কতদিন যে তাদের দেখি নি—একবার তাদের খবর পাঠিয়ে দাও না।

আচ্ছা, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারাপ্রসন্ন গিয়েছিল, গাড়ি করে তাদের নিয়ে এসে আবার ঠিক তেমনিভাবেই পৌঁছে দেবে; কিন্তু তাদের বাপ-মা রোগীর কাছে পাঠাতে নাকি সাহস করেন নি।

আমি কষ্ট পাব বলে এ কথা তখন কেউ বলে নি, অনেক পরে ভাল হয়ে শুনেছিলাম। সংসারে এমনি হয়ে থাকে, যাদের জন্য আকাশ-ভরা কান্না চোখ ছাপিয়ে ঝরে যায়, তারা ফিরেও চায় না।

পক্ষাধিক কাল কেটে গেল, জ্বর যেন আমার শরীরে কায়েমী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, ছাড়বার নামগন্ধ নেই। ঘিও ঘুরে-ফিরে আমার কাছে আসে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জলভরা চোখ নিয়ে ফিরে যায়।

মাঝে মাঝে মাংস খাবার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ও নানীকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতাম। অসুখ হলেই যত কিছু খেতে ইচ্ছে হয়—আমারও তাই হয়েছিল। নানা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, জান, তোমার অসুখের পর বাড়িতে মাংস আনা হয় নি! তুমি খেতে ভালবাস বলেই তোমার নানী বারণ করে দিয়েছেন।

নানার মুখে এই সব সাংসারিক কথা শুনে সেদিন একটু অবাক হয়েছিলাম বইকি!

রামেন্দ্রসুন্দর এদিকে দশ-বারো দিন আমাদের বাড়িতে কিছু খবর বা পত্র দেন নি। ঠাকুরদা আর কারও চিঠিতে জানতে পেরেছিলেন, আমার কঠিন অসুখ। তাই সসঙ্কোচে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখলেন: শুনলাম, খোকার খুব অসুখ, আপনি যদি ভাল বিবেচনা করেন, তা হলে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখালে মন্দ হয় না। আমার ঠাকুরদা রামেন্দ্রসুন্দরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন।

নানাও পত্র পেয়ে ডাক্তার নীলরতন সরকারকে ডেকে পাঠালেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা শুরু হল। কী বিশ্রী তেতো ওষুধ রে বাবা! কুইনিন মিকশ্চার সেবন

করা আমার অসাধ্য। নানা ও নানীকে বললাম, তোমাদের সামনে ওষুধ খাব না, পণ্ডিত মশাই আমাকে ওষুধ খাইয়ে যাবেন।

একেই রোগী, আর জেদ বাড়িয়ে কাজ নেই, তাই নানাও রাজী হলেন। নিবারণ পণ্ডিত মশাই পিতৃদেবকেও ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন—এখন এখানে এসেছেন আমাকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে। তাই হল, তিনি এলেই নানী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন—নানাও তাঁর সঙ্গে। পণ্ডিত মশাইকে বলতাম, আপনি চোখ বন্ধ করুন, আমি ঢক করে গিলে ফেলি।

পণ্ডিত মানুষ, অত ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারেন না, তিনি নিমীলিতচোখ হওয়া মাত্রই, আমি ওষুধ ডাবরে ফেলে দিয়ে কুইনিন-সেবনের মত মুখের বিশ্রী ভঙ্গী দেখিয়ে 'ব্যাবা রে, ম্যা রে, অস্ফুট শব্দ উচ্চারণের পরেই শয্যায় লুটিয়ে পড়তাম। পণ্ডিত মশাই মহাখুশী হয়ে বলতেন, তোর বাবার হাতেখড়ি দিয়েছি, তুই আমাকে ভক্তি করবি না তো কী?

আবার নানী এসে বসতেন। এত করেও জর ছাড়ল না দেখে, একদিন আমায়-মানুষ-করা চাকর দামোদরের মনে সন্দেহ হল। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আমার ম্যাজিক স্বচক্ষে দেখেই সব মালুম হয়ে গেল তার। দ্বিতীয়বার কুইনিন-সেবনের সময় নানা-নানী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দামোদর তাঁদের সব কথা খুলে বলল আর জানলার ধারে তাঁদের দাঁড় করিয়ে আমার হাতসাফাই বিদ্যেটা ধরিয়ে দিল। সেদিনও পণ্ডিত মশাই যথানিয়মে চক্ষু মুদ্রিত করেছেন, আমিও যথানিয়মে ওষুধ ঢালতে যাব, এমন সময় 'ও কী', 'ও কী'—নানা ও নানীর দ্বৈতকণ্ঠের আকুলিবিকুলি শোনা গেল। তাঁরা আমার ঘরে ঢুকেই বললেন, আর এক দাগ মিকশ্চার ঢেলে আমাদের সামনে খাও।

রামেন্দ্রসুন্দর পণ্ডিত মশাইকে সব কথা বুঝিয়ে বলতেই তিনি হরদম অর্কফলায় হাত বুলিয়ে চলেছেন—কথা বলবার সময় তাঁর একটা বদ অভ্যাস ছিল, বারংবার নিজের টিকি ধরে নিজেই টানা। উত্তেজিত হলে তো কথাই নেই।

সেদিন নানার বকুনি খাই নি, বরং মোলায়েম স্বরে বললেন, এত ধুরন্ধরি তোমার কেন বল তো? তুমিও কষ্ট পাচ্ছ, আমরাও পাচ্ছি। উঃ, কী বুদ্ধি! ভাল কাজে লাগলে যে সোনা ফলত।

এবার থেকে রামেন্দ্রসুন্দর, নানী ও দামোদর-বেষ্টিত চক্রব্যূহের মধ্যে কুইনিন মিকশ্চার গিলতে লাগলাম, তা ছাড়া উপায় কী? মুখ হাঁ করে দেখিয়ে তবে

কুলকুচো করতে হত। আটাশ দিনের দিন আমার জ্বর ছাড়ল। সবারই ধড়ে প্রাণ এল। আমি রামেন্দ্রসুন্দরের সামনেই নানীর আঁচল টেনে বললাম, তা হলে আজ থেকে তোমার দুর্ভাগ্য শুরু হল, কী বল নানী?

তিনি জিভ কেটে আঙুল মটকে বললেন, দুর্ভাগ্য কী দুঃখে হতে যাবে? শত্তুরের হোক, শত্তুরের হোক, অমন কথা বলতে নেই, ছিঃ!

রামেন্দ্রসুন্দর হেসে উঠে গেলেন। যাবার সময় বললেন, শত্তুরেরই বা হতে যাবে কেন?

আমাকে বিজর দেখে নিবারণ পণ্ডিতের মুখেও হাসি ফুটল। সাদাসিধে, নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ফলারে এবং ফলাহারে যা কিছু আসক্তি—বিশেষ আম্রপর্বে অত্যধিক উৎসাহ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু হতে আষাঢ়ের শেষ পর্যন্ত আমাদের বাগান থেকে প্রচুর আম ঠাকুরদা পাঠিয়ে দিতেন। মুর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত। প্রত্যেক দশ দিন অন্তর বাইশ ঝুড়ি আম লোক মারফত কলকাতায় আসত। এক এক টুকরিতে শতাধিক আম। একটা বিষয় আমি চিরদিন লক্ষ্য করেছি, যাঁদের সঙ্গে ঠাকুরদার ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় ছিল, প্রত্যেক বছরেই তাঁদের বাড়িতে তিনি আম পাঠাতেন। শুধু নিজের গ্রামে নয়, সমস্ত জেলায় এই ধরনের আম বিতরণ চলত। তা ছাড়া বিকেলের দিকে অনেককে ডেকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন। সবার মাঝখানে বসে তিনি স্বহস্তে আম ছাড়িয়ে দিতেন, আর পরিবেশনকারীরা সবার পাতায় সেগুলো দিয়ে যেত। সে কী ধুম, রীতিমত কমপিটিশন—কে কত খেতে পারে দেখা যাক। স্কুলের ছাত্র মাস্টার কেউ বাদ পড়ত না।

নিবারণ পণ্ডিত এ ব্যাপারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। একাসনে বসে, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে তিনি গোনাগুনতি পঁচাশীটা আম খেয়ে তবে উঠতেন।

তাই কলকাতায়ও তাঁর জন্যে দাদুর নির্দেশমত দু টুকরি আম নিয়মিত আসত। আমের সময় অন্য কিছু আহারে তাঁর রুচি ছিল না। দু ঝুড়ি আমে দু-একদিন চলবে বই তো নয়, যাই হোক, তবু তো পিত্তি রক্ষে হয়।

বাকি বিশ ঝুড়ি আম কী হবে? আমাদের বাড়ির সমস্ত লোক খেয়েও ফুরোতে পারে না। তাই নানা যখন একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসেছেন, নানী জিজ্ঞেস করলেন, লালগোলার আম আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বিলি করে, পাড়ার লোকজনদের

দিয়ে-থুয়েও যে অনেক বেঁচে যায়, কী করি বল তো ? তুমি যদি কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে দিতে চাও তো বল, পাঠিয়ে দিই ! দশ দিন অন্তরই তো ঝুড়ি-ঝুড়ি আম আসছে। সারা বছরের জন্যে আমসত্ত্ব করে রাখি, তুমি খেতে ভালবাস, তোমার মেয়ে, নাতি-নাতনীরাও খুব পছন্দ করে, জিভের তাক তো কারু কম নয়।

আমার প্রশ্নগুলো প্রায়ই উদ্ভট হয়ে উঠত। নানী থামতেই নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা নানা, কাঁঠালসত্ত্ব হয় না ?

এ সব বিষয়ে নানার ব্যুৎপত্তি বোধ হয় আমারই মত। তিনি নিরুত্তর। অসহায় চোখ দুটি তুলে নানীর দিকে চাইলেন। ইন্দুপ্রভা দেবী রামেন্দ্রসুন্দরের হয়ে জবাব দিলেন, কাঁঠালসত্ত্ব হয় না রে ভাই, তবে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান যায়, বলিস তো, তোকেও অমনি করে পাকিয়ে ছেড়ে দি।

এতগুলো কথা নানী বলে গেলেন, নানার মুখে ভাষা নেই—আশার আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তিনি অন্য কোনও কথার জবাব না দিয়ে মাথা চুলকে বললেন, দেখ, পাঠাতে গেলে তো তোমার বিশ ঝুড়ি আমেও কুলোবে না, তবে এক কাজ করলে হয়, দু ঝাঁকা সাহিত্য-পরিষদে দিলে মন্দ হয় না, প্রত্যেক শনিবারে সবাই খাবে।

আমিও নানার সঙ্গে খেতে বসেছি, নানী দুটি আম কেটে সামনে রেখেই বললেন, নে, খেয়ে নে, এটার নাম রাণীভোগ, আর ওটা গোপালভোগ। একটুকরো মুখে ফেলেই বললাম, এটা যে পাপের ভোগ ! কী টক আম রে বাবাঃ। নানা, অমন কাজ কোরো না, এই রকম বন্ধু-বিচ্ছেদ আম পাঠালেই কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত। তার চেয়ে বরং পরিষদের একটা ঘরে রেস্তোরাঁ খুলে দাও, ফাউল কাটলেট, চপের কাটতি পুরোদমে চলবে। ভিন জাতের লোকও হবে অঢেল, পরিষদের ঘরে আর ভিড় ঠেলে যাওয়া যাবে না, সেটা দেখে তোমারও আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হবে, কী বল নানা ? তবে কিন্তু তোমার সভা-সমিতি মাথায় উঠবে।

রামেন্দ্রসুন্দর আপাততঃ চর্বণ স্থগিত রেখে অবাক্। আমার গায়ে-পড়া বিচক্ষণ ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বললেন, তোমাকে গলগল করে এ সব কথা কে যে বলায় বুঝতে পারি না ! ঠিক বলেছ, ওসব হাঙ্গামায় গিয়ে কাজ নেই।

মনে মনে ভাবলাম, আমিও তা হলে একজন কেউকেটা হয়ে উঠলাম, নইলে নানা আমার কথা শুনবেন কেন ?

ইতিমধ্যে নানী পাপের ভোগের থালাটা বদলে, আর এক ডিস সুস্বাদু আম, আগে চেখে দেখে, আমার জন্যে কেটে আনলেন।

শেষের দিকটায় আমের সঙ্গে আবার দু বস্তা করে কাঁঠালও আসত। একটা বস্তা খুলে সব কাঁঠাল মাঝ উঠনে সাজানো হয়েছে, হঠাৎ খেয়াল হল—সুনীলকে দিলে হয় না! মনে এলেই সেটা তো কাজে পরিণত করা চাই। খুব ভাল পাকা দেখে দুটি ছোট-বড় কাঁঠাল বেছে নিলাম। পরস্পরের সাহায্যে একটি নিজের মস্তকে অপরটি ঘিয়ের মাথায় চাপিয়ে নিলাম। আমারটি যেন গন্ধমাদন পর্বতের ভার। আমরা এগিয়ে যাই—মাথায় কাঁটা ফোটে, তাই এক-একটা গামছার বিঁড়ে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে নিয়েছি।

ইন্দুপ্রভা দেবী রামেন্দ্রসুন্দরকে ডেকে এনে ওপর থেকে আমাদের কসরত দেখিয়ে দিলেন। সেদিকে অবশ্য আমাদের নজর ছিল না।

হঠাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ কানে এল : ওটা আবার কী হচ্ছে ?

ব্যস্, আমরাও নিশ্চল !

ঘি তার মাথার কাঁঠালটা মাটিতে আছড়ে ফেলতেই সেটা ভেঙে কোয়া আর ভুতড়িগুলো উঠোনময় ছড়িয়ে পড়ল। আর আমার অবস্থা ?

মাথায় কাঁঠাল ভাঙা একটা প্রবাদ আছে—কিন্তু আমি নিজের মাথায় সেই প্রক্রিয়া চালাব, এ সঙ্কল্প মোটেই ছিল না। তবু পাকা কাঁঠাল নিজের ভারে নিজেই দু টুকরো হয়ে ভেঙে আমারই মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল, তার রস আমার সর্বাঙ্গে চোখে মুখে গড়িয়ে পড়ে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা—সে কী অপরূপ মূর্তি !

আবার প্রশ্ন : চুপ করে রইলে কেন ? বলই না, কী উদ্দেশ্য !

চোর ধরা পড়লে যা হয়—ঠিক তেমনই আমার ঠোঁট নড়ে ওঠে—কথা বেরোয় না।

অ্যাঁ, কী বলতে চাও—একটু জোরেই বল না—

সুনীলকে দেবার জন্যে—

তা বলতে কী হয় ? না বলে-কয়ে, পা টিপে টিপে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কেন ? তোমার নানীকে বললেই হত।

মুখে কথা নেই।

তিনি আমাদের পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আর একবার হেসে উঠে বললেন, তা বেশ তো, ওগুলো তো আর দেওয়া যাবে না, আর দুটো কাঁঠাল ঠিক এমনি করে মাথায় নিয়ে নিজেরাই ওদের বাড়িতে দিয়ে এস।

আর দেখে কে ! মহানন্দে পরস্পরের মাথায় কাঁঠাল তুলে নিয়ে ছুটে চললাম—

আমি আর আমার লেফটেনাণ্ট ঘি—সুনীলের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

অসুখের কথা বলছিলাম, আমার মত ছটফটে মানুষ সুদীর্ঘ মাসাবধিকাল শয্যাশায়ী—এ যেন ভাবতেই পারা যায় না। তবু ঠ্যালায় পড়লে বাঘেও ধান খায়—আমারও সেই অবস্থা। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হতেই পুজোর ছুটি এসে পড়ল।

বছরের মধ্যে দশ মাস আমি কলকাতায় নানার কাছেই থাকতাম। গ্রীষ্মাবকাশ আর পুজোর ছুটি, এই দুটো মাস মাত্র লালগোলায় কাটাতাম। কিন্তু সেখানেও আমার কলকাতার গৃহশিক্ষক গঙ্গাধরবাবু সঙ্গে যেতেন, যেন পড়াশুনায় এতটুকু গাফিলতি বা কামাই না হয়।

এবার ঠিক হল, আমাকে তাঁর দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবেন—তাঁর ফিরবার দশ দিন আগেই লালগোলায় পাঠিয়ে দেবেন। ওই কটা দিন সেখানে থেকে আমি সোজা কলকাতায় আসব। স্থান পরিবর্তনও হবে, তা ছাড়া ওই গ্রামেই আমার মাতুলালয়। অনেক তরফে আমার সমবয়সী মাতুল আছেন—তাদের সঙ্গে খেলাধুলো, দৌড়-ঝাঁপের সুবিধে মিলবে—এই ভেবে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

গিরিজা মাসী তাঁর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। নানা, নানী, ঘি, উমাপতি বাজপেয়ী আর আমি সবাই খুব সোরগোল করে স্টেশনে গেলাম।

তারাপ্রসন্নবাবু সঙ্গে থাকবেনই। পথের যাওয়া-আসা ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর চিরদিন নাবালক ছিলেন—তাই তারাবাবু আজ সকলেরই যেন অভিভাবক। তাঁকে কেউ না বললেও জিনিসপত্তরের জিম্মা তিনি স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে চাপিয়ে নিয়েছেন—কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করা, ছ্যাকড়া গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া, যতসব গন্ডময় কাজের ভার নিয়ে তাড়াহুড়ো শুরু করে দিয়েছেন। এক বগলে মাসীমার ছেলেকে চেপে ধরে, আর একটি হাত ছুঁড়ে শেয়ালদায় কুলীদের সঙ্গে টাকা-আনা-পাই নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি, কারণে অকারণে চীৎকার, আবার ততোধিক অকারণে কলহক্ষান্তি—তার মাঝেই নানার কণ্ঠ শোনা যায়, আঃ তারাপ্রসন্ন, কর কী? ওরা গরীব মানুষ, যা দেবার দিয়ে দাও। কে কার কথা শোনে—আজ তারাবাবু সুবন্দোবস্তের চরম পরাকাষ্ঠা না দেখিয়ে ছাড়বেন না—জিনিসপত্তর, পোঁটলা-পুঁটলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা, ছেলেপিলেদের দুধ-বার্লি গিরিজা মাসীর কাছে এগিয়ে দেওয়া—মাসীমার কোলে ছেলে দিয়ে আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কিছু ফলমূল সন্দেশ কিনে এনে সাড়ে বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করেই নানীর সামনে রাখা—

এই রকম কত কসরতই না তিনি আজ দেখিয়ে চলেছেন। মাঝে-মাঝে নাবালক রামেন্দ্রসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো বড়বাবু?

এক কোণে উপবিষ্ট নানা বইয়ের পাতা থেকে মুখ না তুলেই উত্তর-দক্ষিণে মস্তক আন্দোলিত করলেন।

ট্রেন ছাড়বার আগেই তারাবাবু সবাইকে বললেন, আমি পাশের সার্ভেণ্ট ক্লাসে আছি, দরকার হলেই গলা বাড়িয়ে ডাক দেবেন।

তার পরই একটা সগর্ব দৃষ্টিপাত—তার অর্থ—দেখলে তো আমার কিস্মত? যে সে লোক নই, বুঝলে? তারপরই বাঁশীর আওয়াজ হতেই মৃদু চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পাশের কামরায় অন্তর্ধান।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে নানার হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে নানীকে বললাম, এবার যত পার, নানার সঙ্গে গল্প কর। এক মাসের জন্যে পরিষদের ঝামেলা থাকবে না—আর রোজ লোকজনের মেলাও বসবে না। এই সেদিন বলেছিলে না, কী ভাগ্যে খোকার অসুখ হল, আজ আমিও বলছি, কী ভাগ্যে বছরে একবার পুজোর ছুটি হয়।

কী কুক্ষণেই না কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, কী ছেলে রে বাবা—ভোলবার নামটি নেই!

তারপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে নানী ছড়া কেটে বললেন, কোথায় যাবে গোপাল—না, সঙ্গে যাবে কপাল। তোর নানাকেই জিজ্ঞেস কর্—আমার এখানেও যা, সেখানেও তাই।

নানার কোল ঘেঁষে বললাম, যারা তোমার কাছে আসে তাদের সঙ্গে তো বেশ হেসে কত কী সব কথা বলে যাও—আর নানীর বেলায়—

মাঝপথে আমার চলতি মুখ থামিয়ে দিলেন নানা: থাক্, আর ওকালতি করে কাজ নেই।

চারদিকে আণ্ডা-বাচ্চার চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগেই রয়েছে, সেদিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই—ট্রেনের সেই চলমান বাজারের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দর আবার কেতাব খুলে বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই কামরার ক্ষীণ আলোকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেই বইটা মুড়ে রেখে দিয়ে পাশ ফিরে সটান শুয়ে পড়লেন। কে খেল না খেল, কার সুবিধে অসুবিধে, কে শুয়েছে আর না শুয়েছে, সেদিকে মোটেই দৃকপাত নেই।

বলা বাহুল্য, প্রথম কয়েকটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই শোনা যায় উদ্গ্রীব

তারাপ্রসন্নের গলা বাড়িয়ে সকলের কুশল-সমাচার প্রশ্ন। যে রকম তোড়জোড় করে তিনি শেয়ালদা স্টেশনে আমাদের মত নাবালকদের হাত ধরে গাড়িতে তুলেছিলেন— ঠিক তেমনি করেই গঙ্গা পার করে লট-বহর সমেত এই জীবন্ত লগেজগুলি নিয়ে সশরীরে এবং বহাল তবিয়তে জেমোয় নিরাপদে পৌছে দিলেন, আর নিজেও মাসখানেকের জন্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসলেন।

সেখানে অনেক সমবয়সী মাতুল, মামাতো, মাসতুতো ভাইবোন পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। সাইকেল রেস, সাঁতার কাটা, লং জাম্প, হাই জাম্প, হার্ডল রেস প্রভৃতি উদ্দামভাবে চলতে থাকে, মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দর নূতন বাড়ির রাস্তার ধারে একটি চেয়ারে কেতাব হাতে বসে আমাদের খেলাধূলা পরিদর্শন করেন, কী বই পড়তেন সেটা দেখবার সময় ছিল না।

যেখানে তাঁর প্রকাণ্ড লম্বা বৈঠকখানা, সেখানেও ঘরের চারিদিকে বড় বড় আলমারি ভর্তি বই। হলে ঢুকতে বাঁ দিকের কুঠরীতে থাকতেন নীলকমল ত্রিবেদী— ডাইনের অনুরূপ কক্ষে থাকতেন দুর্গাদাস ত্রিবেদী।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জ্ঞানযোগী, আর দুর্গাদাস ছিলেন কর্মযোগী, নীলকমলের ছিল ভক্তিযোগ। তিন ভাই মিলে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

জেমো রাজবাড়িতে অনেক তরফ। সব তরফেই দুর্গোৎসব মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরকে একদিনের জন্যেও ঘটা করে তাঁর নিজের বাড়ির পূজামণ্ডপে দেখি নি। তিনি সেই চিরন্তন পাঠ-যজ্ঞে মগ্ন। শুধু বিজয়ার দিনে তাঁর মাতৃচরণে প্রণাম করে বললেন, এই তো আমার সাক্ষাৎ মাতৃপূজা।

পদ্মমা একটুখানি সিদ্ধি হাতে নিয়ে নানার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন, আর আমার জিভের ডগায় ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন, নে, একটু চেখে নে, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে।

আমিও কথার ইঞ্জিন চালিয়ে দিলাম: কেন? কারো বুদ্ধি বাড়তে তো দেখলাম না। আজ বিকেলে সব তরফের মাতুল আর মামাতো ভাইরা ঘটি ঘটি সিদ্ধি খেয়েছে। জান? একটা ভোজপুরী দরোয়ান ভুঁড়ি বের করে পেস্তা বাদাম সিদ্ধি শিল-নোড়ায় খুব আচ্ছাসে বেটে, দুধ চিনি মিশিয়ে এক এক জনের হাতে দিচ্ছে। আর সবাই ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। ঘুরে ফিরে আবার গিয়ে দেখি, কেউ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, কেউ বা হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছে, কেউ প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। আর বুঝলে নানা, মধ্যম মামা আবার তারাপ্রসন্নবাবুকেও জোর

করে গিলিয়ে দিয়েছে। যাও না, বাইরের কুঠরীতে গিয়ে দেখ, তারাবাবু কী সব আবোল-তাবোল বকছে—

রামেন্দ্রসুন্দর প্রমাদ গনলেন : তোমার এই সব দেখা হচ্ছিল বুঝি ?

বাঃ রে, দেখব না ? সার্কাসে সেই যেমন ক্লাউন দেখেছিলাম, এরা তাদের চেয়েও এককাঠি সরেস। বল না কেন অমন হয় ?

রামেন্দ্রসুন্দর আমার কথার উত্তর না দিয়ে, তাঁর জননীকে বললেন, হল তো মা, এবার খোকা 'কেন'র শ্রাদ্ধ না করে ছাড়বে না !

তারা আমাকেও দিতে এসেছিল, আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

বেশ করেছ, ওসব যারা খায়, তাদের কাছে যেও না।

·বাঁচলাম ; তা হলে, তারাবাবুর কাছেও আর যাব না ?

আর পারি নে বাবা, কৈফিয়ত দিতে প্রাণান্ত।

বিজয়ার পরদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল ! পাঁচ তরফের এক ঝাঁক মাতুল রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করতে এলেন। বৈঠকখানা ঘরে একটা টানা পাখা টাঙান ছিল। সেদিন নানার প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বাইরের ঘরে আসতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে।

মাতুলদের কথা অনেক কিছুই শোনা গেল। লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, হৈ-হুল্লোড় পেলে আর কিছু চান না, এর মধ্যে অনেকেই সিগারেটের টানে পোক্ত হয়ে উঠেছেন, শুধু বিজয়ার দিনে নয়, সিদ্ধির শরবত তাঁদের মধ্যে কারও কারও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, তাঁরা হীন কিংবা নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, দরাজ মনে দরাজ হাতে হরদম চলতেন। আমার চেয়ে কেউ বা দু-এক বছরের বড়, কেউ সমবয়সী, কেউ বা ছোট।

সে সময় দুর্গাদাস ও নীলকমল ত্রিবেদী প্রণম্যদের প্রণাম করতে বেরিয়েছেন। বাইরের ঘরে কেউ নেই। সেই সব মাতুলের দল দুটো ছোকরা চাকরকে দু দু গুণে চার টাকা বকশিশ কবুল করে, সেই টানা পাখার লম্বা কাঠের ওপর দু ধারে দু জনকে বসিয়ে, দশ বার জন মাতুল দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টানে খুব জোরসে পাখা টানার কসরত শুরু করে দিলে। হাহা, হিহি, হুহু, বিভিন্ন জাতের হাসিতে নরক গুলজার। আমি তাদের এই অপরূপ উদ্ভাবনী শক্তি দেখে প্রথমটা 'থ' মেরে গেলাম, তার পরই পাগলের মত ছুটে গিয়ে নানার হাত ধরে টেনে আনি।

পাখাটি শূন্যে আড় হয়ে তখনও দুলছে। ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে

বালক-ভৃত্য দুটি বিকট আর্তধ্বনির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বসবার পুরু গদির ওপর দুজনেই পপাত, বাপরে মারে গেলাম রে চীৎকার।

নানা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, হাতের লাঠিটাই ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জানলার একটা কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। নানা হুঙ্কার দিয়ে আবার পায়ের চটি খুলে নিক্ষেপ করলেন। ততক্ষণে মাতুল-গোষ্ঠীর উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। বিজয়ার পর যারা প্রণাম করতে আসে তারা মিষ্টিমুখ করে ফিরে যায়, এই নগদ দক্ষিণার বহর দেখে আমার মাতুল-গোষ্ঠীর তখন আর প্রণাম করা হল না।

সকালের রাগ আর বিকেলে নেই, সেদিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইন্দুপ্রভা দেবীকে সামনে রেখে, মাতুলবর্গ এসে রামেন্দ্রসুন্দরের পদধূলি নিতেই, তিনি নানীকে বললেন, যাও, এদের সব মিষ্টি খাইয়ে দাও।

আর এক দল ওপরের ধাপের মাতুলের কালচারে তেমন অনুরাগ না থাকলেও এগ্রিকালচারে বিশেষ ঝোঁক ছিল। এক, বাগানের পেছনেই কয়েক হাজার টাকা খরচা করতেন, তবে ফুলের বাগান নয়, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুনের বাগান। তার হিসেবও খুব কড়া, প্রত্যেকটির ওপর আঠা দিয়ে টিকিট এঁটে নম্বর দেওয়া থাকত, বাগান পরিদর্শনের সময় নোটবুকে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখা হত, অমুক নম্বর বেগুন eaten by হনুমান and some half-eaten। এত নম্বর কপি stolen by thieves আর অমুক অমুক নম্বর missing। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠে এই পরিদর্শন ও লিপিবদ্ধ করা ছিল তাঁদের কাজ।

একদিন তাই না দেখে রামেন্দ্রসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করলাম, নানা, এ সবের মানে কী, অযথা খাটুনি, এত গলদ্‌ঘর্ম, এত গবেষণাই বা কিসের?

নানা আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন: অ্যাঁ, কী বলছ?

কথার পুনরুক্তি করলাম।

তিনি বললেন, Idle brain is the workshop of devils.

আবার বাংলাতেও বললেন, অলস মস্তিষ্কই হচ্ছে শয়তানের কারখানা।

একটি আশ্চর্যের বিষয় দেখলাম, লক্ষ্মী পুজো হতে আরম্ভ করে কালী পুজো পর্যন্ত নানা তাস খেলতেন। আমি তো অবাক্, এ কী তাজ্জব কাণ্ড! নানার হাতে তাস? নানা আবার তাস খেলতেও জানেন না কি? কই কখনও তো এর আগে এসব ছুঁতে দেখি নি। তখনই ছুটোছুটি করে, অনেক কষ্টে খোঁজ নিয়ে জানলাম খেলার নাম হচ্ছে প্রেমারা।

বাঃ, বেশ কবিতা-ঘেঁষা নামটি তো! এটা নাকি তাঁদের কৌলিক প্রথা, লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে আরম্ভ করে কালী পুজোর রাত পর্যন্ত রোজ খেলতে হয়। সন্ধ্যার সময় আসর বসে, তিন চার জন বৃদ্ধ আসতেন, একজন উমাপতি বাজপেয়ীর পিতৃদেব বসন্তলাল বাজপেয়ী, একজন তাঁর ভায়রা-ভাই আবক্ষলম্বিত দীর্ঘশ্মশ্রু নৃপতিনাথ ত্রিবেদী, আর একজন তাঁর সহপাঠী রাজা শরদিন্দুনারায়ণ, তিনি ও রামেন্দ্রসুন্দর পরস্পরের ভগ্নিপতি। আরও দু একজন কে আসতেন নাম মনে নেই। আবার শুধু তাস খেলা নয়, পয়সা দিয়ে রীতিমত জুয়া খেলা। আমার তো চক্ষু স্থির! ছুটে একবার নানীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, সদুত্তর পেলাম না। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, নানার কাছে চুপ করে বসে রইলাম। নানা কখনও পয়সা কুড়িয়ে নিচ্ছেন, আবার কখনও বা পয়সা বের করে দিচ্ছেন।

সব চলে যাবার পর নানাকে ধরে বসলাম: এ কি নানা, তুমি জুয়ো খেল? তুমি না একদিন বলেছিলে, জুয়োখেলা মহাপাপ? একবার বড়দিনে নানী তারাবাবুকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে আর ঘিকে পাঠিয়েছিল, ছ্যাকড়া গাড়ির ছাদে বসে সেদিন আমরা গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় দেখেছিলাম। জানতে পেরে তুমি কত বকেছিলে। তুমিই না বলেছিলে ওসব ঘোড়দৌড় হচ্ছে জুয়াখেলা, ওসব দেখতে নেই, খেলতেও নেই। নানীকেও বারণ করে দিয়েছিলে যাতে এসব রেসটেস দেখতে আর কখন পাঠানো না হয়, আর তুমি নিজেই কিনা—

আমার মুখে তখন তুবড়ি ছুটছিল, নানা বাধা দিয়ে বললেন, অত বকবক করে না, মাতৃআজ্ঞা, তাই পনরো দিন বাজা রেখে তাস খেলতে হয়।

তুমিও যদি এই কথা বল, তবে—

রামেন্দ্রসুন্দর আবার জোর দিয়ে বললেন, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

পদ্মমার কাছে জানতে ছুটে গেলাম।

তুমি নানাকে জুয়ো খেলতে বলেছ?

তিনি আদর করে কোলে টেনে বললেন, হ্যাঁরে হ্যাঁ, এ একটা কৌলিক প্রথা, আমি রামকে খেলতে বলেছি মাত্র এই কটা দিন, আর তাও ঘরে বসে খেলা।

ফ্যালফ্যাল করে পদ্মমার দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় রামেন্দ্রসুন্দর বাড়ির মধ্যে খেতে এলেন।

পদ্মমা নানাকে ডেকে বললেন, ওরে রাম, তোর নাতি কী জিজ্ঞেস করছে,

একবার শোন্! কিছু না শুনেই নানা উত্তর দিলেন, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তাই যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে বুঝি? কোন কথা একবার কানে পড়লে তো আর নিস্তার নেই, ভাল করে খুঁটিনাটি জেনে শুনে তবে ওর সুনিদ্রা হয়।

একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ছাড়া আর সবাই এখন বেকার, হাতে কারও কোন কাজ নেই। তাই একদিন তারাপ্রসন্নের সঙ্গে উমাপতি বাজপেয়ীর ঘোর তর্ক বেধে গেল, মাইকেল বড়, না, রবীন্দ্রনাথ বড়? দুজনেই যুক্তির পর যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন, সমস্যার সমাধান হয় না। শেষটায় নানার দরবারে দুজনেই হাজির, নিজের নিজের আরজি পেশ করতেই নানা ধ্যান-নিমীলিত চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত করেই আবার মুদ্রিত করলেন। নিমেষে এই দুই মহাকবির পার্থক্য বুঝিয়ে বললেন, মাইকেল হলেন বাঁশ আর রবীন্দ্রনাথ হলেন চৌকি।

উপমা শুনেই আমার চক্ষুস্থির, নানাকে ধরে বসলাম: এর মানে কী? সোজা কথায় বুঝিয়ে দাও।

রামেন্দ্রসুন্দর এই রূপকের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলেন, তা আজও আমার মনে আছে।

মাইকেলের প্রতিভা একমুখী, সবল, সতেজে ঊর্ধ্বে উঠেছে, আর রবীন্দ্রনাথ হলেন চার-চৌকশ সর্বতোমুখী প্রতিভা, সর্বদিকেই সমান শক্তিশালী।

জেমোতে আমার কুড়িদিন থাকবার কথা, কিন্তু বহুগুণান্বিত মাতুলগণের সংসর্গে ও দৃষ্টান্তে পাছে আমার ভাবগতিকও তাদের মতই হয়ে ওঠে, তাই দিন দশেক যেতে না যেতেই, নানা আমাকে তারাপ্রসন্নবাবুর মারফত লালগোলায় চালান করে দিলেন।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে গেল। মা-বাবা-বোনদের ছেড়ে যেতে হবে, তার ওপরে পার্শিবাগানের সেই অজানা পরিবেশের মধ্যে গিয়ে আবার পড়ব, মনের অবস্থা খুব খারাপ।

মা, বাবা, ঠাকুরদা বুঝিয়ে বললেন, যার জন্যে তুমি কলকাতায় আছ, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ফিরে এসো, তবেই তো সব সার্থক। অত বড় বিদ্বান পণ্ডিতের কাছে থাকা ক জনের ভাগ্যে জোটে, তাঁর বাতাসে তোমার মঙ্গল হবেই।

আপন মনেই বলি, সবই তো শুনলাম, তবু সঙ্গীহারা হয়ে থাকার দুঃখটা কে বুঝবে? নানার মত চব্বিশ ঘণ্টা লেখাপড়া নিয়ে তো আর থাকা যায় না! কান্নাকাটি করে ট্রেনে উঠলাম।

কলকাতায় এসে দেখি ঘি এসেছে, বাঁচলাম। যা হোক, একজন তো মনের মত সঙ্গী পেয়েছি। আর এসেছে তারই ছোট ভাই মণীন্দ্রগোপাল, ডাক নাম 'দুম্বা'।

নামের সঙ্গে দেহের সাদৃশ্য আছে, বেশ নাদুস্ নুদুস্ গড়ন। ওই নামের সার্থকতাও আছে। সবারই পিঠে দুমদাম করে কিল মারত বলেই তার নাম হয়েছিল দুম্বা। প্রচুর খেতে পারত, এই ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চঞ্চলতায় দেখলাম, সে আমাকেও টেক্কা দেয়, খুবই ছটফটে আর দুষ্টু। আজ তার কিছুমাত্র নেই, তবে উদরসমস্যায় এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি। থালার পর থালা শেষ করে দেয়, শরীরে শক্তিও অসীম। দুম্বাকে নিয়ে আমার পোষাবে কি না, সে সব চিন্তা না করেই তাকে আমার খেলার সভ্যভুক্ত করে নিলাম, কী আর করি!

দুম্বা একদিন এক চাকরকে রামখাসী বলে গাল দিয়ে বসল। যথারীতি শাস্তিবিধান হল বটে, কিন্তু আমি ভাবলাম, রামপাখি তো শোনা যায়, আবার রামখাসী? সেটা কী বস্তু রে বাবা! নানাকে গিয়ে বললাম, পদ্মমা তোমাকে রাম বলে ডাকেন, আবার খাসী তার সঙ্গে এল কেমন করে? দুম্বার ইংরিজী তো Ram? সে নিজে ভেড়া হয়ে আবার রামখাসী বলে কী সাহসে?

নানা কী উত্তর দিতেন জানি না, ঠিক এমনি সময় পাশের বাড়ির কে একজন হেঁড়ে-গলায় চীৎকার করে গেয়ে উঠল, অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে—

রামখাসীর গবেষণা অসমাপ্ত রেখেই আবার প্রশ্ন করি, বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে, রিটার্ন টিকিট কেটেছে নাকি?

এবার রামেন্দ্রসুন্দর কথা খুঁজে পেলেন: তুমিও টিকিট কাট, যখন তখন যা তা নিয়ে বিরক্ত করো না, এখন যাও।

মনে একটা গর্ব ছিল, দুষ্টুমিতে আমিই বুঝি বীর বাহাদুর। মণীন্দ্রগোপালকে দেখে মনে হল, বাবারও বাবা আছে তা হলে। একদিন নিবারণ পণ্ডিত হাতে থেলোহুঁকো নিয়ে নিচের উঠনে দ্রুত পদচারণা করছেন, দুম্বা এক বালতি জল তাঁর মাথায় ঢেলেই অদৃশ্য। পণ্ডিত মশায়ের সদ্য সাজা তামাক তো নিভলই, উপরন্তু সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

নিবারণ পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হলেই তাঁর তোতলামি বেড়ে যায়। রামেন্দ্রসুন্দর কলেজ থেকে ফিরে আসতেই তিনি নালিশ করলেন।

প্রথমে ডাক পড়ল আমার।

এ সব কী ?

আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না—উত্তর দিলাম, আমি নিশ্চয়ই করি নি, কে করেছে তাও বলতে পারি না।

মিথ্যে কথা আমি বলি না, এটা রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন। তখন ডাক পড়ল ঘিয়ের। সে তো কেঁদেই ফেলে আর কি! তার পর এল তুম্বা। সে এমন প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করে গেল যে এসব কথা মাথায় আসা দূরে থাক, স্বপ্নেও কখনও দেখে নি। গুরুজনের সঙ্গে ওসব করাও যে মহাপাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামেন্দ্রসুন্দর দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ থেমেই চেঁচিয়ে উঠলেন: তবে ভূতে করেছে না কি? করলে কে?

ইন্দুপ্রভা এসে পড়েছেন, এসব ভৌতিক কাণ্ড শুনে নানাকে ধরে বসলেন: একটা পুরুত-ঠাকুর ডেকে এনে পুজো-পাঠ করিয়ে দাও। সেদিন আমিও খটখট শব্দ শুনে সেখানে গিয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই—ছাদের ওপর দুড়দুড় করে ছুটে যাবার শব্দ শুনতে পাই—আবার সেখানে গিয়েও কাউকে দেখা যায় না—যা হয় এর একটা কিছু বিহিত কর। ক্রিয়াকাণ্ড না করলে উপায় নেই।

হাই-কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ড না মেনে উপায় কী? নানীর চিন্তিত ভাব দেখে নানা মৃদুহাস্যে বললেন, যা হয় তারাপ্রসন্নকে বলে দাও—সে পুরুত-বামুন যে হয় কাউকে ডেকে আনবে—আমাকে বলাও যা, কাঠের টেবিলকে বলাও তাই।

নানী নীচে গিয়ে সদাপ্রস্তুত তারাবাবুকে বলতেই তখুনি তিনি চশমা-চোখে বেরিয়ে গেলেন।

নানাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ভূত বিশ্বাস কর নাকি?

আমার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই করি—তোমাদের মত ভূত থাকতে আর বিশ্বাস করব না?

আর সে ভূত তাড়াবার ওঝা তুমিই—কী বল, নানা?

রামেন্দ্রসুন্দরের উচ্ছল হাসিতে ঘর ভরে গেল।

আমি ছেলেবেলায় মাংস খেতে ভালবাসতাম। নানী স্বহস্তে মাংসের বাটি এনে আমার সামনে রাখতেন। একদিন ঢাকনি খুলে দেখতে পেলেন বাটি খালি, ঝোল মাংস কিছুই নেই। ঘিয়ের জন্যে যা রাখা হয়েছিল সেটাও খালি।

নানা খেতে বসেছেন, নানী উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, দেখ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন তো

করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হল না—বাটি-ভরা মাংস রাখি আর এসে দেখি নেই।

রামেন্দ্রসুন্দর নির্বিকারচিত্তে বললেন, বেড়াল-টেড়াল হয়তো খেয়ে গিয়েছে।

নানী মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, তোমার ওই রকম ছিরির কথা শুনলে গা জ্বালা করে। বেড়ালের তো কাজ নেই—অমন ভারী ঢাকনা উঠিয়ে সব চেটে-পুটে খেয়ে আবার ঢাকা দিয়ে যাবে! এটা আজকে শুধু নয়—আরও দু-একদিন হয়েছে।

তাই বল! তবে হয়তো কোনও মানুষ-ভূত ম্যাজিক চালিয়েছে!

দুজনের কথা কাটাকাটি চলছিল মন্দ নয়। আমি হঠাৎ সেখানে ঢুঁ মেরে একবার দেখতে এলাম। কথাটা শুনে একটা রসিকতা ছেড়ে দিলাম: দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তোমার ভাল লাগে? তোমার ওই ভিজে ভাত খাওয়া, না, নানীর তাড়া খাওয়া? চোখ বুজে দুটোই বেশ হজম করে খাচ্ছ দেখছি!

বাঃ, বেশ লায়েক লাতি হয়েছেন দেখছি!

সংশোধন করে দিলাম, 'লাতি' নয়—'নাতি'।

আমাদের জন্যে হপ্তায় তিন দিন মাংস হত। এবার নানী মাংস রান্নার পর পাশের কুঠরীতে তালা দিয়ে রাখলেন, চাবিটা নিজের আঁচলে বাঁধা।

এবারও ঘর খুলে দেখেন বাটি শূন্য—যথারীতি ঢাকা দেওয়া আছে। নানীর তো পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। নিশ্চয়ই বাড়িটা 'জীনে' পেয়েছে। শীগগির বাড়ি বদলের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে রীতিমত ধরনা দিয়ে বসলেন।

শুধু কি মাংস? ঘরে তালা দেওয়া সত্ত্বেও ভাঁড়ারের যত কিছু মিষ্টান্ন—সব উধাও—মরতে এ বাড়িতে পা দিয়েছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি!

রামেন্দ্রসুন্দর আর কী করেন? তারাপ্রসন্নকে বললেন, যাও, তোমার ইন্দুমা যা বলেন, তাই কর, তবে সাহিত্য-পরিষদের কাছেই যেন বাড়িটা হয়, সেটা খেয়াল রেখ।

এদিকে আমি ও ঘি পরামর্শ করে ঠিক করলাম, ভূতকে দেখতে হবে।

ঘি আপত্তি জানায়: ওরে বাব্বাঃ, ওতে আমি নেই ধীরেনদা!

চেষ্টাই করে দেখি না, কী হয়।

দু-একদিনের মধ্যেই আর একদিন মাংস রান্না হয়েছে, নানী সেই পাশের কুঠরীতে তালাবদ্ধ করে চাবিটা আঁচলে বেঁধে নিলেন—তার পর দরজার গায়ে রামনাম লিখে যথারীতি উপরে উঠে গিয়েছেন স্নান করতে। তাঁর একটি বিশ্বাসী ঝিকেও ভাঁড়ার-

ঘরের সামনে ঠিক আগের মতই বসিয়ে রেখে গেলেন। ইন্দুপ্রভা দিনে দুবার স্নান করতেন, একবার অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেই, আর একবার রান্নাবান্না শেষ করে বেলা এগারোটায়।

আমি আর ঘি দোতলার ওপর একটা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দু জোড়া চোখের শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে বসে আছি। দেখলাম ঝি খকখক কাশতে শুরু করেছে, আর কোত্থেকে দুম্বা ঝড়ের মত ছুটে এসেই ঝিয়ের কাছ থেকে একটা চাবি নিয়ে দরজা খুলে মাংসের বাটি উজাড় করে বড় মাটির সরাতে ঢেলে নিয়েই দে ছুট!

মিনিটের মধ্যেই কর্ম সারা। সেই অবসরটুকু ঝি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। দেখলাম নানীর তথাকথিত বিশ্বাসী একটি অল্পবয়স্কা ঝি, যিনি রক্ষক—তিনিই ভক্ষক। ছুটে গিয়ে দুম্বাকে পাকড়াও করে বললাম, এবার ভূত ধরেছি। চল্, এবার তোকে বেদম পিট্টি খাওয়াব, আর ঝি কোত্থেকে আর একটা চাবি যোগাড় করলে, ঠিক করে বল্?

দুম্বার চোখে-মুখে বেপরোয়া ভাব, কিছুমাত্র লজ্জিত বলে মনে হল না।

আচ্ছা ধীরেনদা, সবুর কর, যেখানকার জিনিস, সেখানেই আবার ঠিক করে রেখে আসি—তার পর সব বলব।

যেমন উক্তি, তেমনই কাজ। ঝিকে চাবি খুলতে বলে সব ঠিক করে যথাস্থানে রেখে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল।

আমি আর ঘি তাকে নিয়ে তেতলার ছাদে গিয়ে বললাম, সব খুলে বল, কী ব্যাপার?

সেও বলে যায়—তালার চাবি আর একটা আছে, আর সেটা শোবার ঘরে তাকের ওপর তোলা থাকে। চাবির সন্ধানটা ঝি রাখত, আর আমাদের কার্য উদ্ধার হলেই সে গিয়ে আবার ওখানেই রেখে দিত।

দুম্বার হাত চেপে জিজ্ঞেস করি, ঝিয়ের সঙ্গে তোমার কিসের এত ভাব?

তা আর হবে না? সে আর আমি দুজনেই যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাই, ওই ছাদের চিলে-কোঠায় বসে। দুপুরে সবাই যখন ঘুময়, তখনই আমরা আবার পেট পুরে খেয়ে আসি।

কথায় কথায় দুম্বার পেট থেকে বেরিয়ে এল, নিবারণ পণ্ডিতের মাথায় জল ঢালার আনুপূর্বিক বিবরণ। কী ডানপিটে ছেলে রে বাবা! সে অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করল। এ যেন রীতিমত একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

যাই হোক, আমরা সব চুপচাপ নেমে এসে যথাসময়ে খেতে বসেছি, রামেন্দ্রসুন্দরকে নানী হেসে বললেন, ওগো শুনছ ? আজ 'আমনাম' লিখেছিলাম বলে ভূতে মাংস ছোঁয় নি।

আমি জল খাচ্ছিলাম, হঠাৎ হাসতে গিয়ে গলা সড়কে রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভার গায়ে ফোয়ারার মত জল ছুটে গেল, আর নাক মুখ দিয়ে জল আর ভাত একসঙ্গে ঝরে পড়ল। নানী তাড়াতাড়ি উঠে 'আহা হা ষাট ষাট' বলেই ঘন ঘন আমার মাথা সজোরে ঠুকতে লাগলেন।

ঘিয়ের অবস্থা আরও কাহিল, তার সশব্দ হাসি চাপতে গিয়ে নাকের কফ ভাতে ছিটকে পড়ল।

রামেন্দ্রসুন্দর হতবাক্। ঘি আর থাকতে না পেরে সব কথা ফাঁস করে দিয়ে বলল, তোমার ভাঁড়ার ঘরের আর একটা চাবি সামলে রেখ, তা হলে ভূতের অত্যাচার আর হবে না।

আমার তখনও পুরোদমে হাসি চলছে, পেটে খিল ধরার উপক্রম।

সব কথা শুনে নানীর চক্ষুতারকা অবলুপ্তপ্রায়, নানা হেসেই বললেন, যাক বাঁচা গেল, আর বাসা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ ননী চুরি করে খেতেন, ইনি মাংস চুরি করে খান।

আমি টিপ্পনী করলাম : ঘোর কলিযুগ কি না ?

অদূরে ভুম্বা মাথা গুঁজে ভোজ্যগুলি সমান তালে গলাধঃকরণ করে চলেছে, সে সম্পূর্ণ নির্বিকার, সাতেও নেই পাঁচেও নেই !

আর মাঝে মাঝে এমন ঋষিজনোচিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় যে দেখলে, বোঝে কার সাধ্য, যে ভুম্বা কখনও কোনও কালে কোনও অপরাধ করার চিন্তাও করতে পারে। তার চাউনি দেখে তাকে ভৎর্সনা করা তো চলেই না, বরং সে যে কোনো দোষ করেছে এমন সন্দেহ পোষণ করা আমাদেরই যেন গুরুতর অন্যায় !

মাংস চুরি করে খেয়েও ভুম্বা যে ফাঁকতালে বাহবা নিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা আর বেশীক্ষণ চলতে দেওয়া উচিত নয়। মস্তক কণ্ডূয়ন করে, সবিনয়ে নিবারণ পণ্ডিতের মস্তকে জল ঢালার কথাটাও বলে দিলাম। আর যায় কোথায় ?

রামেন্দ্রসুন্দর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, পাশের বাঘা বিদ্যেসাগরী চটি ছুঁড়ে মারলেন ভুম্বার দিকে। ডালের বাটি ওঠাতেই তাঁর নিজেরই গায়ে সব পড়ে গেল, আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বাটিটাই ছুঁড়ে দিলেন, ভুম্বা তার আগেই চম্পট !

নানা রেগে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন, আমার বোকামির জন্যেই সেদিন তাঁর খাওয়া হল না। নানী দুঃখ করে বললেন, এ সময়ে কথাটা তোর না বললেই হত না ?

কি করব নানী, ভুল হয়ে গিয়েছে, অতটা বুঝতে পারি নি।

নানা উঠে গিয়ে তারাপ্রসন্নকে দিয়ে তুম্বাকে ধরে আনিয়ে কঠোর শাস্তিবিধান করলেন।

কলেজ যাবার আগে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে চাবিটা তাঁর হাতবাক্সে রেখে দিয়ে বলে গেলেন, চব্বিশ ঘণ্টার আগে ঘর খোলা হবে না, আর একবিন্দু জলও দেওয়া চলবে না। কাল কলেজ যাবার আগে ছেড়ে দেব। মার দিয়ে ওর কিছুই হবে না, খেতে না দিলেই পেটুকের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

নিজের দৌহিত্রই হোক আর যেই হোক, ন্যায়নিষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর কারও কিছু অন্যায় দেখলে সহ্য করতেন না। চুরি করে বালকের মাংস-মিষ্টান্ন খাওয়া বরং হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যেখানে মানবতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে ক্ষমা নেই !

পরদিন।

রামেন্দ্রসুন্দর কলেজ যাবার আগে তুম্বার বন্দীজীবনের মুক্তি দিলেন। অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা সে অনাহারে ছিল না। আমি ও নানী যোগাযোগ করে জানলার ফাঁক দিয়ে তাকে খাইয়ে আসতাম। ঘরের সংলগ্নই বাথ-রুম—একই ঘরে এতক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকা ভিন্ন তার অন্য কোনও অসুবিধা হয় নি। ছটফটে তুম্বার পক্ষে যা কিছু অসহ্য হয়ে উঠেছিল, সে এই নির্জন কারাবাস।

বেরিয়ে এসেই তুম্বা প্রতিশোধ নিতে চায়। তার লম্বা-চওড়া বহরের দুষ্টুমিটা আর এককাঠি উপরে উঠল। রামেন্দ্রসুন্দর শোবার আগে তাঁর বাঁধানো দাঁত এক কাপ জলে ভিজিয়ে রাখতেন। তুম্বা সেখান থেকেই দাঁতের পাটি বেমালুম সরিয়ে রাখল। ভোরে উঠে বিছানায় বসেই রামেন্দ্রসুন্দর কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখেন, পাত্র শূন্য, দু পাটি দাঁতই অন্তর্ধান !

কী বিপদ ! আমি তাঁর কাছেই শুতাম, আমায় টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আমার দাঁত কই ?

ঘুমের ঘোরে ব্যাপারটা বিশেষ অনুধাবন করতে পারি নি, তার পর বোধগম্য হতেই কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমার দাঁত কোথায়, চোখ কোথায়—আমি কী করে বলব ?

নানা আমার তোয়াজ আরম্ভ করে দিলেন : লক্ষ্মী ভাই আমার, দাঁতটা একবার খুঁজে দাও, নইলে আজ খাওয়া দূরে থাক্, কলেজ যাওয়া বন্ধ।

ঘুষও দিতে চাইলেন : গরম গরম জিলিপি কিনে দেব।

ধ্যানস্থ হলাম, চোখের সামনে ভেসে উঠল দুখার ছবি। সে ছাড়া এমন দুষ্টুমি করবার লোক তো কেউ নেই। কথাটা তখনই ফাঁস করা উচিত হবে না, তাই চোখ বুজেই বললাম, বেড়াল-টেড়াল নিয়ে যায় নি তো?

এমন সময় নানীর প্রবেশ।

নানা কাতর-বিহ্বল চোখ দুটি তুলে অসহায় বালকের মত বললেন, আমার দাঁত নেই।

নানী চমকে উঠেই চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ, বল কি?

একটু খুঁজে দেখ তো, বেড়াল নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেললে কি না! কী মুশকিলেই পড়া গেল!

আর শুয়ে থাকা যায় না, উঠে পড়েই নানার ভাষায় সান্ত্বনা দিলাম, আচ্ছা, একবার খুঁজেই দেখা যাক, কী করতে পারা যায়!

সটান বাইরে এসে দুখাকে বিছানা থেকে টেনে তুললাম। খাওয়ার কথা শুনলে সে আর কিছু চায় না, তাই প্রলোভন দেখিয়ে বললাম, দে ভাই, নানার দাঁত-জোড়াটা বের করে দে, এখুনি গরম গরম জিলিপি খেতে পাবি!

দুখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বললে, কাল বাবুদাদা আমায় বড্ড মেরেছে, তাই ওটা লুকিয়ে রেখেছি।

তখনই টুল নিয়ে এসেই তার ওপর দাঁড়িয়ে আলমারির-উপর-লুকিয়ে-রাখা দাঁত জোড়াটি নামিয়ে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, কই আমার জিলিপি?

নানার কাছে চল্, এখুনি গরম গরম পেয়ে যাবি, বুঝলি?

কালকের মত নাকি? বাব্বাঃ, ওখানে যাব না, কান দুটো এখনও ফুলে ঢোল হয়ে আছে। তুমি যদি পাও তা হলে খানিকটা ভাগ আমায় দিও।

খানিকটা বলে সে যে ভাবে দু হাত ফাঁক করে দেখাল, তাতে পরিমাণে সের দুয়েকের কম হবে না। আরও দেখলাম তার স্বর অনেকটা নেমে গিয়েছে।

ফিরে এসে দেখি, দন্তহীন রামেন্দ্রসুন্দর অন্তহীন নিরাশায় ম্রিয়মাণ। রণজয়ের সংবাদ নিয়ে খুব বীরবিক্রমে ঘরে ঢুকেই নানাকে বললাম, এই নাও তোমার দাঁত আর দাও আমার জিলিপি। শুধু আমি নই, একজন ভাগীদারও আছে।

নানার ধড়ে তখন প্রাণ এসেছে। তিনি দাঁত দু পাটি তাড়াতাড়ি মুখে লাগিয়ে বললেন, তিনি আবার কে ?

কাল যার কান মলে লাল করে দিয়েছিলে।

রামেন্দ্রসুন্দর সে কথা স্রেফ ভুলে গিয়েছেন, তাঁর অর্থহীন চাউনি দেখে নানী স্মরণ করিয়ে দিলেন : কে আবার! ওই দুম্বা, তোমার ধনুর্ধর নাতি।

নানা ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, তা হবে না, তুমি ওর সামনেই খাবে, ও তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

ওতে আমি রাজী নই, আমার হজম হবে না।

তা হলে এর মধ্যে তুমিও আছ, বল ?

মোটেই না, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

তবে বুঝলে কী করে যে দুম্বা নিয়েছে ?

ভারিক্কি চালে উত্তর দিলাম, এইখানে নানা, তুমি আমার কাছে হেরে গেলে। ও ছাড়া আর যে কেউ এ রকম কাজ করবার লোক নেই, এটাও তুমি বুঝতে পার না ? তা ছাড়া, মনে নেই, কাল তুমি ওকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করেছিলে, তাই ফস্ করে মাথায় এল, ও ছাড়া কেই বা এমন কাজ করবে ?

নানার কৃত্রিম দন্তে অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল।

নানী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষেই স্নান করে এসে আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতেন, আজও সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরে ঢুকেই নানার দন্তবিলোপের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পুজোর ঘরে ঢুকলেন।

আর একটা ঘটনা।

নানা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার হেড-এগ্‌জামিনার ছিলেন। কাজেই অনেক খাতাই আসত। তিনি একটা বাণ্ডিলের মধ্যে থেকে কয়েকটা খাতা টেনে নিয়ে দেখতেন, আর লাল পেন্সিলে নম্বর দিতেন। কলেজ যাবার সময় তিনি লাইব্রেরি-ঘরে খাতাগুলো তাঁর নবনিযুক্ত নরসুন্দর ভৃত্য গৌরের জিম্মায় তালাবন্ধ করে রাখতেন।

একদিন হল কি, প্রাতঃকালেই এক বিশিষ্ট অভিভাবক তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসেছেন, পুত্র কী নম্বর পেয়েছে তাই জানবার জন্যে। নানা ছেলেটির পিতার কাছে সবিনয়ে মার্জনা চেয়ে বললেন, আমাদের নিয়ম নেই পূর্বাহ্নে নম্বর জানিয়ে দেওয়া, অতএব আমাকে মাফ করতে হবে।

ভদ্রলোকটিও নাছোড়বান্দা, তবুও রামেন্দ্রসুন্দর কোন মতেই তাঁর নীতি ও সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না।

নমস্কার প্রতি-নমস্কারান্তে ভদ্রলোকটি বিরসমুখে বিদায় নিলেন। তার পরের দিন কিসমিস বাদাম পেস্তা, বিভিন্ন জাতীয় ফলমূল, সুমিষ্ট আম, একজোড়া লাল টুকটুকে রোহিত মৎস্য নানার কাছে ভেট পাঠিয়ে দিলেন। রঙ-বেরঙের সুদৃশ্য পাতলা কাগজে মোড়াই করা ভারে ভারে সজ্জিত ডালি, আট-দশজন লোক বয়ে নিয়ে এল, এ যেন জামাই-ষষ্ঠীর বিরাট তত্ত্ব।

রামেন্দ্রসুন্দরের সামনে সাজিয়ে রেখে বাহকের দল ও ভারপ্রাপ্ত বাবুটি, যিনি ওই সব গুনতি-করা দ্রব্যাদির মাথা হয়ে সঙ্গে এসেছেন, তিনিও রামেন্দ্রসুন্দরকে গড় হয়ে প্রণাম করে সসম্ভ্রমে দাঁড়ালেন। সবারই যুক্তকর, এক-একটি যেন বিনয়ের অবতার!

রামেন্দ্রেসুন্দর অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তাঁর একটা ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল: এ সব কী?

গলার সুরে মনে হল যেন কাঁদতে বাকি রেখেছেন।

বাবুটি কায়দার সঙ্গে এক হাত বাড়িয়ে নানার কাছে অগ্রসর হলেন। আহা, কী বিনয়-বিগলিত ভাব! চরণধূলি মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর হাতে একটি পত্র দিলেন। খুলে পড়েই রামেন্দ্রসুন্দর দলিত ভুজঙ্গের মত ফোঁস করে উঠলেন: আপনারা কী ভেবেছেন, বলুন তো? এই সব ঘুষ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চান? আমি তো কারও কাছে মস্তিষ্ক বিক্রয় করি নি।

নানার সংহারমূর্তি দেখে উপঢৌকনের উপসংহার।

তাঁর কণ্ঠ উঁচু পর্দায় চড়ে গেল: যান, এখুনি চলে যান, চোখের সামনে থেকে এগুলো বিদায় করুন।

কাউকে ডালি দিয়ে এ ধরনের অভ্যর্থনা সচরাচর কারও ভাগ্যে জোটে কি না জানি না, ভদ্রলোকটি হকচকিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি কুলিদের ডেকে তাদের মাথায় ডালি চাপিয়ে ত্বরিতপদে তাঁর শোচনীয় প্রস্থানের দৃশ্য নানার মনে কোনও বিকার আনল না বটে, কিন্তু তুম্বার বুক যেন ফেটে গেল। অতগুলি লোভনীয় ভোজ্যদ্রব্য চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়, তুম্বার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। আর কি ধৈর্য ধারণ করা যায়? সে ফস করে বলে বসল, ওগুলো সব কী, একবার দেখি না। বাবুটি ইশারা করতেই বাহক আমগুলি তার কাছে ঢেলে দিয়েই চম্পট।

নানার কক্ষে একটু আগেই যে বিয়োগান্ত দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল, দুম্বা তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানত না, জানলে সে কখনই ওদিকে ফিরেও চাইত না। কিন্তু গৌর এসে নানার কানে মিথ্যে করে তুলে দিল, দুম্বা ওদের কাছে আম চেয়ে নিয়েছে।

নানা রেগেই ছিলেন, কথাটা শুনেই বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠেই খালি পায়ে নীচে নেমে গেলেন। চটি-জোড়া পায়ে দেবারও খেয়াল ছিল না। দুম্বা তখন সিঁড়ির নীচে ক গণ্ডা আম একটি একটি করে গুনে দেখছিল, হয়তো তার বাহ্যজ্ঞান সে সময় ছিল না।

নানা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কান দুটি ঠেসে পাক দিয়ে বিরাশি সিক্কা ওজনের গোটা-দুই ভারী কিল দুম্বার পিঠে দুম দুম করে পড়তেই একটা 'হোঁক' শব্দ শোনা গেল। রামেন্দ্রসুন্দরের হাত পা ঠোঁট সব কেঁপে কেঁপে উঠছে, তাঁর অবস্থা দেখে আমারও কাঁপুনি ধরে গেল। সামনে যায় কার সাধ্যি!

নানী তাড়াতাড়ি অন্দর থেকে বেরিয়ে এসেই নানার প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখেই গা-ঢাকা দিলেন। গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল তারাপ্রসন্ন দুম্বাকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন। ভাবলাম, তাঁর পিঠেও দু-একটা পড়ুক, দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করি।

সে সব কিছু হল না। তবে নানা তাঁকে এমন একটা তাড়া দিলেন যে, তিনি ভয়ে কাঠ। এক কোণে তিনিও চুপ করে দাঁড়িয়ে।

নানা দু হাত দিয়ে কয়েকটা আম কুড়িয়ে নিয়েই সজোরে উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন, তার পরই তারাবাবুর উপর হুঙ্কার: দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও, সব কুড়িয়ে নিয়ে এক্ষুনি সেই লোকটির বাসায় দিয়ে এস।

বিকারশূন্য তারাপ্রসন্ন ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আমগুলি কুড়িয়ে একটা চটের থলি বোঝাই করে নানার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, অনেক দূর, একটা ছ্যাকড়া গাড়ি নেব কি বড়বাবু?

হ্যাঁ, তাই নাও।

এর পর নানা উপরে উঠে এসেই গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। অন্যায় অশোভন কিছু দেখলে কখনই তিনি সহ্য করতেন না, নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন, অথচ এ দিকে তিনি আপন-ভোলা মাটির মানুষ।

এখানেই কিন্তু সকালের সেই নাটকীয় ব্যাপারের যবনিকা পড়ে নি। যে ছেলেটির নম্বর জানবার জন্যে তার বাবা তাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন,

সেই ছাত্রটি তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ভরতপুরে আমাদের চিতোর দুর্গ আক্রমণ করল। দুর্গাধিপতি নেই, রামেন্দ্রসুন্দর তখন কলেজে।

নীচে আমার পড়ার ঘরের সামনেই গেট। কেউ ঢুকলেই দেখা যায়। একটা লোক এসে দরজার সামনে উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে, কেমন যেন সন্দেহ হল। আমার সেদিন শরীর অসুস্থ থাকায় স্কুলে যাই নি। নানার আদেশে আমি মানুষের তৃতীয় রিপুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

বললেই তো আর মেশিনের মত লেখা বেরয় না, তারও মেজাজ থাকা চাই। মনটাও সুরে বাঁধা নেই, এটা সেটা ভাবছি। প্রথম রিপুর ধার ধারি না, দ্বিতীয় রিপুকে নিয়ে পড়লাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল সদ্য-দেখা রামেন্দ্রসুন্দরের অগ্নিমূর্তি, সেখান থেকেই তিন নম্বরে গিয়ে পৌছব—

ওই রকম এক জোড়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখে উঠে গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী চান?

তার পরই চিনতে কষ্ট হল না। এ সেই লোক, যে তার বাবার সঙ্গে নম্বর জানতে এসেছিল। পায়ে সেই লপেটা জুতো, মাথার মধ্যস্থলে টেরি বাগানো। আশ্চর্য অধ্যবসায় বটে! এত বিপর্যয় সত্ত্বেও ক্লান্তি নেই, সেই ছেলেটির পিছনে দেখলাম জনা দু-তিন সঙ্গী।

গৌর কোথায়?—একটু দয়া করে ডেকে দিলে তাঁরা পরম আপ্যায়িত হবেন এই রকম কত মিষ্টি মিষ্টি বচন শুনিয়ে নরসুন্দরের দর্শনলাভের আশায় তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

গৌর চার মাস হল এসেছে। জেমোর কাছেই ভরতপুরে তার বাড়ি। নানী চাকরটিকে আমদানি করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের দাড়ি কামানোও হবে আবার গৃহস্থালির কাজও করবে—এই ডবল কর্মযোগের প্রত্যাশায়।

গৌরকে ডেকে দিয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ইতিমধ্যে ঘিও এসে জুটল।

লাইব্রেরি-ঘরে যেখানে এগ্‌জামিনের খাতাগুলো থাকে তার চাবি যে গৌরের কাছে, এ খবরটা তারা আগেই কেমন করে সংগ্রহ করেছিল, এটা তাদের বাহাদুরি বলতে হবে। গোয়েন্দা-বিভাগে কাজ পেলে এরা উন্নতি করবে নিশ্চয়ই।

জানলার খড়খড়ি তুলে দেখি, তারা ফিস ফিস করে কী সব বলছে আর একবার আমার জানলার দিকে আবার উপরেও চেয়ে দেখছে। ঘির কানে কানে বললাম, বড় গোলমেলে ব্যাপার, আর একটা অঘটন না হয়ে যায় না।

সেই ছেলেটি একটি দশ টাকার নোট গৌরের হাতে গুঁজে দিতেই সে তখনই সন্তর্পণে ট্যাকস্থ করে নিল, তারপর চারিদিক তাকিয়ে দেখে তাদের পেছনের দরজা দিয়ে উপরে নিয়ে গেল সেই লাইব্রেরি-ঘরে, যেখানে স্তরে স্তরে খাতার বাণ্ডিল বাঁধা পড়ে আছে। ঘিকে বললাম, তুইও যা, আর ভাল করে লক্ষ্য রাখিস। দেখিস, যেন আবার ধরা পড়িস না।

দেখই না ধীরেনদা, আমি কি অত বোকা?

একটু পরেই ঘি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল, পাশের খড়খড়ি দিয়ে দেখলাম, বাবুদার পরীক্ষার খাতাগুলো খুলে লাল পেন্সিলে কী যেন লিখছে!

আর কি চুপ করে থাকা যায়? শরীর খারাপ হলেও, আমি আর ঘি ছুটে গেলাম। নানী অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন, ঠেলে তুলে সব কথা উগরে দিয়েই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দোতলার সেই ঘরে নেমে এলাম। গৌর যে-পথে পাহারা দিচ্ছিল, সে পথে নয়। আমি, ঘি আর নানী ঘরে ঢুকেই দেখি, তারা ইতিমধ্যেই কাজ গুছিয়ে কাগজগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রাখতে তৎপরতার সঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছে। আমাদের আবির্ভাবে বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেই বাছাধনরা "হ্যাণ্ডস্ আপ"-এর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নানীর ভাবগতিক দেখে গৌর তখুনি গৌরচন্দ্রিকা শুরু করে দিলে: আমি কী জানি? শুধু একটা খাতা দেখবে বলে আমার পা ধরে কত ঝুলোঝুলি! আমি কি আর জানি ছাই, দুয়োর খুলে দিয়েছি—

আমি আর থাকতে পারলাম না, বলে ফেললাম, সে তো সত্যি কথা। তুমি আর কী জানবে? জানে তোমার ওই ট্যাকের দশ টাকা।

নানী এই সব ব্যাপার আগেই শুনেছেন, আমরা তাঁকে আগেই তালিম দিয়ে রেখেছি, এবার হুকুম জারি করলেন: এদের সব তালাবন্ধ করে রাখ, উনি এসে একবার নিজের চোখে দেখুন।

সেই ছেলেটি ছুটে এসে নানীর পায়ে আছড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল: আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর জীবনে পড়া হবে না।

ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষা-দেওয়া অত বড় ছেলের নিজের নাক কান মলে কান্না জুড়ে দেওয়াটা সেই প্রথম দেখলাম।

নানীর দয়ার শরীর, কী আর করেন—তা ছাড়া পা দুটোও ছাড়িয়ে নিতে হবে, বললেন, যা করেছ, করেছ—এখন চলে যাও।

আচার্য ত্রিবেদী মশাই যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারেন—নানীর কাছে এই পাকা কথা নিয়ে তবে তাঁর চরণযুগল পরিত্যাগ করল।

তারা চলে যেতেই ঘরে তালা দিয়ে নানী চাবিটা নিজের কাছে রাখলেন। গৌরকেও একচোট ধমকে দিলেন।

ধাড়ী ছেলেগুলোর পেছনে পেছনে আমি নেমে এসেই বললাম, নানী না হয় কথা দিলেন, আমি কিন্তু দিই নি, নানাকে ঠিক বলে দেব। ঘরে গিয়ে কী করেছেন বলুন, তা হলে কথা দিচ্ছি, আমিও তাঁকে বলব না।

ছেলেটির চোখে তখন জলের নামগন্ধ নেই, মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্র দেখা দিয়েছে, বেপরোয়া ভাব, যেন কিছুই হয় নি। রীতিমত হেসেই সে উত্তর দিলে, কিচ্ছু না, মাত্র দু নম্বরের জন্যে ফেল মেরেছিলুম, সেটা আধ নম্বর এক নম্বর এখানে সেখানে বসিয়ে "কভার পেজে" টোটাল দিয়ে পাস হয়ে গেলুম আর কি!

ছেলেটির পদার্থবিদ্যার পরীক্ষায় অপদার্থের পরিচয় দিয়েও বেশ সপ্রতিভের মত বেরিয়ে যাওয়ার চটকদার ভঙ্গিটা চেয়ে দেখছিলাম। ওপর থেকে নানীর ডাক কানে এল: ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? শুয়ে পড়্‌গে, তোর অসুখ হয়েছে না?

তদুত্তরে নানীকে বলি, নানা লোভ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলে গেছেন, ভাবছিলাম, লোভের এমন চমৎকার নমুনা কোথায় পাব, আর কেমন করেই বা সেটা এখানে বসানো যায়! পূর্বাভাসে অবশ্যই লিখব, তোমার ও নানার ক্রোধের রকমফের মাত্রা। তবে দুঃখের বিষয় আগেই তুমি ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়ে বসলে, সেইটিই হয়েছে আমার একমাত্র বিপদ।

ঢের বিদ্যে হয়েছে, এখন দুয়োরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়্‌।

এ খবরটা নানার কানে উঠলে কী হত বলা যায় না। নানী আমাকে ও ঘিকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন কথাটা নানার কানে না যায়। আমরা কিন্তু নানীর প্রতি কোন কারণে রাগ-দুঃখ হলেই মাঝে মাঝে হুমকি দিতাম: দাঁড়াও, তোমার সেই কথা নানাকে বলে দেব।

নানী বেগতিক বুঝে কিছুদিন পরে নানার খোস-মেজাজ দেখে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"-ভাবের মিশ্র ভঙ্গিতে কথাটা ফাঁস করলেন: সেদিন গৌর ঘরের চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিল, সেই ছোঁড়াটা কী রকম করে খোঁজ পায়, ওপর থেকে দেখতে পেয়ে আমি তখুনি এসে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম।

অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়েও ভয়ানক। তবুও চুপ করে রইলাম, কথা দিয়েছি যে!

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে ভাবপরিবর্তন, চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বল কি? অ্যাদ্দিন বল নি কেন? তারা খাতাপত্র কিছু দেখতে পায় নি তো?

হ্যাঁ-নার মাঝখানে নানীর মাথা দুলতে লাগল।

আগে এ সব জানলে রাস্টিকেট করে দিতাম।

সেই জন্যেই তো বলি নি, তবে ওদের খুব শাসন করে দিয়েছি।

আর বেশী কিছু সেদিন গড়ায় নি, সেখানেই পালা শেষ হয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমরা বাড়ির সামনে খেলাধুলো করছি, দেখি, সেই ছেলেটি রাস্তা দিয়ে হন হন করে কোথায় চলেছে। মনে হল, আবার বোধ হয় কোনও কুকাণ্ড করবার অভিপ্রায়ে তার এত তড়িৎগতি। ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, শুনুন মশাই, আর যে এদিকে ফিরেও চাইছেন না? বলি—পাস, না, ফেল?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সেই রীতিমত আণ্ডার গ্রাজুয়েট ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, হুঁঃ, আমি ফেল করবার ছেলে কি না!

তিনি আর দাঁড়ালেন না, বুক ফুলিয়ে হেঁটে চললেন।

ঠিকই তো, পাসের জন্যে তিনি কোন কিছুতেই 'ফেল' করেন নি।

গৌর একদিন অন্তর নানার দাড়ি কামিয়ে দিত। আমরাও তার কাছে চুল ছেঁটে নিতাম। সে আর একটা কীর্তি করে বসল।

আমাদের বাড়িতে সে সময় মাঝারি কম-বয়সের অনেকগুলো ঝি থাকত। তখন জেমোতে ঝিয়ের ডিপো, মাইনে অত্যন্ত কম—বারো আনা থেকে পাঁচ সিকের মধ্যেই ওঠা-নামা করত। সস্তা-গণ্ডার বাজারে দুটো খেতে দেওয়া সে আর এমন কী! তাই নানী সেখান থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে ঝি আমদানি করতেন।

সম্প্রতি নানী আর একটিকে এনেছেন—নাম পরী, স্বল্পবয়স্কা বিধবা কায়স্থকন্যা। হঠাৎ একদিন শুনলাম, গৌর নাকি তার সঙ্গে প্রেম করে। প্রেম বস্তুটি কী বুঝতাম না, তবে সেটা যে ভীষণ গর্হিত কার্য এই রকমই শুনলাম।

গৌরের এই ব্যাপার তারাবাবুর চোখ এড়ায় নি, একদিন আলুলায়িতকুন্তলা পরীর সঙ্গে গৌরের মাখামাখিটা নানীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। পরীকে তখুনি বিদায় করে দেওয়া হল। নানী গৌরকেও উত্তম-মধ্যম বকুনি

দিয়ে এক মাসের মাইনে জরিমানার ভয় দেখালেন। ফের যদি কখনও বেচাল দেখতে পান মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে বিদায় করে দেবেন বলে শাসিয়ে দিলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমিও এই সব দেখছিলাম। নানী হাঁকিয়ে দিলেন: তোর এখানে থাকার দরকার কী? সরে যা।

সামনে থেকে সরে গেলাম বটে, কিন্তু ওত পেতে সব কথাই শুনছিলাম। গৌরও ছাড়বার পাত্র নয়, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে। তারাবাবুই নাকি নাটের গুরু। পরীর সঙ্গে তাঁরও আশনাই আছে। আপিস-ফেরতা তিনি প্রায়ই এটা-ওটা-সেটা কিনে গোপনে পরীকে দিয়ে থাকেন। জলখাবারের সময় পরী সব কাজ ফেলে তারাবাবুর সামনে দাঁড়ায় কেন? ওই যে মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে, সাবান, তেল, সে সব কে দিয়েছে ওকে? আমার দেশের লোক, সুখ-দুঃখের কথা কই। তারাবাবুর তা সহ্য হয় না। প্রথম প্রথম মুখ বুজেই ছিলাম। সেদিন তারাবাবু আমাকে না-হক দশ কথা শুনিয়ে দিলেন, আমিও তাঁকে ঠেস দিয়ে দু-চার কথা বলেছি, তাই এত সব কাণ্ড!

গৌরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপত্নীক তারাবাবুর এই আক্রোশের কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। আর সে বয়সে শৃঙ্গাররসের মর্ম কেমন করেই বা বুঝব? আজ হলে বলতাম, আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবে জগৎসিংহ, নয়, ওসমান।

তারাবাবু গর্জে উঠে মূর্তি জাহির করলেন: কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? হাতে-নাতে ধরে দিয়েছি বলেই তুই আমার নামে দোষ দিস? আগে বললি না কেন তা হলে?

নানী তারাবাবুর নামে এই অপবাদ বিশ্বাস করেন নি, নইলে তিনি এ সব বিষয়ে যে রকম কড়া ছিলেন তাতে কেউই রেহাই পেত না—তা তিনি তারাপ্রসন্নই হোন আর পরমাত্মীয়ই হোন।

নানী গৌরকে ধমকে চুপ করিয়ে দিতেই তারাবাবু নানীর পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর এ বাড়িতে থাকব না। নানী তারাপ্রসন্নকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিতেই—বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে—নানীর সামনে হাজির হয়ে বললাম, সব কথা শুনেছি, এখন নানাকে বলতেই যেটুকু বাকি। নানীর মুখে চুক করে একটি আওয়াজ। তার পরই মাথা নেড়ে ছড়া কাটলেন—

জাদু জান কত রঙ্গ—
ধান ভানো, চিঁড়ে কোটো, বাজাও মৃদঙ্গ !

ধরে বসলাম, তার পর কী, বল না ?

মাথা তাঁর বিগড়েই ছিল, আর এক তাড়া দিয়ে বললেন, তার পর জানি না, যাঃ।

আচ্ছা রোসো, আমি একটু পরেই আসছি, পালিয়ে যেয়ো না।

বাইরে পড়ার ঘরে ঢুকেই বসে গেলাম আঙুল গুনে, মাথার চুল টেনে অনেক কাটাকুটি খচ্ প্রত্যয়ের পর যা হয় একটা কিছু খাড়া হল ঃ—

দেখিলেই মোরে বুঝি জ্বলে ওঠে অঙ্গ ?
বাঁশী নিয়ে তা হলে কি দাঁড়াব ত্রিভঙ্গ ?
তবু, ছাড়িব না সঙ্গ,—
যায় যদি যাক তবে রসাতলে বঙ্গ—
নানী যেথা, আমি সেথা, পানে গোঁজা লঙ্গ।

এক টুকরো কাগজে লিখে এনে নানীর হাতে দিলাম। তিনি পড়ে হেসে উঠলেন। নানা খেতে বসলেই ওই চিরকুট তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, দেখছ কী, তোমার সাহিত্য পরিষৎ থেকে নাতিকে এবার 'কবিকঙ্কণ' উপাধিটা দিয়ে ফেল।

নানার মৃদুহাস্য।

জানি, এর মুখবন্ধটা তোমারই, ইনি পাদপূরণ করেছেন। এ রকম লেখালেখি তোমার কাছেও যদি করে, তা মন্দ কি !

আমার দিকে ফিরে বললেন, যায় যদি যাক তবে রসাতলে বঙ্গ—এটা লেখা ঠিক হয় নি, লাইনটা কেটে দাও। ঠাট্টা করেও ওই কথা কখনও বলবে না, চিন্তাও করবে না। বাংলা গেলে বাঙালী কী নিয়ে বাঁচবে ?

তখন কী লিখেছিলাম, মনে থাকবার কথা নয়। নানী এখনও জীবিতা আছেন, তবে থাকা না-থাকা সমান, ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, ট্রেন ছাড়তে যা দেরি। যত দিন থাকেন, তত দিনই আমাদের ভাগ্য। তাঁকে দেখলে, আমার ভুলে-যাওয়া অনেক কথাই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। দেখা হলেই আমার ছেলেবেলার লেখা পদ্যগুলো তিনি মনে করিয়ে দেন।

এই লেখার পরেই সংবাদ পেলাম, দমদম থেকে গিরিজা মাসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্মল

ফোন করে জানালে, ইন্দুপ্রভা দেবী কাল—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৩ সাল, আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

দীর্ঘ বিরহের অবসান হয়েছে। আবার তিনি সেই চিরহাস্যপুরবাসী চিরসাথী রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হবেন।

কলম ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। স্মৃতি-সমুদ্র-মন্থন-করা অমৃতের বিন্দু বুঝি চোখ ফেটে ঝরে পড়ে। আমি যা লিখে এসেছি: তিনি এখনও জীবিতা আছেন, তার আর পরিবর্তন করতে চাই না। তিনি আমার কাছে এখনও বেঁচে আছেন এবং চিরদিন থাকবেন।

আমার কবিতার প্রতি অনুরাগের একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, তিনি অবসরসময়ে অনেক লম্বা-চওড়া কবিতা লিখতেন, একেবারে বারো-আট-বিশ ইঞ্চি গাঁথনি, দেড় ইঞ্চি রি-এন্‌ফোর্সড কংক্রিটের ছন্দ তাঁর ধাতে সইত না। তিনি আমাকেও কবিতা লেখবার ধরন-ধারণ দেখিয়ে দিতেন, মিল কেমন করে দিতে হয়, গুরুলঘু ছন্দের বৈচিত্র্য, আরও কত কী সব ছন্দ ও মিলের জটিলতা বুঝিয়ে বলতেন।

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী! সংক্রামক ব্যাধির মত আমার ঘাড়েও কাব্যিভূত চেপে ছিল। মাস্টার মশাই আমাকে ঘরে বসেই কবিতায় চিঠি লিখতেন, আমিও পদ্যে উত্তর দিতাম। তার পর তিনি আমার রচনার সর্বাঙ্গে অস্ত্রোপচার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খাড়া করে দিতেন। কোনও সময় খোল-নল্‌চে সবই বদলে যেত, অনেকটা আজকালকার প্লাস্টিক সার্জারির মত, মুখ দেখে আর চেনাই যায় না। তবে মাঝে মাঝে দু-একটা যে ভাল উৎরে যায় নি এমনও নয়।

সবাই বলত, মাস্টার মশাই কবি ছিলেন। নির্জন নিষুতি রাতে কাব্যলক্ষ্মী নাকি সশরীরে আবির্ভূতা হন, তাই তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখতেন। ঠিক রাত দুটোয় টাইম-পিস ঝনঝন করে বেজে উঠতেই মাস্টার মশায়ের ঘুম ভেঙে যেত, তিনি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসতেন, হুস্-হুস্ করে লেখা চলত। এ কথা শোনার পর একদিন উৎসাহিত হয়ে শোবার সময় নানার কাছে প্রস্তাব করতেই, নানীর এক ফুৎকারে আশার প্রদীপ নিভে গেল: রাত-দুপুরে কবি হয়ে কাজ নেই। দিনে যা হয় করিস, রাত্তিরে আর জ্বালাতন করিস নে।

দুম্বা সেখানে উপস্থিত, চোখ চেয়ে আমাদের কথা শুনছিল। সেও সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, আমিও পদ্য লিখি ধীরেনদা, শুনবে?

তুস্বাও আবার পদ্য লেখে নাকি ! অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই সে সুর দিয়ে বলে যায়, আমি খাব, আমি দেখব।

আমার সদ্য আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ার ঝোঁকটা গিয়ে পড়ল তার উপর। তুস্বার উৎসাহকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আহা কী মিলের ঘটা রে ! থাক্, আর কাজ নেই। আর তো কিছু পেলি না, আগেই খাওয়ার কথা।

রামেন্দ্রসুন্দর তুস্বার দিকে মুখ ফিরিয়ে আর একটি লাইন যোগ করে দিলেন, তোমার কাছে কাব্যরসের চেয়ে গব্যরসই বরং উপাদেয়।

শুধু গদ্যে নয়, পদ্যেও যে আমার খানিকটা দখল হয়েছে, এটা নানাকে দেখানো চাই, তাই টুকিটাকি লেখা হলেই নানার কাছে নাচতে নাচতে ছুটে যাই। তিনিও ঝোঁক দিয়ে দিয়ে পড়েন, আমার মাথাও সেই সঙ্গে দুলতে থাকে। নানা খুবই উৎসাহ দিতেন আর বলতেন, দেখো যেন লেখাপড়ায় আবার গাফিলতি না হয় !

মাস্টার মশাইয়ের অনুপস্থিতিতেও কাব্যচর্চার বিরাম নেই। অনুরক্ত ভক্ত শ্রোতা আমারও জুটেছে—সুনীল, কিরণ, ঘি, তুস্বা ইত্যাদি। সন্তোষকে দলে টানতে পারি নি। সে বলে, ওসব যারা লেখে, তারা সবাই ডিস্‌পেপসিয়ার রুগী। দেখছিস না তোদের রবিবাবুর কেমন চিঁ-চিঁ সুর, তা না হলে কি পুরুষমানুষের গলা এমন কখনও হয় ? এই নিয়ে সেদিন সন্তোষের সঙ্গে একচোট হাতাহাতি হয়ে যায় আর কি !

সেদিন লিখতে বসে মাথায় কিছুই আসছে না। লাইনগুলো কেমন যেন খুঁড়িয়ে চলে। তবু ঘষে মেজে মনের এই শোচনীয় অবস্থাটা লিখে ফেললাম।

> লিখতে চাই যে পদ্য
> হয়ে পড়ে ছাই গদ্য
> বলে দাও ভাই অদ্য
> পেটে ধরে যায় খিল।
> হ্যাঁ, নদী নদ্যৌ নদ্যঃ
> হয়েছে কী অনবদ্য !
> 'দ'-এ 'য'-ফলায় সদ্য
> আর যে পাই না মিল !

মদ্য দিয়ে মিল করবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মাস্টার মশাই বারণ করে দিয়েছেন : ওটি দেওয়া চলবে না, ওতে কিসের নাকি একটা গন্ধ আছে।

ছুটলাম নানার কাছে। তিনি পড়ে প্রথমে খানিকটা হাসলেন। তার পর খোশ-মেজাজে বললেন, বেশ ভালই হয়েছে, তবে শুধু মিলের দিকে চোখ রাখলে চলবে না, ভাবের দিকেও ঝোঁক থাকা চাই। কবিতা ও পদ্যে অনেক তফাৎ, বুঝলে?

—এর মানে কী? সোজা কথায় বুঝিয়ে দাও।

কিছুক্ষণ চোখ বুজেই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, মিল দিয়ে কথা সাজানোকেই বলে পদ্য, আর ছন্দোবদ্ধ ভাবের সমষ্টি হ'ল কবিতা।

ভাবের অভাব বলেই তো কলম থেমে গেল, নইলে আরও কিছুটা চালাতাম।

আর চালিয়ে কাজ নেই। ভাব ও ভাষা যেন পঙ্গু না হয়—এটা বিশেষ খেয়াল রাখবে।

আবার গৌরের কথায় আসা যাক।

যথাসময়ে নানার কানেও গৌরের কথা উঠল। কটা ঝি, কার কী নাম, তিনি কখনই খোঁজ রাখতেন না। সে সব নানীর ডিপার্টমেণ্ট। আজ হঠাৎ এই দুঃসংবাদে তিনি যেন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, তাঁর বাড়িতেও ঝি আছে।

কী সর্বনাশ! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! যে রামেন্দ্রসুন্দর কোন স্ত্রীলোকের পায়ের দিকে ছাড়া মুখের দিকে কখনও চেয়ে দেখেন না, 'মনসা কর্মণা বাচা' যিনি চরিত্রবান্, তাঁর বাড়িতেই কিনা, ঝি-চাকরের এই কাণ্ড! নানী নানাকে বুঝিয়ে দিলেন: আমি যা ব্যবস্থা করবার করেছি, তুমি এ সব মেয়েলী কথায় থেকো না। রামেন্দ্রসুন্দর সবেগে মাথা দুলিয়ে বললেন, যা ইচ্ছে হয় কর, কিন্তু গৌর যেন আমার সামনে না আসে, আমার দাড়ি না কামায়।

সেদিনকার মত তাঁর দাড়ি কামানো হয়ে গিয়েছে। একদিন অন্তর তিনি ক্ষৌরকার্য করতেন। নানা বসে কী সব কাগজ পড়তেন, তার সঙ্গেই দাড়ি কামিয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে গৌর তাঁর গাল মুখ মুছিয়ে চলে যেত। দু দিন পরে সে যথারীতি কামাতে শুরু করেছে, এক গালের অর্ধেকটা কামানো হয়েছে। হঠাৎ গৌরকে তিনি যেন নূতন করে দেখতে পেলেন, দু দিন আগের কথাটাই তাঁর মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ নানা চেঁচিয়ে উঠলেন, যাও, আমার সামনে থেকে এখুনি বেরিয়ে যাও, আমাকে ছোঁবে না।

চমকে সটান গৌর ক্ষুর ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার পর ধীরে ধীরে তাঁর চোখের অন্তরালে চলে গেল।

ভাগ্যে, ধমক খেয়ে নরসুন্দর নানার গলা কেটে দেয় নি! তারাবাবুকে তিনি তখুনি রাস্তার একটা নাপিত ধরে আনতে বললেন। অতঃপর নানার অবশিষ্ট দাড়ি-সমন্বিত গালের সংশোধনক্রিয়া সমাপ্ত হল।

তার পর যেদিন দাড়ি-কামানোর পালা, ধূর্ত নরসুন্দর গৌর যথারীতি নির্বিঘ্নে তাঁর দাড়ি কামিয়ে চলে গেল। রামেন্দ্রসুন্দর ইতিমধ্যে সে সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। তিনি সংসারের কোন কিছু খোঁজই রাখতেন না। আবার কে কী করে না-করে, শুনলে ভুলেও যেতেন। এই ছিল তাঁর সাংসারিক জীবনের পরিচয়।

মাইকেল বলে গিয়েছেন 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। আমাদের গৌর-জনসংবাদও এখানেই শেষ হ'ল না! একদিন উমাপতি বাজপেয়ীর খাস-কামরায় আসর সরগরম। উঁকি দিয়ে দেখি—কয়েকজন বসে আছেন—সামনে দাঁড়িয়ে তারাপ্রসন্ন। উমাপতিবাবু জোর গলায় বল্‌ছেন—

—কী বলেন তারাবাবু? আপনার স্ত্রী থাকলে স্ত্রৈণ হতেন কিনা জানি না; অহিংসা পরমো ধর্ম্ম যখন আপনার ধাতে সয় না, তখন জৈন বলাও চলবে না। অতএব আমাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনাকে এই ঝি-ঘটিত ব্যাপারে ঝৈন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলাম। মানপত্র লেখা হচ্ছে অচিরাৎ আপনার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

সেদিন এই কথাটির মর্মার্থ সবটা উপলব্ধি না হলেও, তারাপ্রসন্নের বিপন্ন মুখচ্ছবি দর্শন করে আমি যে কতখানি উল্লসিত হয়েছিলাম, সেটা বলাই বাহুল্য।

নানা গরমের সময় প্রায়ই তেল মেখে জল-দেওয়া ভাত খেতে ভালবাসতেন। বুটের ছাতু আর সব কত কী সিদ্ধ নানী শ্বেত পাথরের বাটিতে করে বেশ গুছিয়ে দিতেন।

গরমের দিন, তায় রবিবার, আজ নানার ভিজে ভাত খাবার পালা। আর আমার পালা নামতা মুখস্থ করা, আঁক কষা। সকাল থেকে এই নিয়েই পড়ে আছি। দুপুরেও রেহাই নেই। খাওয়ার পরই আবার শুরু হয়েছে। নানা ইতিমধ্যে স্নান সেরে খেতে বসেছেন, নানী পাশে হাতপাখা নিয়ে।

এক চক্কর ঘুরে এসেই আবার বসলাম, আজ সমস্ত নামতা মুখস্থ বলতে হবে, তা ছাড়াও দুটো আঁক কষা আছে, ভাল লাগছে না। অতএব পদ্য লেখা যাক।

একটা কিছু খাড়া করেই ছুটলাম নানার কাছে, তাঁর খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, আমি পদ্যটা তাঁদের সামনে পড়ে গেলাম—

এক থেকে বিশ নামতা
মনে হয় সবজান্তা,
মুখ হয়ে যায় আমতা
এ কি হল দায় শেষে দেখি হায়
হয়ে গেল ঠিকে ভুল।
নানা খায় ভাত পান্তা
আর কুছ নেই মাংতা,
নানী যে নানার কান্তা
ভক্তির সাথে বসে যান পাতে
গিঁট দিয়ে এলোচুল।

নানার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নানী একবার চুলের ডগায় হাত দিয়ে দেখে নিলেন, রোজকার মত চুলে গিঁট দেওয়া ঠিক আছে কি না! কী এক অতীতের স্মৃতি রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতে রহস্যমধুর হয়ে উঠল।

তিনি তাঁর পাঠ্যজীবনের কথা নানীকে বলবার সময় উচ্ছল হয়ে উঠলেন: কাঁদির স্কুলে যখন পড়ি, আমার সঙ্গে পড়ত দীনে ট্যাড়া। তারা ছ ভাই।

নানা আঙুল গুনে একটার পর একটা নাম করে যান—দীনে ঘুস্কো, দীনে মুস্কো, দীনে টুড়ো, দীনে হুড়ো, দীনে ট্যাড়া, দীনে ম্যাড়া।

তারপর বললেন, ট্যাড়াকে ঘোড়ার সম্বন্ধে কিছু লিখতে বললেই সে গাধার প্রবন্ধ লিখে আনত। এঁকে বললাম আঁক কষতে, লিখে আনলেন পদ্য। কথা শেষ করেই রামেন্দ্রসুন্দর সশব্দে হেসে উঠলেন। সে কী উচ্চগ্রামে হাসি, তার গমকে আমিও চমকে উঠলাম। ইন্দুপ্রভা এক কথায় নানাকে চুপ করিয়ে দিলেন: পদ্য লেখার বাতিক তোমারও এই বয়সে কম ছিল না।

সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হলাম: অ্যাঁ, বল কি? তুমিও কবিতা লিখতে? তার একটা নমুনা শোনাও তো!

কথা আর বেশী অগ্রসর হল না। নানা মুখ ফিরিয়ে বললেন, এখন আর নমুনায় কাজ নেই, যা টাস্ক দিয়েছি সেটা করে এনে দেখাও।

ফেরবার পথে মনে মনে মতলব আঁটি। একদিন নানাকে ধরে তাঁর ছেলেবেলার কবিতা শুনতেই হবে।

সুনীলের সঙ্গে আমার আলাপের দানাটা বেশ বেঁধে উঠল। রাজশেখর বসুর বাড়ির দু-একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতার কোঠায় এসে পৌঁছেছে। অন্য পাশের বাড়ির সন্তোষের সঙ্গে অনেক আগেই গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে নিয়েছি। প্রাথমিক অনুষ্ঠানও শেষ হয়েছে। এবার নানার অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে বিকেলে খেলাধুলো করি। টেবিল-টেনিস ব্যাডমিণ্টন খেলি, কখনও বা বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগানে আবার ক্রিকেট খেলাও চলে। খুব কাছেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি। নানা আমাকে কখনও সেখানে নিয়ে যান। সার্ জগদীশচন্দ্র আমাকে একটা যন্ত্র দিয়েছিলেন—ছোটখাট খেলনার মত দেখতে, নাম বলেছিলেন: Wimshurst Machine। বেশ ছোট্ট দুখানা থালার মত, হাতল ঘুরিয়ে চালিয়ে দিলে, দুটো দু দিকে চলে, আর তার থেকে পুটপুট করে কেমন আলো বের হয়, তাও দেখিয়ে দিলেন। এই আলোই নাকি বিদ্যুৎ। আর ওদিকে সামনে ন্যাশনাল কলেজ, যেখানে এখন বিজ্ঞান-কলেজ হয়েছে—সার্ পি. সি. রায় সেখানেই থাকতেন। নানা তাঁর কাছেও আমাকে নিয়ে যান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কেমিষ্ট্রির দুর্বোধ্য বিষয়গুলি কার সঙ্গে কী মেশালে কী হয় বেশ সহজ সরল করে গল্পচ্ছলে আমায় বলে যেতেন এবং এগারো-বারো বছরের ছেলেকে অবলীলাক্রমে ঘাড়ে উঠিয়ে অদূরে গ্রীয়ার পার্কে বেড়াতেন। বয়স কম হলে কী হয়; বেশ ওজন-দুরস্ত ছিলাম কিনা, তাই কিছুক্ষণ পরে স্কন্ধচ্যুত করে আমায় মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়তেন। আমাকেও তাঁর কোলে মাথা রেখে শুইয়ে দিতেন।

সেই ন্যাশনাল কলেজ একদিন লর্ড কারমাইকেল পরিদর্শন করতে আসেন। নানাও নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে। লাট সাহেবের অভ্যর্থনার জন্যে স্বদেশী কন্‌সার্ট পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল—তবলা ডুগি সেতার এস্রাজ প্রভৃতি। তবলা-ডুগি বাঁধা হয় নি—হাতুড়ির খটখট আওয়াজ হচ্ছিল, সেতার-এস্রাজের কান মলে সুর মেলানোও তখনও শেষ হয় নি। এমন সময় লর্ড কারমাইকেল পদার্পণ করলেন। তিনি কন্‌সার্টের সামনে আধ মিনিট দাঁড়িয়ে সেই সুর-বাঁধাবাঁধির ভূমিকা দেখেই মৃদু হাস্যে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ইণ্ডিয়ান মিউজিক।

তিনি ভাবলেন, ওই বুঝি আমাদের ঐকতান বাদনের এক নমুনা।

ব্যাপারটা নানাকেও স্পর্শ করেছে। সমস্ত লজ্জা যেন তাঁরই। লাট সাহেবের এবম্বিধ মন্তব্যের কারণ অনুসন্ধান করায় তিনি বললেন, সব-কিছুর জন্যে আগে থেকে

প্রস্তুত না হলে এমনিই হয়। গোটা বছর ফাঁকি দিয়ে, পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়লেও ছেলেরা যেমন ফেল করে, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সকলেরই একটু সময়জ্ঞান থাকা দরকার। আমিও তাঁর কথা না থামতেই উত্তর দিলাম, নিশ্চয়ই, সময়জ্ঞান থাকা খুবই উচিত। যেমন তোমার ঘড়িতে দশটার আগেই বারোটা বাজিয়ে রাখো। খোঁচা দিতে চাইলাম বটে, পেলাম আত্মপ্রসাদের সুর। বললেন, সেটা এগিয়ে থাকে, পিছিয়ে থাকে না।

এমনি করেই পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলাধুলো করেই দিনগুলো কাটছিল। খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে 'লালগোলার লাল' বলে ডাকত। নানার কাছে একদিন নালিশ ঠুকে দিলাম।

তিনি অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলেন, তা বেশ তো।

ঠ্যালা দিয়ে বললাম, কী বললাম, শুনছ?

অ্যাঁ? তা মন্দ কী? কালো তো বলে না!

নানার কৃপায় আর একটি মানুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি আমার নবনিযুক্ত ড্রইং-মাস্টার—নাম নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মা ষষ্ঠীর কৃপাধন্য তিনি। ছেলে-মেয়েতে আজ একুনে আঠারোটি। তিনি এখনও জীবিত আছেন। বাড়ি শ্রীরামপুরের কাছে। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, দেড় ডজন ছেলে-পিলে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বাড়িতে অগাধ শান্তি বিরাজ করে। গুরুমাকে দেখে মনে হয় না যে, তিনি এতগুলি সন্তান-সন্ততির জননী। মাস্টার মশাই ও তাঁর স্ত্রী আমাকে এখনও যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁরা দুজনেই মাটির মানুষ। আমার ছবি আঁকা ভাল লাগত, তাই মাস্টার মশায় বড় যত্ন করে আমায় ড্রইং শেখাতেন আর নানার অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলায় আমাকে নিয়ে যেতেন। খেলা দেখবার সময় মাস্টার মশাই বড় মজা করতেন। মোষবলি দেখেছি—হাড়িকাঠে ফেলে খড়্গ তোলবার সময় যেমন সমবেত তীব্র চীৎকার আর ঢাকঢোলের বাজনার সঙ্গে শোনা যায়—জয় মা কালী, তেমনই পেনালটি হলেই, খেলোয়াড়দের দূরে সরিয়ে বলটাকে গোলের সামনে রাখার পর যখন সবাই শটের প্রতীক্ষায় থাকত বলে পা দেবার আগেই মাস্টার মশাই করজোড়ে চিৎকার করে উঠতেন—জয় মা-আ-আ আ! সুরে সুর মিলিয়ে আমিও যোগ দিতাম।

তিনি অসুস্থ থাকায় কয়েকদিন আসেন নি, তাই নিবারণ পণ্ডিত আমায় খেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন।

ইংরেজী ১৯১১ সন। ফুটবল খেলায় মোহনবাগানের খুব নামডাক শুনতে পেলাম। ছেলেরা একত্র হলেই শিব ভাদুড়ী বিজয় ভাদুড়ীর কথা। বয়সে হাজার বড় হলেও তাদের নাম এখন 'শিবে' ও 'বিজে'তে এসে ঠেকেছে। সব বড় বড় ষণ্ডা গুণ্ডা গোরার দলকে শীল্ডের খেলায় হারিয়ে দিচ্ছে।

সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাব বলে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আবদার ধরে বসলাম—ড্রইং-মাস্টার কয়েকদিন অসুস্থ থাকায় আসেন নি, তাই তিনি নিবারণ পণ্ডিতকে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। সঙ্গে সুনীল আর সন্তোষ। সেদিন মিডলসেক্স রেজিমেণ্টের সঙ্গে খেলা—মোহনবাগান 'ড্র' করল। আবার যেদিন খেলা হবে, নানাকে ধরে বসলাম: আজও যাব। তিনি আবার পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

মাঠে গিয়ে শুনলাম, পিগট নাকি অজেয় গোলকিপার। সেদিন একটা অঘটন ঘটে গেল। খেলা শুরু হতেই মোহনবাগানের অভিলাষ বল নিয়ে মিডলসেক্সের গোলে ঢোকবার মুখে, পিগটের সঙ্গে বিষম ধাক্কা লাগতেই গোলপোস্টে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের 'ক্রশবার'খানা ভেঙে পিগটের বাঁ চোখটা খাম করে দেয়। তারপরেই দুর্ধর্ষ গোরার দল একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। এদিকে মোহনবাগানের অগ্নিনৃত্য—শিবদাস ভাদুড়ী আর হাবুল এক-একখানা করে গোল দিতেই কেল্লা ফতে! খুব আনন্দ, হৈ-চৈ করে বাড়ি ফিরে এলাম। সব প্লেয়ারের নাম ছেলেদের মুখে মুখে। পথে ঘাটে, অলিগলিতে ওই এক মোহনবাগান আর মোহনবাগান। ফাইনাল খেলার আগের দিন রামেন্দ্রসুন্দরকে বললাম, কাল মোহনবাগানের শেষ খেলা—আমি দেখতে যাব। তিনি রাজী হলেন না। এদিকে অনেকের মুখেই শুনলাম, বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী লাহোর থেকে নাকি মোহনবাগানের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখতে দলে দলে লোক কলকাতায় এসেছে—মাঠে খুব ভিড় হবে, তাই দশটার সময় খেয়ে-দেয়ে ওখানে গিয়ে বসা চাই। মাটিতেই বসতে হত, সে সময় এখনকার মত গ্যালারি ছিল না। বোধ হয় আট আনা দিলে চেয়ারে বসতে পাওয়া যেত। মাঠের চতুর্দিকে দড়ি দিয়ে ঘেরা।

নানাকে অনেক বুঝিয়ে বলি। কিন্তু কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না, বললেন, মাঠে অনেক ভিড় হবে। তা ছাড়া দশটার সময় গিয়ে অতক্ষণ রোদে বসে থাকা চলবে না। এত খেলা দেখার ঝোঁকই বা কিসের?

তুমি কী বুঝবে নানা?—চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল, তবু রামেন্দ্রসুন্দরের কৃপা হল না।

হাইকোর্ট আছে, আপীল করলাম।

নানীর কাছে মাথা খুঁড়ে বলি, আজ খেলা দেখতে না পেলে আমি আর বাঁচব না।

নানী অভয় দিলেন: আচ্ছা, তুই কাউকে কিছু এখন বলিস নি, পণ্ডিত মশাইকে সঙ্গে দিয়ে ঠিক পাঠিয়ে দেব।

আশ্বস্ত হলাম। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে সুখবরটা দিতেই তিনি মস্তক কণ্ডূয়ণ করে বললেন, আমার খুব সর্দি হয়েছে, আজ আর যেতে পারব না। তিনি না গেলে আমার কিছুতেই যাওয়া হবে না এটা আমি জানতাম, তাই ছুটে গিয়ে নানার ফৌজদারী বালাখানার তামাক একটা কৌটোয় ভর্তি করে পণ্ডিত মশাইকে ঘুষ দিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম।

ঈশান কোণের মেঘ অন্তর্হিত। ঈষৎ হেসে নিমরাজী হলেন তিনি। তামাকের টিন ফেরত দিয়ে বললেন, যাও, এটা যেখানকার জিনিস, সেখানে রেখে এস।

নানী রামেন্দ্রসুন্দরকে কেমন করে রাজী করিয়েছিলেন জানি না, তিনি পণ্ডিতজীকে ডেকে বললেন, একে খুব সাবধানে নিয়ে যাবেন—শুনছি আজ বড় ভিড় হবে।

আমার স্ফূর্তি দেখে কে?

সিদ্ধিদাতা গণেশকে মাথা ঠুকে প্রণাম করে আমি, সুনীল, সন্তোষ পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে যাত্রা করলাম। মনে মনে সবাই মানত করি—আজ যেন মোহনবাগান জিতে যায়। সবাই এক শো এগারো নম্বর গাড়িতে সওয়ার হলাম, তখন বেলা একটা। পৌঁছে দেখি, উঃ, কী জনস্রোত বয়ে চলেছে! কী লোকের ভিড়—এত হাজার হাজার লাখে লাখে নরমুণ্ড ইতিপূর্বে কখনও দেখি নি। চারিদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সবারই মুখে একটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন। আজ কী হবে? বাঙালীর জয়, না, পরাজয়? এই জাতীয়তাবোধ নানার কৃপায় আমার মনের মধ্যেও তখন গাঁথা হয়ে গেছে।

সন্তোষ চানাচুর বাদামভাজা কিনতেই আমাদের মধ্যে হাতে হাতে বিলি হয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই টেরও পেলেন না। ভিড়ের চোটে অস্থির হয়ে তাঁরও মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে, একটু চুলবুল করলেই অহেতুক তাড়া দিয়ে চলেছেন।

ঘণ্টা চারেক পর খেলা শুরু হল। বুক দুড় দুড় করে, “কী হয় কী হয় রণে—জয় পরাজয়!” ইডেন গার্ডেনের গাছের ডালে ডালে শাখামৃগের মতই মানুষ ভর্তি—চারিদিকে তাকিয়ে দেখি তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

মোহনবাগানের খেলা যেন গোটা মাঠময় একটা বিদ্যুতের ঝলক—প্রতিপক্ষের গোলের কাছে আক্রমণের সে কী রচনা-কৌশল! ঈস্ট ইয়র্কের সঙ্গে খেলা—তাদের ক্রেসী নাকি বিশ্ববিখ্যাত গোলকিপার—কত কথাই না শুনছি! আমিও বুক ঠুকে সন্তোষকে বলি, আমাদেরও হীরালাল আছে, তাকে ভেদ করে গোল দেওয়া কঠিন।

আমরা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে খেলা দেখে যাচ্ছি। হাফ-টাইম হতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পশ্চাতে একজনকে তার জনৈক বন্ধুর কাছে বলতে শুনলাম,

—কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত করেছি—যদি মোহনবাগান জেতে!

তার উত্তরও শোনা গেল—

—মা কালীর পাঁঠুর বড় দুঃখু কিনা—তাই তিনি তোর ঘুঁষের অপেক্ষায় বসে আছেন!

অদূরে আর এক তাজ্জব ব্যাপার!

জন তিনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সজোরে হরিনামের মালা ফিরিয়ে যাচ্ছেন, কারো চক্ষু মুদ্রিত, কারো অর্ধনিমীলিত আর কারো বা পিট্‌পিটে চোখে মিট্‌মিটে আলো! এ আবার কী?

পণ্ডিত মশায়কে দেখি তিনিও সেদিকেই অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করি—

—এ আবার কী পণ্ডিত মশাই?

তিনি চোখ ইসারায় নিষেধ করলেন, যেন তাদের ধ্যানভঙ্গ না হয়!

আবার খেলা শুরু হ'ল।

এক দিকে গাট্টা-গোট্টা স-বুট-পা, আর এক দিকে বাঙালীর লিক্‌লিকে সরু নগ্ন চরণ-যুগলের কৃতিত্ব—তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম। ইংরেজের আমদানি করা এই খেলা—তাদেরই কাছে টেক্কা মেরে ভারত কি আজ উড়িয়ে দেবে আকাশে তার বিজয়-বৈজয়ন্তী! মোহনবাগান শুধু একটা দল নয়—ক্লাব নয়—সমস্ত বাঙালী জাতির প্রতীক; শুধু বাঙালী নয়—সমস্ত ভারতীয়ের সম্মান আজ তাদেরই হাতে।

দেখলাম ঈস্ট ইয়র্ক দল যেন মরীয়া হয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের জখম করতে চায়। উত্তেজনায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছি, আর পণ্ডিতের চাঁটি খেয়ে স্বস্থানে বসে পড়ছি। এমন সময় মোহনবাগান এক গোল খেয়ে গেল। যত সাহেব, মেম আর গোরা সৈন্যদের সে কী উল্লাস, সে কী উন্মত্ত চিৎকার! কতিপয় মুষ্টিমেয় বাঙালী যাঁরা নিজত্বকে বর্জন করে ইংরেজের শ্রীচরণে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন, তাঁরাও এদের সঙ্গে তাল দিয়ে হৈ-চৈ করছেন।

পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের মত ওরাও সাহেব বনে গেল নাকি?

মুখ খিঁচিয়ে পণ্ডিত উত্তর দিলেন, আমি ওদের গুষ্টির খবর রাখি নাকি? খিস্টান-টিস্টান হবে! এদিকে শুধু বাঙালী নয়, সমস্ত ভারতীয় একেবারে নিশ্চল, প্রস্তরীভূত মূর্তি।

আমিও তখন শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল। খেলার কিছু না বুঝলেও পণ্ডিত মশাই আমার এবম্বিধ ভাবান্তর লক্ষ্য করে কী যে সব সান্ত্বনাবাক্য ছাড়লেন, কানেও গেল না।

আবার খেলা শুরু হল। মোহনবাগান গোল খেয়েও অবসাদগ্রস্ত হয় নি। নূতন উদ্যমে বল নিয়ে যেন নাচতে লাগল। প্রত্যেকের দেহে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ। আজ জয়ী না হলে যেন তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চায়।

ভাদুড়ী ব্রাদার্সের লিকলিকে সরু ঠ্যাংগুলো যেন জাদুকরের মায়াদণ্ড—ভেলকি দেখিয়ে দিলে। হঠাৎ শিব ভাদুড়ী ওরফে আমাদের 'শিবে'র পায়ে বল আসতেই বিশ্ববিখ্যাত গোলকীপার ক্রেসীর বোধগম্য হওয়ার আগেই অশনিপাতের মতই সেটা ছুটে ক্রসবারের কোণ দিয়ে যেন স্ক্রুর মত ঢুকে পড়ল ঈস্ট ইয়র্কের গোলে।

উঃ, সে কী উত্তেজনা! প্রত্যেক ভারতীয়ের সে কী উদ্দাম নৃত্য! ওখানেই আবার কে যেন চেঁচিয়ে বলল : ইডেন গার্ডেনের গাছের ডালে বসা কে একজন আনন্দাতিশয্যে হাততালি দিতে গিয়ে সোজা ধরণীতলে পপাত মমার চ। আর একটি গাছে শাখার দোলন এত প্রচণ্ড মাত্রায় চলছিল যে মড় মড় করে ডাল ভেঙে কয়েকজনের হাত-পা জখম হয়ে গেল। তা যাক, আজ যদি সমস্ত জীবনের বিনিময়ে মোহনবাগান জয়ী হয় সেওভি আচ্ছা!

ওদিকে সমস্ত ইংরেজ বাচ্চাদের মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

যা হোক, গোল পরিশোধের পর বল সেণ্টার করে আবার খেলা শুরু হল।

মোহনবাগানের অভিলাষ ঘোষ আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করে গোরার দলকে থ বানিয়ে একটা গোল দিয়ে বসল।

উঃ, তারপর কী তুমুল কাণ্ড—ছাতা, লাঠি, ওয়াটারপ্রুফ, চটিজুতো ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের আকাশমার্গে উড্ডীয়মান। এমন কি, সেই অতিভক্তিপ্লাবিত ত্রয়ীর জপের মালাও তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে, বুঝিবা বিজয়ীর কণ্ঠলগ্ন হবার আশায় উড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, এখন তার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে গেল—ও সবের আর দরকার কী ছাই! সন্তোষ সুনীলের কোমরে হাত জড়িয়ে নাচ জুড়ে দিলে। আমারও তিড়িং তিড়িং লম্ফপ্রদান। লক্ষ লক্ষ সিংহের ক্ষুধিত গর্জন—একটা যেন প্রবল ভূমিকম্প চলেছে, থামতে চায় না। পণ্ডিতের পিলে-চমকানো তাড়া কোথায় যে তলিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই।

শেষ বাঁশী বাজল, খেলাও থেমে গেল, কিন্তু হাজার হাজার কণ্ঠের মত্ত চীৎকারের বিরতি নেই। এদিকে আলো, ওদিকে অন্ধকার—সাহেবদের মুখে চুনকালি। যাক, আজ বাঙালীর মানরক্ষা করেছে এই মোহনবাগান।

আমিও ভিড় ঠেলে সুনীল-সন্তোষের হাত চেপে ধরে বেরিয়ে আসছি। পণ্ডিত মশাই সেই বিপুল জনস্রোতের চাপে কোথায় যে ছিটকে পড়লেন, এধার ওধার অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। কী বিভ্রাট!

বিপদে পড়লাম। সন্তোষ আমাকে বলল, চল্, এগিয়ে দেখা যাক, মোহনবাগান আই. এফ. এ. শীল্ড কেমন করে ঘাড়ে তোলে!

সুনীল তাল দিয়ে বলে, দেখলেও জীবন সার্থক!

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার পিঠটাও যে সার্থক হয়ে উঠবে না'নার হাতে—সেটাও একবার ভেবে দেখ্।

সে কথা শোনে কে? আবার গলা জড়িয়ে বলে, ওরে লালচাঁদ, সেটা তো নিত্য-নৈমিত্তিক, পেটে খেলেই পিঠে সয়—চল্ চল্, আর দেরি করিস নে।

আমিও নেচে উঠলাম।

পণ্ডিত মশাইকে না-পাওয়ার দুঃখ আপাততঃ ধামাচাপা থাকল। জনসমুদ্র ঠেলে আমরা তিনটি প্রাণী প্রাণ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। গিয়ে দেখি, ঢেউ-দেওয়া-চুলে টেড়িকাটা 'শিবে' আর 'বিজে'কে কাঁধে তুলে সবাই নাচ লাগিয়েছে—বাকী ন জন খেলোয়াড়ও বাদ পড়ে নি। সেদিনের দুর্দমনীয় দল ঈস্ট ইয়র্ক আজ পরাভূত হয়ে গোবেচারীর মত অদূরে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে চেয়ে দেখছে।

আজ অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

নগ্নপদ ভেতো বাঙালীর কাছে পরাজয়—এ কি তাদের ধাতে সয়! চোখে মুখে যেন একটা তীব্র অনুশোচনার কালিমা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডারউইনের থিয়োরিকে সত্য প্রতিপন্ন করতে চাইল—দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সি. এফ. সি. ক্যাম্পে ঢুকে গেল।

আমি, সুনীল, সন্তোষ ছুটে গিয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে কজনকে সামনে পাই, তাদের দেহ একবার ছুঁয়ে নিয়ে সত্যই নিজেদের কৃতার্থ বোধ করি। শুধুই মনে হয়, সমগ্র বাঙালী জাতিকে তারাই যেন আজ গৌরবের উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছে।

সবই তো হল। নিবারণ পণ্ডিত বিহনে আমার সমস্ত বিজয়োৎসব সেদিন যেন ম্লান হয়ে আসে—রামেন্দ্রসুন্দরের সুগম্ভীর মুখমণ্ডল আর ভ্রূকুটি-কুটিল নীলচক্ষুর কথা মনে পড়ে যায়। আজ আমার ভাগ্যে কী আছে বলা যায় না। সন্তোষ আমায় ধাক্কা দিয়ে বলল, ওরে লালগোলার লালু, আজকের দিনেও এমন মুখ গোমড়া করে থাকিস নে।

শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলাম, ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে একবার ভেবে দেখ্।

উচ্ছল সন্তোষের মুখে হিন্দী বাত: কুছ্পরোয়া নেই—এইসা দিন নেহি মিলে গা।

সে কলকাতার তৈরী ছেলে—যতটা কথার তুবড়ি তাব মুখে, ঠিক ততটাই আমি এদিকে ঝিমিয়ে পড়ছি অনাগত আশঙ্কায়। আবার মাঝে মাঝে জলেও যে না উঠছি তা নয়। এই জনসমুদ্র আর এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে এর আগে তো কখনও পড়ি নি, তাই তার প্রবোধ-বাক্য ঠিক পরিপাক করে উঠতে পাচ্ছি না।

শীল্ড কাঁধে নিয়ে মোহনবাগানের তাঁবুতে সবাই ফিরে এল, আমরাও স্রোতের ফুলের মত তাদের সঙ্গে ভেসে যাই আর মাঝে মাঝে লাফিয়ে শীল্ডটা ছুঁয়ে নিজেদের পবিত্র করে নিই—যেন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আজ ওইটের মধ্যেই বর্তমান। ভিড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবার যোগাড়—কাপড় জামা শতচ্ছিন্ন, পায়ের একপাটি জুতো নেই—হয়তো বায়ু-পরিবর্তনে গিয়েছে।

রাত তখন আটটা। ওরা নাকি প্রসেশন করে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে কালীঘাটে যাবে—মায়ের সিঁদুর গোটা শীল্ডে মাখিয়ে আবার তেমনি করেই জয়ধ্বনির সঙ্গে ফিরে আসবে। সন্তোষের ইচ্ছা, যতই রাত হোক না কেন, সেও যাবে। আমি আর সুনীল বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম: ঢের হয়েছে, আমরা বাড়ি ফিরে যাব।

কিন্তু আমি সুনীল কেউ পথঘাট চিনি না, কেবল আমাদের মধ্যে ওস্তাদ হচ্ছে সন্তোষ, সে সব জানে-শোনে। তাই আবার তাকে অনুরোধ করি, তোর পায়ে পড়ি ভাই, আমাদের বাড়ি নিয়ে চল্।

ভাবগতিক বুঝে অগত্যা সেও রাজী হল। চৌরঙ্গী পর্যন্ত হেঁটে এসে একটা ছ্যাকড়াগাড়িতে চেপে বসলাম। ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ—দু-এক আনা ছোলাভাজা খাবার পয়সা যা ছিল, তা তো অনেক আগেই খরচ হয়ে গিয়েছে, আমার পকেটে একটি আধলাও নেই। গাড়িভাড়া দেব কেমন করে?

সন্তোষ ঝানু ছেলে, সে অম্লান বদনে বলল, বাড়িতে গিয়ে তোর নানাকে বলিস, মিটিয়ে দেবে। নাম শুনেই আঁতকে উঠলাম। গাড়িটা যতই আমাদের বাড়ির কাছে এসে পড়ে, ততই আমার সেদিনের সব-কিছু বীরত্ব, সব-কিছু উদ্দীপনা শুল্ক হয়ে যায়। সারকুলার রোড দিয়ে পার্শীবাগানে ঢুকেই আমাকে কামানের মুখে এগিয়ে দিয়ে সন্তোষ সুনীল নেমে পড়ল।

গলিময় যেন একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। গৌর আমাকে দেখে ছুটে এসে গাড়িতে উঠেই বলল, থানা-পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। তিন-চারজন তিন-চারটে গাড়িতে তিন-চার দিকে বেরিয়ে গেছে, নানী কেঁদেই খুন, নানার অবস্থাও কাহিল। পণ্ডিত মশাই আমসির মত মুখ করে ফিরে এসে বাড়িতে খবর দিয়েই আবার বেরিয়ে গেছেন, আবার ফিরে এসে আবার বেরিয়েছেন।

গৌরকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আজ নানা আমার হাড় কখানা আর বাকী রাখবে না, কী হবে গৌর? সে অভয় দিয়ে বলল, কিচ্ছু হবে না, আপনাদের কিচ্ছু দোষ নেই। পণ্ডিতেরই তো গাফিলতি। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গেল। ভিড়ে ছেলে-পিলেদের সামলাতে পারে না, তবে আর নিয়ে যাওয়া কেন?

শুনে আশা পেলাম, ভরসা পেলাম না।

গাড়ি সামনে আসতেই ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত নানী ছুটে এসে আমায় কোলে করে নামিয়ে নিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর গেটের সামনেই ঠায় দু-তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে, তিনিও এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এতটা বিচলিত সচরাচর তাঁকে দেখা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ দুটিতে তাপ আছে, দাহ নেই। তিনিও আমার সঙ্গে উপরে উঠে এলেন। কী হয়েছে না-হয়েছে সবই তাঁকে খুলে বললাম। তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খেতে বসালেন।

পরদিন বিকেলে, রামেন্দ্রসুন্দর না বললেও, গতদিনের সমস্ত খেলার বিবরণ স্বেচ্ছায় লিখে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পড়তে বললাম। তিনিও পেন্সিল হাতে আদ্যন্ত পাঠ করে দু-এক স্থানে সংশোধন করে দিলেন। পরে আমার মাস্টার মশাই জানকীনাথ গুপ্তের কাছে শুনলাম, নানা বলেছেন—রচনাটি জীবন্ত হয়েছে। আমার বয়সের তুলনায় নাকি খুব উচ্চাঙ্গের। জানকীনাথ আমাকে পড়াতেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও মন্তব্য করলেন, প্রাণের সংযোগ থাকলেই লেখা সুন্দর হয়। আর একটা কথা ঘিয়ের মুখে শুনলাম, বাবুদাদা একতরফাই কেবল ইন্দুমার বকুনি খেয়ে যান, এবার বাবুদাই কত কিছু শুনিয়ে দিয়েছেন, ইন্দুমার মুখে একটি কথাও নেই।

শুনে তৃপ্ত হলাম। ভাবলাম, নানীর জন্তেই তো এবার এই ঐতিহাসিক খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, অতএব দোষটা তাঁর হবে না তো হবে কার?

এই সঙ্গে নানার উদ্বেগের আর একটি কথা মনে পড়ল। আমার গৃহশিক্ষক জানকীবাবু ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, ইনিও রিপন কলেজের প্রফেসার। বেশ সজ্জন, গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ, হাওড়ায় একতলা তাঁর বসতবাটি।

জানকীবাবু বিদায় নেবার পূর্বে আমাদের তিনজনকে তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন—আমি, ঘি ও দুম্বা। দেশের বাড়ি ছাড়ার পর কলকাতায় এসে আর কোথাও নিমন্ত্রণে যাবার সৌভাগ্য হয় নি, তাই দুম্বা ভোজ খাবার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। তার জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। কোর্মা কোপ্তা কাবাব নিশ্চয় হবে, রসগোল্লা সন্দেশ সে তো আছেই। সুবিধে পেলে গোটা এক হাঁড়ি দই সে একাই সাবড়ে দেবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই আমরা তিনজন সাজসজ্জা করে বসে আছি। একটু অন্ধকার হতেই জানকীবাবু গুরু ও গুরু-পত্নীর অনুমতি নিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমাদের বসিয়ে রেখে থলি হাতে বাজারে চললেন। তখন রাত আটটা।

বসে আছি তো আছিই, খেতে ডাকবার নামগন্ধ নেই। খিদে আমারও পেয়েছে বটে, কিন্তু দুম্বার চোখে যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। রাত এগারোটা বেজে গেল, কার না এ রকম হয়! ঘি তো দু-একবার ছটফট করে ঘুমিয়েই পড়ল। দুম্বা আর পারে না। পেটে হাত দিয়ে 'বাবা রে মা রে' ডাক ছাড়ে আর কি!

মাস্টার মশাইকে বললাম, যা হয়েছে তাই দিন মাস্টার মশাই। বড্ড খিদে পেয়েছে।

তিনি মিঠেকড়া রকমের তাড়া দিয়ে বললেন, সব তৈরী হচ্ছে কিনা—একটু সবুর করতে হবে বাবা, বৃহৎ কার্যে একটু-আধটু দেরি হয়েই থাকে। সব সময়ে অধৈর্য হলে চলে না।

দুম্বার চোখ পলকে জলে উঠেই আবার নিবে গেল। ঘুমের আবেশে আমরা দুজনেই ঘিয়ের পাশে লম্বা হলাম।

রাত বারোটা বাজে, আমাদেরও বারোটা বাজিয়ে মাস্টারমশাই টেনে খাওয়াতে ওঠালেন। জানকীনাথের স্ত্রী সামনে বসে। মাস্টার মশাইয়ের বাবা লণ্ঠন হাতে খড়ম পায়ে এঘর-সেঘর করছেন।

খেতে বসেই দুম্বার চক্ষুস্থির! এই আয়োজন! থালার উপরে দুখানা লুচি, আকারে অতি ক্ষুদ্র, বড় ঘিয়ের বাটিতে একটু ঝোল আর এক টুকরো মাংস, আর দু-একটা তরকারি—ওজন আন্দাজ আধ ছটাক। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিঃশব্দে হজম করে নিলাম। নিদ্রালস নেত্র খুলে অবাক হয়ে চেয়ে আছি, মাস্টার মশাই তাড়া দিলেন : খাও না, কী দেখছ ?

তৎক্ষণাৎ লুচি দুখানা হাতের মুঠোয় একসঙ্গে পাকিয়ে মুখের মধ্যে আলগোছে ফেলে দিলাম, দাঁতের ব্যূহ ভেদ করে গলার গণ্ডীতেও পৌছয় নি, এমন সময় স্বরটা মিহি করে জানকীবাবু বললেন, আর দেব কি ?

পেটে খিদে, মুখে লাজ। উত্তর দিলাম, না না, রাক্ষস না কি ? এতটা খেতে কি মানুষ পারে ?

দুম্বা চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিন, এ রকম লুচি আরও ত্রিশ-চল্লিশটা আর বড় বাটির এক বাটি মাংস।

মাস্টার মশাই বাধা দিয়ে উপদেশ দিলেন : অত খেতে নেই, অসুখ করবে।

ভাবলাম, আর সুখে কাজ নেই, এখন উঠতে পারলেই বাঁচি।

ঘি নিরুত্তর, চোখ তুলে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, আমিও তদ্রূপ।

উঠে পড়লাম। আবার ছ্যাকড়া গাড়িতে বোঝাই হয়ে মাস্টার মশাই আর আমরা তিনজন ফিরে আসছি। কোথাও দেখি কনেস্টবলের পাগড়িটা দাওয়ায় রাখা, তার মাথাটা ঘুমের ঘোরে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে ; কেউ বা অদূরে

গ্যাসপোস্টে ঠেস দিয়ে লাঠি হাতে ঝিমিয়ে নেয়, অজস্র জন-কোলাহলমুখরিত জীবন্ত কলকাতার বুকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। নগরীর একঘেয়ে নীরস দিনগুলির সেই কঠিন গদ্যকাব্য নেই, সে বাচালতাও আর নেই, যেন কে তাকে মূক করে দিয়েছে। নিদ্রিত রাজপথের ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমরা ফিরে চলেছি পার্শীবাগানে।

মাস্টার মশাই সানন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন খেলে? রান্না ভাল হয়েছিল তো? সবই তোমার গুরুমা স্বহস্তে রেঁধেছেন।

ডুম্বা বয়সে ছোট, রেখে-ঢেকে কথা বলার বুদ্ধি তখনও হয় নি। সে আগেই চেঁচিয়ে উঠল: পেটেই গেল না—কেমন হয়েছে, কী করে বলব?

ঘিয়ের বেশ চাপা বুদ্ধি, কথাটা চেপে দেবার উদ্দেশ্যে বলল, কার কথা শুনছেন মাস্টার মশাই? বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে।

এবার আমার পালা। জানকীবাবু আমার দিকে ফিরেই জানতে চাইলেন, তোমার কেমন লাগল ধীরেন?

আমার আগেই যে যার মন্তব্য ব্যক্ত করেছে, আমার তো আর গতানুগতিক উত্তর দিলে চলবে না। বিশুদ্ধ ভাষায় আরম্ভ করলাম, অতি মধুর, অতি উপাদেয়! আচ্ছা, মা-ঠাকরুন এমন রান্না কার কাছে শিখলেন মাস্টার মশাই? ইচ্ছে হচ্ছিল দু-একদিন থেকে মায়ের রান্না আরও খেয়ে আসি।

সরল গোঁয়ার পেটুক ডুম্বা আবার চেঁচিয়ে উঠল: তা হলে আর পৈতৃক হাড় কখানা নিয়ে ফিরে আসতে হত না ধীরেনদা।

ঘি আর আমি একসঙ্গেই তাকে ধমকে উঠলাম, তোর মত রাক্ষস তো কেউ নয়, বেশী খেলে অসুখ করে, তাও বুঝি জানিস নে?

রাত একটায় বাড়ি ঢুকেই দেখলাম, নীচেই রামেন্দ্রসুন্দর টহলদারি করছেন।

মাস্টার মশায়কে দেখেই নানা উষ্ণ হয়ে বললেন, জানকী, তোমার বেশ আক্কেল দেখছি, এত রাত্রে ওদের নিয়ে ফিরলে! বাড়িতে ভেবেই অস্থির—বলছিল, ঘিয়ের গায়ে গহনাপত্তর আছে। কোনও গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে নিশ্চয়। তারাপ্রসন্নকে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি, দেখা হয় নি? এই দুগ্ধপোষ্যদের নিয়ে রাত একটায় বাড়ি ফিরলে, একটুও তোমার হুঁশ নেই?

ভাবলাম, হুঁশ তো নিশ্চয়ই নেই, নইলে আমাদের না খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

নানা মাস্টার মশাইকে অনেক ভর্ৎসনা করলেন। তুম্বা আর ঘি এতে যে অখুশী হয় নি, এটা হলপ করেই বলতে পারি।

জানকীবাবুর মুখে রাম-রহিম কোনও শব্দই নেই, মাথা পেতে সব কথা শুনে গেলেন।

তুম্বা ছুটে গিয়ে নানীর কাছে 'খাব খাব' রব তুলেছে। ঘিও বিনিয়ে বিনিয়ে নানীর কানে সব কথা তুলে দিল। আমিও বলি, কিছু না খেলে ঘুম হবে না।

নানী করেন কী? তাড়াতাড়ি ঝিকে উঠিয়ে স্টোভ জেলে আবার গরম লুচি ভেজে দিলেন, বাড়িতে সন্দেশ জিলিপি প্রচুর ছিল, তাই দিয়ে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আমরা তিনজন গোগ্রাসে গিলে চলেছি—এমন সময় নানা ভিতরে এসে আমাদের ভোজন-পর্বের ঘটা দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। সকলের দিকে একটা বিস্ময়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন, এই খেয়ে এসে আবার রাত-দুপুরে খাওয়া হচ্ছে কেন?

নানী কড়া থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন, যাও তো, এখন শুয়ে পড়, তোমাকে পরে সব কথা বলব।

দ্বিরুক্তি না করে রামেন্দ্রসুন্দর পথ ধরলেন।

আমরাও রাত আড়াইটায় ভরা পেটে শুতে গেলাম।

যেবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন, রামেন্দ্রসুন্দর সেবারও খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। টাকির জমিদার যতীন মুন্সী পরিষদের কার্যোপলক্ষে প্রায়ই নানার কাছে আসতেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে কিছুদিন গঙ্গাপথে ভ্রমণের অনুরোধ করে তাঁর নিজস্ব বজরাখানি দিতে চাইলেন। সম্রাটের আগমনের পূর্বেই যাত্রার আয়োজন হল। রামেন্দ্রসুন্দর, ইন্দুপ্রভা দেবী, চঞ্চলা মাসী, ঘি, তুম্বা, নির্মল, আমি আর মাসীমার কাচ্চাবাচ্চারা, ঝি, চাকর, বামুন—সবাই বজরায় চেপে বসলাম। সেবার গিরিজা মাসী সঙ্গে নেই। গঙ্গাপথে নবদ্বীপ যাব আবার ফিরে আসব, সঙ্গে গোটা দুই ছোট ডিঙিও ছিল। বলাই বাহুল্য, স্বনামধন্য তারাপ্রসন্ন সঙ্গেই আছেন। এঁকে নানী খুব ভালবাসতেন। শীতকালে যখন পটোল পাওয়া যেত না, তিন-চার টাকা সের দাম উঠত, তখন তিনি টাকা-সের পটোল কিনে আনতেন। নিজের পকেটের টাকা গচ্ছা দিয়ে নানীর কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে বলতেন, দেখুন বড়মা, আমি ছাড়া এত সস্তায় আর কেউ কিনতে পারে কি না অন্য কাউকে দিয়ে একবার পরখ করে

দেখুন। বড়বাবু পটোল খেতে ভালবাসেন কিনা, তাই আপিসের কাজকর্ম সেরে ত্রিভুবন খুঁজে তবে যোগাড় করে আনি।

নানীও তাঁর জেদাজেদির ঠ্যালায় অন্যকে দিয়ে বাজার দেখিয়েছেন ; কিন্তু এক টাকায় এক সের পটোল কোথাও পাওয়া যায় নি। কাজেই সমস্ত বাজারের ভার তারাপ্রসন্নের উপর ছিল। দুষ্টু লোকেরা অবশ্য বলত, শাকের কড়ি মাছে মিশিয়ে, তিনি বেশ কিছু রোজগার করে থাকেন। তা যার যা ইচ্ছে বলুক, নিষ্কাম পরোপকার তো সবার ধাতে সয় না—বরং অহেতুক অপকার করেই কেউ আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে—তাই কারও কিছু করে দিয়ে যদি 'টু পাইস' পকেটে আসে, মন্দ কী ? লোকটি পরোপকারী হলেও সকলের ছিদ্রান্বেষী ছিলেন বলেই বাড়িতে কেউ তাঁকে দেখতে পারত না, এমন কি রামেন্দ্রসুন্দরের আপন ভ্রাতা বা আত্মীয়স্বজন কেউ নয়। এঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের মত বালক-বালিকার ওপরেও তারাপ্রসন্নের প্রসন্নভাব দেখি নি।

আবার আসল কথায় ফিরে আসি। আমরা সব গঙ্গাপথে ভাসলাম। নানীর বেশী উৎসাহ—তাঁর গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করলেন, নানা ও তিনি জোড়ে গঙ্গাস্নান করবেন। এতে নাকি মহাপুণ্য, তা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা এখন নানাকে তিনি চোখের সামনে দেখতেও পাবেন।

নানীকে বললাম, তোমার উল্লাসের কারণ বুঝলাম, কিন্তু আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। এইটুকুর মধ্যে হাত-পা মেলবার উপায় নেই, দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে খেলাও চলবে না—আমি কী করব, বল তো ?

রামেন্দ্রসুন্দর বজরার গবাক্ষপথে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে আপন মনেই কী যেন বলছিলেন, আমার অসহায় সুর আর দুঃখের কথা কানে যেতেই তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন।

হাসির মাঝখানেই নানী বললেন, এ কথাটা তোমার কানে গিয়েছে তা হলে ? খোকার ভাগ্যি বলতে হবে।

দিন যায়, রাত্রি যায়, বজরা চলতে থাকে। আমি বড় বিষণ্ণ, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছি। খাবার সময় কোনও জায়গায় নোঙ্গর করলেই, আমি, ঘি আর দুম্বা নেমে খরগোশের মত লম্বা ছুট দিয়ে আবার বজরায় ফিরে আসতাম।

নানা একদিন কথায় কথায় নানীকে বললেন, ছেলে-পিলেদের এক-আধটু হাত-পায়ের দুষ্টুমি না দেখলেও আমার ভাল লাগে না, খোকা ইদানীং কেমন যেন ভাল

মানুষ হয়ে গিয়েছে। নানী প্রতিবাদ করে বললেন, উড়তে না পারলেই পোষ মানে, এখানে বেচারী করেই বা কী ?

আমার সঙ্গে মাস্টার আসে নি। একটা নির্দিষ্ট সময়ে নানাই পড়াতেন। দেশ-বিদেশের কত মজার গল্প এমন একটা জাদুকরী ভাষায় তিনি বলতেন যে, মন নিয়ে না শুনে উপায় নেই।

প্রথম যখন কলকাতায় আসি, নানা কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় আমাকে অঙ্ক শেখাতেন। কতকগুলি দেশী মাটির পুতুল, তার সঙ্গে রঙ-বেরঙের কড়ি নানার আদেশে তারাবাবু কিনে আনেন। তিনি সেই পুতুল সাজিয়ে প্রাথমিক যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শেখাতে আরম্ভ করলেন। ভাল ছেলের মত নানার কাছে বসতাম বটে, নজর থাকত ওই সব পুতুলের ওপরই বেশী; কাজেই আমার কাছে সরল অঙ্কগুলো দুরূহ হয়ে উঠত। তাই সে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ নিয়মেই আমাকে অঙ্ক কষানো শুরু করলেন, ফলে দশ দিনের-পরিবর্তে দু দিনেই সেটা আমারও আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইদানীং আমাকে দিয়ে বাংলা রচনা বেশী লেখাতেন বটে, তবে ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজী ভাষায় কেমন করে কথা বলতে হয়, আমাকে তাও শেখাতেন। কলকাতাতেও চলত, এখন তো কথাই নেই—সময় প্রচুর। তিনি প্রশ্ন করেন, আমি উত্তর দিই। ব্যাকরণের ভুল হলে, কেন কিসের জন্যে হল, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন, কোন্ শব্দের আগে কোন্ প্রিপজিশন বসবে, নেস্‌ফিল্ড গ্রামার খুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। বানান ভুল হলে আর রেহাই ছিল না। একদিন দু-দু-বার Assassination কথাটার বানান ভুল করে বসলাম। দু-দুটো ডবল 's'-এর কথা আর খেয়াল থাকে না। বিরক্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গাধার ইংরেজী কী ?

Ass.

যা তুমি।

বাঃ রে, আমি গাধা হতে যাব কেন ?

বার বার একই ভুল করছ বলে। এবার বানান কর Ass.

এ ডবল এস।

বেশ, ডবল Ass যোগ কর—

মুখ তুলে নানাকে প্রশ্ন করি, আর একটা বুঝি দুম্বা ?

শিক্ষকের গাম্ভীর্য আর বজায় রাখা যায় না—তবু মুখখানাকে যথাসাধ্য অবিকৃত রেখেই নানা প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণ করে বললেন, ওর পরে ination বসাও, তা হলেই Assassination হবে। এবার মনে থাকবে তো?

তাঁর শিখিয়ে দেবার ভঙ্গীটা আজও ভুলতে পারি নি। তিনি বলতেন, মনে মনে বলবে "ডাইমাইনিউটিভ," উচ্চারণ করবে "ডিমিনিউটিভ"—তা হলেই আর "আই"-এর জায়গায় "ই" বসিয়ে ভুল করবে না। এই রকম বানান ঠিক রাখবার অনেক হদিসই তিনি বাতলে দিতেন।

নানী কখনও নিজের হাতে পান সেজে দিলে তিনি মাঝে-মধ্যে খেতেন বটে, তবে আসক্তি ছিল না।

একদিন নানাকে ধরে বসলাম, আচ্ছা, বল তো নানা, তুমি এমন হয়েও সিগারেট তামাক খেতে শিখলে কেমন করে?

নানা নিরুত্তর।

মাতব্বরের মত আবার প্রশ্ন করি, কী, চুপ করে রইলে যে বড়? উত্তর দাও—জবাব না দিলে তোমায় ছাড়ব না। বল না, গোড়ার কথাটা কী?

হ্যাঁ, তা হলেই হয়েছে আর কি? ওই বিদ্যেটাই ধরবে, আর কিছুই শিখবে না।

চঞ্চলা মাসী কাছেই ছিলেন। সুর চড়িয়ে বললেন, বাবার তামাক খাওয়ার অভ্যেসটা কেমন করে হল সেইটাই জানবার জন্যে ছেলের যত ছটফটানি! আর কেমন করে যে বাবা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন, সোনার মেডেল পেলেন, কতদিন ধরে বৃত্তি পেয়েছেন—সে সব তো কই জানবার ইচ্ছে হয় না!

তা হয় বইকি। সত্যি কথা বলতে কি, সবচেয়ে বেশী জানতে ইচ্ছে হয়, এমন বিশ্রী হাতের লেখায় তিনি কেমন করে ফার্স্ট হলেন। ওরে ব্বাবাঃ, একটা লাইন উদ্ধার করতেই আমরা সব হিমসিম খেয়ে যাই। আবার তখুনি নিজের মনকেই প্রবোধ দিয়ে বলি, আজকের মত এমন দেবাক্ষর হয়তো তখন ছিল না, নইলে বুঝলে কিনা—

বৃত্তাকারে হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই—একটা গোল্লার আকৃতি। নানার মৃদুহাস্য। নানী সমস্যার সমাধান করে দিলেন: তবে শোন্, বলি। তোর নানা যখন পাস হয়ে কলেজে পড়তে আসে, খুব রাত জেগে পড়ত কিনা—ঢুল আসত বলে ওঁর এক বন্ধু ওঁকে সিগারেট খাওয়া ধরালে। এখনকার মত চা খেয়ে রাত জাগবার রেওয়াজ তো তখন ছিল না। তাই ঘুম পেলেই তোর নানা দু-এক ফুঁক টানত। তোদের

বললে গুণের মধ্যে কেবল চুরুট ধরবি, এমনি তো বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক দিনেই বড় দেখা যায়—তা আবার রাত জেগে পড়া!

কৈফিয়ত শুনে আমিও আশ্বস্ত হলাম, নানাও এ যাত্রা রেহাই পেলেন। কলকাতায় নানা প্রায়ই আমাকে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ম্যাপ আঁকতে বলতেন। এখানে তাঁর অবসর প্রচুর, তাই তাঁর আদেশে আরও বেশী মাত্রায় মানচিত্র এঁকে নানাকে দেখাতে হত; তিনিও কোন্ কোন্ দেশ কিসের জন্যে বিখ্যাত, সেটা ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। নানা প্রশ্ন করেন, আমি উত্তর দিয়ে যাই। আবার কখনও বলেন, এবার তুমি মাস্টার হও, আমি ছাত্র। আমাকে এবার জিজ্ঞেস কর।

আমিও শিক্ষকের আসনে বসে তাঁকে প্রশ্ন করি, তিনিও একে একে জবাব দিয়ে যান। একদিন তাঁকে লাইবেরিয়ার ক্যাপিটাল কী, জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিতে পারলেন না।

বোটের ওপর-নীচে কিছুক্ষণ নর্তন-কুর্দন চালিয়ে বিজ্ঞের মত ছাত্রকে বলি, আরে, এটাও জান না! লাইবেরিয়ার রাজধানীর নাম মন্‌রোভিয়া। আবার নানাকে গম্ভীর হয়ে বলি, তুমি পড়া বলতে পারলে না, তোমাকে শাস্তি দেব। আগে কথা দাও, যা বলব, শুনবে।

হ্যাঁ, দিলাম। এখন মাস্টার কী সাজাটা দিচ্ছেন, শুনি?

আচ্ছা, এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার কালি-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

আমি জানতাম, নানা কথা দিয়ে তা প্রত্যাহার করেন না।

তিনি চমকে উঠতেই বললাম, না, সেটি হবে না, তুমি কথা দিয়েছ, মনে থাকে যেন। আমার খেলতে না পাওয়ার দুঃখটা একবার তোমারও টের পাওয়া দরকার।

ইন্দুপ্রভা কাছেই ছিলেন। তর্জনী ঘুরিয়ে বললেন, আমি যেটা পারি নি, এবার নাতির কাছে বেজায় জব্দ হয়েছে। দেখব, কেমন না লিখে থাকতে পার!

আমরা নৌকা-ভ্রমণে বেরিয়েছি কিনা, তাই বুঝি নানা আমাদের কথার মুখে কিস্তি চালিয়ে কিস্তিমাৎ করলেন, আমাদের মিলিত বিজয়োল্লাস থেমে গেল।

বেশ তো, কথা দিয়েছি, না হয় চব্বিশ ঘণ্টা কালি-কলম ছোঁব না, এর সঙ্গে বই ছুঁতে বারণ থাকলেই হয়েছিল আর কি!

ওই যাঃ, তাও তো বটে! আমিই উলটে চাল-মাৎ হয়ে গেলাম, এখন দাঁতে আঙুল কাটা ছাড়া উপায় কী?

কথায় কথায় একদিন রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, 'নিউজ' কথাটি কোত্থেকে এসেছে জান? বিলেতের কী একটা কাগজের নাম করে বললেন, সেটা এখন স্মরণ নেই, তার ওপরে 'অ্যারো হেড' দিয়ে লেখা থাকত, নর্থ, ঈস্ট, ওয়েস্ট, সাউথ—অর্থাৎ উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ থেকে যে সংবাদ আসত, তার থেকেই News কথাটিরও উৎপত্তি। নানা একখানা কাগজে এঁকে বুঝিয়ে দিলেন: দুটো সরল রেখা পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করেছে—ওপরের দিকটা তীর মার্কা করে লিখলেন—N, ঠিক তার নীচেই উলটো তীর দিয়ে লিখলেন S, দক্ষিণে দিলেন E আর বাঁয়ে W, ওই কথাটি এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন যে, এখনও মনে আছে। আমার এই নবলব্ধ জ্ঞান নিয়ে প্রথম আক্রমণ চালাই তারাবাবুর ওপর, তিনি ঠকে গেলেন। কলকাতায় ফিরে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র উমাপতিবাবুকে জিজ্ঞেস করি। তার পর আমার মাস্টার মশাইয়ের কাছে জানতে চাই: কই, বলুন তো নিউজ কথাটির সৃষ্টি কেমন করে হল? কেউ বলতে পারে না, তখন আমার কী স্ফূর্তি! আবার গিয়ে নানাকে বলি, আমি কতজনকে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারে নি।

ভ্রূভঙ্গী করে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, তোমাকে তো কেউ পরীক্ষক নিযুক্ত করে নি, এখন থেকেই এ সব দুষ্টুমি ভাল কথা নয়।

বাস্, আমিও ছেদ টানলাম, কখনও আর কাউকে জিজ্ঞেস করবার কথা মনে আসে নি।

গঙ্গাপথে ভ্রমণের কথা বলছিলাম। আমি সেখানে নির্বান্ধব—মন মোটেই ভাল নেই। কখনও বোটের ছাদে যাই, নেমে আসি, আবার উঠি—ঘিয়ের সঙ্গে খেলা করি, ঝগড়া করি, কখনও আদর করি।

চারিদিকে জল আর জল। রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতেন। পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যে নয়, সে লোভ তাঁর ছিল না। চির-উদাসী রামেন্দ্রসুন্দর যখন জামা খুলতেন, তার সঙ্গে কখন যে পৈতে বেরিয়ে আসত মনেই থাকত না, তারপর তাঁর উপবীতহীন খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে কেউ যদি ধরিয়ে দিত, তখনই খোঁজ নিয়ে দেখা যেত, পৈতেটি তাঁর জামার গায়ে জড়িয়ে আছে, কখনও বা ভূমিতলে লুণ্ঠিত। কখনও বা খেয়াল করে উপ-নয়নের সাহায্যে উপবীত খুঁজে বের করতেন। মাথার যন্ত্রণার জন্যে চশমা নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করার কথা নানার মত লোকের কি আর

মনে থাকে! ডাক্তার তো উপদেশ দিয়েই খালাস, কিন্তু শোনে কে? কোথায় চশমা আর কোথায় তার খাপ—এগুলো ঠিক করে রাখা রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে অসম্ভব।

তিনি নাস্তিক ছিলেন না। সহধর্মিণী ইন্দুপ্রভার অনুরোধে তিনি একসঙ্গেই মন্ত্র নিয়েছিলেন। কুলগুরু ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সাধারণ গরিব ব্রাহ্মণ এবং তিনি তাঁরই জমিদারিতে চাকরি করতেন। রামেন্দ্রসুন্দর জমিদারি সংক্রান্ত কোনও কাজ জানতেন না, বিষয়-আশয়ের ব্যাপার নিয়ে কোনও দিনই মাথা ঘামান নি; তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদীর উপর সব-কিছুরই ভার দেওয়া ছিল। বৈষয়িক কার্যাদি সম্বন্ধে কোনও দিন কোনও কথাই তাঁর মুখে শুনি নি।

তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণের আচার মেনে চলতেন, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ বিচার ছিল। কুক্কুটমাংস প্রভৃতি কখনও স্পর্শ করেন নি। জ্ঞানের রাজ্যে বসতি ছিল বলেই বুঝি খুঁটিনাটি বাছবিচার নিয়ে বাঁধাধরা ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা না করলেও তাঁর চলত। তাঁকে কখনও গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্র জপ করতে দেখি নি, গীতা বা চণ্ডী পাঠও করতেন না, তবে আজকাল অনেকেই যেমন উপবীত অনাবশ্যকবোধে গলায় রাখেন না সে দলেরও তিনি ছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দর পবিত্র বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেও খোলের চাঁটির সঙ্গে উদ্বাহু হয়ে কখনোই নৃত্য করেন নি। ভাবে গদগদ চক্ষু দুটি অর্ধনিমীলিত অবস্থায় হরিনামের মালা জপ করতে বা জাতবিচারের আইন-কানুন মানতে কখনই দেখি নি। তাঁর ধর্মই ছিল ভিন্ন জাতের, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একবার রিপন কলেজ-হস্টেলে ছেলেদের মধ্যে জাত-বিচার নিয়ে কী গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেক চেষ্টা করেও মেটাতে পারেন নি। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের শরণাপন্ন হতেই তিনি বললেন, বেশ তো, আমি একদিন হস্টেলে যাব। ছেলেরা সানন্দে তাঁকে নিমন্ত্রণ করল। নির্দিষ্ট দিনে তিনি আমাকে আর দুম্বা ও নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে চললেন কলেজ-হস্টেলে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। রামেন্দ্রসুন্দর কোথাও খেতেন না, তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সে বড় মজার কথা। একবার তাঁর এক ছাত্র তাঁকে দারুণ ধরে বসল কী একটা উপলক্ষ্যে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেই হবে। তিনি যতই বলেন, আহারের বিষয়ে কতকগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, অতএব খুশী মনে যদি সে তাঁকে অব্যাহতি দেয়, তা হলেই ভাল, সে কথা শোনে কে? ছাত্রটি

নাছোড়বান্দা, অনুরোধ করে: সে হবে না, আপনি নিশ্চয় যাবেন, যা হয় একটু কিছু মুখে দিয়ে আসবেন।

আর করেন কী? অগত্যা তিনি রাজী হলেন।

যথাসময়ে তিনি সেই ছাত্রের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ওখানে অবশ্য খেতেই গিয়েছিলেন। আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট পেলেন, কিন্তু আহারের আহ্বান নেই। তিনি নিজেও কিছু বলতে পারেন না। এদিকে পেটে দুর্ভিক্ষের ডাক!

এমনি সময়ে ছাত্রটি যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়ে বলল, মাস্টার মশায়, আপনি তো কিছু খাবেন না, অন্ততঃ এই পান দুটো মুখে দিন।

বাইরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ। রামেন্দ্রসুন্দর অগত্যা পান দুটো হাতে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ডেকে কোনও রকমে বাড়িতে ফিরে এসেই ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে অসহায় বালকের মত বললেন, একটা যা হয় কিছু করে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

এ সুযোগ কি আর ছাড়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল ছড়া—

নানা, এ যে দেখি মহাস্থান,
পেটে ভাত নেই, মুখে পান!

আমার মাস্টার মশাইয়ের মত হল যে! তিনি তো তবু রাত বারোটায় দু-এক টুকরো দিয়েছিলেন, এবার দেখছি উল্টো চাল, তোমার বিদেয় হল দিন-দুপুরে উপযুক্ত শিষ্যের কাছে খালি হাতে খালি দু খিলি পান!

পরে শুনেছিলাম, নানা নাকি নানীর কাছে প্রায় নাক-কান মলেছিলেন, আর কোনও দিন কারও বাড়িতে খেতে যাবেন না। এর পর আমি যতদিন ছিলাম, তাঁকে আর কোথাও যেতে দেখি নি। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আহারের নিমন্ত্রণও তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সেই রামেন্দ্রসুন্দর আজ নিজের নিমন্ত্রণ নিজেই চেয়ে নিলেন।

দুস্বা কোমর বেঁধেই আছে, সেদিনের সেই মাস্টারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয়, সে আজ ভাল করেই দেখিয়ে দেবে। আমি যতই তাকে বুঝিয়ে বলি: সকলের মধ্যে অমন হ্যাংলার মত এটা দাও ওটা দাও কোর না সে সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে: তুমি ভাল ছেলে হয়ে থেকো, খাওয়ার সময় আমি কারও কথা শুনব না।

হস্টেলের ডাইনিং রুমে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের তিনজনকে নিয়ে বসলেন ছেলেরাও একসঙ্গে খেতে বসে গেল। তিনি ধীরে ধীরে তাদের বুঝিয়ে বললেন, তোমরা ভুলে যেয়ো না তোমরা সবাই হিন্দুর সন্তান, ভারতবর্ষের মুখ তোমরা জগতের কাছে ছোট করে দিয়ো না। তোমরা সবাই এক, মানবতাই তোমাদের ধর্ম, আর মনুষ্যত্বই তোমাদের জাত। ছোট বড় শ্রেণী-বিভাগ তোমাদের থাকবে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাস্, ছেলের দল অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। ধর্ম আর জাতবিচার নিয়ে কখনও দলাদলি করবে না—এ প্রতিশ্রুতিও তাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরকে দিল।

স্থির ধীর গম্ভীরপ্রকৃতি রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রদের আবার বললেন, কোনও জাতই এতটা ঠুনকো নয় যে, ছোঁয়া-ছুঁৎ হলেই জাত চলে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভাগ করেই আমাদের সম্প্রসারণ হচ্ছে না, বরং দিন দিন সংকুচিত হয়ে পড়ছি। তোমরাই যদি গোড়ায় গলদ করে বসো, কেমন করে দেশকে গড়ে তুলবে? আর শিক্ষার মূল্যই বা কী? এত কুসংস্কার কেন? উদার দৃষ্টিভঙ্গী চাই, তবেই তো তোমরা একদিন মাথা উঁচু করে জগতের সামনে দাঁড়াবে।

জাত হচ্ছে মনুষ্যত্ব আর ধর্মই হচ্ছে মানবতা, এই দুটি কথা আজ পর্যন্ত আমার জীবনে কাজ করে চলেছে। পরে তাঁর লেখাতেই পড়েছি, "প্রকৃতি আমাদিগকে প্রবল সংস্কার ও দুর্ব্বল প্রজ্ঞা দিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" এই কথাটাই তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হস্টেলের ছাত্রদের সেদিন বলতে চেয়েছিলেন।

মানবতাকেই যে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিতেন, তার একটি ছোট্ট নমুনা দিতে চাই।

একবার রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর নিজের বাড়িতেই বিদ্বজ্জনসমাজে সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পর্কীয় কী একটা বিশেষ আলোচনায় ব্যাপৃত। নানাকে বাড়ির সবাই বড়বাবু বলে ডাকত। তাই এক ভৃত্য এসে খবর দিলে, একজন লোক বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, হেটু তেলী।

কথা শেষ না হতেই হেটু তেলীর সশঙ্কিত প্রবেশ, পরনে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়। নানা তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপরেই ফরাশে বসতে বলেই জিজ্ঞেস করলেন, কী চান?

আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমি তাঁর প্রজা।

কোথেকে আসছেন?

সাম্টা।

রামেন্দ্রসুন্দর বুঝলেন, সে তাঁর জামাতা শীতলচন্দ্রের দর্শনপ্রার্থী, কারণ তাঁকেও সাম্‌টার প্রজারা বড়বাবু বলেই ডাকে।

এদিকে তখনও হেটু তেলী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে, ছুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দর উঠে গিয়ে তার হাত ধরে ফরাশের উপর বসিয়ে দিলেন। সে কিছুতেই বসতে চায় না—যতবার মানুষটির হাত ধরে তিনি বসান, সে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ায় আর নিজেকে খুবই বিব্রত মনে করে। তিন-চারবার এ রকম হওয়ায় রামেন্দ্রসুন্দর এবার নিজেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও আপন আপন আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। তার পর নানা বিশেষ অনুরোধ করায় হেটু তেলী ফরাশে বসে পড়ল বটে, কিন্তু তার চোখে-মুখে একটা দারুণ অস্বস্তি।

এবার রামেন্দ্রসুন্দর উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন, শেতল কোথায় আছ? তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

শীতলচন্দ্রের আগেই কর্ণগোচর হয়েছে সাম্‌টার এক প্রজা নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। লজ্জায় তিনি শ্বশুরের সামনে আসতে চান না। শেষটায় বাধ্য হয়ে তিনি এলেন আর সেই কুণ্ঠিত হেটু তেলীকে কক্ষান্তরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

হেটু তেলী কিন্তু এ ঘটনা জীবনে ভোলে নি—রামেন্দ্রসুন্দরের এই সহৃদয়তা ও আপ্যায়নের কথা সে জনে জনে বলে বেড়াত।

হ্যাঁ, বলছিলাম সেই নৌবিহারের কথা। গঙ্গার বুকে কয়েকদিন কেটে গেল—নবদ্বীপ পৌঁছুতে এখনও ঢের দেরি।

একদিন বজরার নিভৃত কক্ষে বসে রাত্রি দশটা পর্যন্ত নানা কী সব লিখছিলেন। নৈশভোজনের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, নানী বারংবার তাগিদ দিচ্ছেন—রামেন্দ্রসুন্দর মাঝে মাঝে বলছেন, এই যাচ্ছি। আমিও তাঁর সঙ্গে খাব, তাই নানার পেটে খোঁচা দিয়ে বলছি, এস না, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

নানা তাড়াতাড়ি সমাধি ভঙ্গ করে উঠে এলেন।

খিদে লাগার কারণও ছিল। সেদিন বৈকালে বজরা থামিয়ে তারাপ্রসন্নবাবু কোত্থেকে মায়ের কাছে বলি দেওয়া পাঁঠার মাংস এনেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত ছিলেন না, তবে মাঝে মাঝে খেতেন।

খাবার সময় নানা আমায় প্রশ্ন করলেন, এই গঙ্গাভ্রমণ কেমন লাগছে?

মোটেই ভাল না। তেমন একজন সঙ্গীও নেই যে মনের সুখে খেলাধুলো করি।

নানী হেসে বললেন, তা হলে একটা সঙ্গী জুটিয়ে দিই, কী বল?

খুব স্ফূর্তির সঙ্গেই উত্তর দিলাম, দাও দাও, তাই দাও, আমিও বেঁচে যাই, মনটা কেমন হাঁপিয়ে উঠছে, কিছু ভাল লাগছে না।

ইন্দুপ্রভা রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, দাও না, একটা লাল টুকটুকে নাত-বউ জুটিয়ে, তা হলে তোমার নাতির আর সঙ্গীর অভাব হবে না—খুব খেলাধুলো করবে।

ধ্যেৎ, নানী তো ভারি দুষ্টু!

নানা চোখ পাকিয়ে নানীকে বললেন, ওসব কী বলছ? পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ না হলে ওর বিয়ে হবে না, লেখাপড়া শিখুক, মানুষ হোক, তখন বিয়ের কথা।

নানীও তখনই জবাব দিলেন, আর তুমি যে তেরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলে, তার বেলায় দোষ হয় নি? তুমি বুঝি লেখাপড়াও শেখ নি, মানুষও হও নি, কেমন?

তারপরই নানী বিবাহিত জীবনের কথা বলতে শুরু করে দিলেন: বুঝলি খোকা, তোর নানার যখন তেরো, আমার তখন আট বছর বয়েস। আমার বাবা ভোলা মহেশ্বরকে গৌরীদান করেছিলেন।

ভোলা মহেশ্বর কে?

এই যে তোর নানা! বরকে দেখে তখন ঘোমটা দিতাম না। তোর নানার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খুব মজা লাগত। আর যেদিন খেলতে চাইত না, কোমরে কাপড় বেঁধে ঝগড়া করতাম। তখন থেকেই তোর নানা আমায় জ্বালিয়েছে, রাতদিন কেবল বই—বই—আর বই।

আমি দুজনের মুখের দিকে তাকাই আর হেসে গড়িয়ে পড়ি। হয়তো আর কিছুটা চলত, নানা মাঝপথেই নানীর উৎসাহকে থামিয়ে দিলেন।

থাক্, ওসব কথা এই সব বালখিল্যের কাছে নাই বা বললে!

চঞ্চলা মাসী ছিলেন খুব কর্তব্যপরায়ণা। তিনি বললেন, কী যে বল মা? আমার বাবার সঙ্গে কার তুলনা? বাবা এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন, সে কি আর এই সব ছেলের কম্ম?

নানা খেতে খেতে হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, তা হলে তোমার ভাল লাগছে না, কেমন?

মোটেই না।

আচ্ছা, নবদ্বীপ পৌঁছেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।

তাই কর নানা, তাই কর। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। উঃ, একটু দৌড়-ঝাঁপ করবার উপায় নেই! আর কিছুদিন এমনি থাকলে আমি মরেই যাব।

আমার প্রগল্ভতায় বিব্রত রামেন্দ্রসুন্দর জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো ছুটোছুটি করি না, কই এখনও তো মরে যাই নি!

তোমার মত বুড়ো হলে আমিও স্থাণু হয়ে যাব, তোমার মা তো আর নড়তেই চান না, যেন শিবস্থাপনা হয়েছে।

নানী হেসে উঠলেন, রামেন্দ্রসুন্দর গম্ভীর।

তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে আমায় বললেন, আচ্ছা, বল তো, তোমার বাবা-ঠাকুরদা কলকাতায় এসেছেন, তাঁদের দেখতে চাও, না, পঞ্চম জর্জ আসছেন, কত ধুমধাম হবে, সেইটে তোমার ভাল লাগবে?

আমি অতশত জানি না, তবে বাবা আর দাদুকে কাছে পেলে আর কিছু চাই না।

রামেন্দ্রসুন্দর নানীর দিকে চেয়ে বললেন, ছেলের বুদ্ধিটা দেখছ? খোকা যদি বলত সম্রাটকে দেখতেই সে চায়, তা হলে কক্ষনো পাঠাতাম না।

ঘিয়ের মগজে বোধ হয় 'ঘি'য়ের কিছুটা অভাব, এ কথা শোনার পরেও সে আবদার ধরে বসল: আমাকেও ধীরেনদার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও না বাবুদাদা। কত কী সব ধুমধাম হবে। টিকিটে, পয়সায়, টাকায়, নোটে রাজার মুণ্ডু দেখেছি, একবার জ্যান্ত মানুষটাকে চোখে দেখব।

নানা ধমক দিয়ে উঠলেন: তা হলেই চতুর্ভুজ হয়ে যাবে আর কি?

ঘিয়ের মুখে কে যেন কুলুপ এঁটে দিলে। আমি তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলি—তোর ঘি নাম হলে কী হয়? কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী? নানী টিপ্পনী কাটলেন: দেখ্ না তোর বাবুদার কাণ্ড, অ্যাদ্দিন ধরে বলছি, তা ওঁর সময়ই হয় না। আজ দুনিয়ার সব লোক ভেঙে পড়ছে কলকাতায়, এই সময় কিনা ওঁর নবদ্বীপ যাবার জন্যে মনটা কেঁদে উঠল!

চঞ্চলা মাসী সব কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, বাবার শরীর খারাপ, আমরাই তো জোর করে তাঁকে নিয়ে এসেছি, আর কলকাতায় থাকলেও বাবা কক্ষনো পঞ্চম জর্জকে দেখতে যেতেন না, এটাও নিশ্চিত।

নানা বিষণ্ণ চোখ তুলে বললেন, তা আর হল কই? এড়িয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পারা গেল না। বড়লাট চিঠি দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমাকেও প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত থাকতে হবে।

মাসীমা বললেন, কই, আমরা তো জানি না?

এমন কী আনন্দের খবর যে তোমাদের বলতে হবে। যেদিন যাব আবার সেই দিনই ফিরে আসব।

তাঁর কথার মধ্যে যেন কিছুই সজীবতা নেই।

আমি সোৎসাহে বলে যাই: তা হলে, এটা তোমার শাস্তি নয়, শাস্তি? তা মন্দ কী? আমরা তো রোজই পেয়ে থাকি, তোমারও মাঝে মাঝে এক-আধটু পাওয়া দরকার বইকি!

গলার সুরে রাবীন্দ্রিক কোমলতা মিশিয়ে বলি, তোমার হল শুরু, আমার হল সারা! চঞ্চলা মাসীও মৃদুস্বরে বললেন, সত্যি, এর চেয়ে বড় শাস্তি বাবার আর কিছু নেই।

নানী আর একটি লাইন যোগ করে দিলেন: এ তো আর সাহিত্য-পরিষদ্ নয় যে, বুকের সেনা ফুলে উঠবে।

বেগতিক বুঝে নানা চুপ করে গেলেন।

এমনি করে আমরা গঙ্গায় ভেসে যাই, নানী প্রত্যুষে উঠে পুণ্যস্নানান্তে বজরার ক্ষুদ্র রন্ধনশালায় ঢুকে পড়েন, শিল-নোড়ার খটখটাখট শব্দ ভোরের ঘুমকে অতর্কিত আক্রমণ করে। কুটনো কোটায় ব্যস্ত ঝিয়ের হাতের বেলোয়ারী চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসে। নিদ্রাভঙ্গ হলে আর কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা যায়! রামেন্দ্রসুন্দর উঠে বসেন, আমাকেও ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দেন। দরদস্তুর নিয়ে তারাপ্রসন্নের অহেতুক চিৎকার, মাছ কেনার ধুম পড়ে যায়। নানার কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, তবে ভোরে নিয়মিত সংবাদপত্র পান না বলেই বোধ হয় মেজাজটা সুরে বাঁধা থাকে না, শয্যাত্যাগ করেই চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী চারিদিকে হাত বাড়িয়ে কী যেন খুঁজে দেখতে চান অথচ পান না। আমিও তাঁর ভ্রম সংশোধন করে দিয়ে বলি, ভুলে যেয়ো না, আমরা গঙ্গায় ভেসে চলেছি, যা চাও তা পাবে না— এখানে খবরের কাগজ নেই, কলেজ নেই, তোমার সাহিত্য-পরিষদ্ নেই, রবীন্দ্রনাথও—

মাঝপথে আমার বক্তৃতা থামিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, ওঠ, মুখ ধোও।

আমিও তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বলি, পর নিজ বেশ, পরের লাইনটা বাদ দিয়ে, কী বল নানা?

সাহিত্য-পরিষদ্, কলেজ, রবীন্দ্রনাথ—এ সব কথা মনে পড়তেই তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, অসতর্ক মুহূর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আচ্ছা, তাই।

বাস্, আজ আর পড়া নয়, ঘিকে সুসংবাদটি দিতে গিয়েই আর এক বিপত্তি।

নানী বললেন, বেশ ভালই হল, আমার ডাল কটা বেছে দে।

ওরে ব্বাবাঃ, এর চেয়ে পড়াটাই যে আমার হাজার গুণে ভাল। আবার ফিরে গিয়ে নানার কাছে বলি, তুমি ছুটি দিলেও আমি নেব না, পড়া বলে দাও।

আমার কথা শুনে তিনি অবাক। পরে বললেন, অ্যাঁ, কখন ছুটি দিলাম?

তাঁর কথার পুনরুক্তি করতেই রামেন্দ্রসুন্দরের হুঁশ হল। মাথা দুলিয়ে বললেন, বটে! কী ব্যাপার বল তো?

খুব গুরুতর, নানী একরাশ ডাল বাছবার হুকুম দিয়েছে। ও আমার দ্বারা হবে-টবে না।

খানিকটা দম নিয়ে নানা বললেন, ওই তো দোষ, তোর নানী আমাকেও রান্নাঘরে ঢোকাতে চায়।

আমরা গঙ্গাপথে নবদ্বীপযাত্রী। উজানে যেতে হয়। অনেক জায়গায় থামতে থামতে চলেছি, প্রায় পক্ষকাল পরে নবদ্বীপে পৌঁছনো গেল। বজরা নোঙর করতেই লাফিয়ে নামতে গিয়ে তারাপ্রসন্নের পদস্খলন। তিনি কর্দমাক্ত হয়ে উঠলেন, এক পাটি জুতো কাদার মধ্যে সমাধি লাভ করেছে, হাত চালিয়ে উদ্ধার করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসেন। আমাদের খল খল হাস্য তরঙ্গের মিষ্টি হাসির সঙ্গে মিশে গেল। রামেন্দ্রসুন্দর গম্ভীর। সবাইকে বললেন, কারও পড়ে যাওয়া দেখে হেসে ওঠা—এ আবার কোন্ দেশী ভদ্রতা?

তারাপ্রসন্ন যানবাহন ডেকে নিয়ে এলেন। ইন্দুপ্রভা, চঞ্চলা মাসী, আমি, ঘি, ছেলেপিলে, ঝি-চাকর—সব নবদ্বীপের সোনার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি দেখে ফিরে এলাম। রামেন্দ্রসুন্দর যান নি, তিনি বজরাতেই ছিলেন।

সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ—সে তো আর হবার নয়, তবু মনের একান্ত ইচ্ছা, স্বামীকে নিয়ে ধর্মকর্ম করেন, তাই নানী রামেন্দ্রসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে জুলুম লাগিয়ে দিলেন। নানার ওই একই উত্তর: ওসব আমার পোষাবে না।

নানী খোঁচা দিয়ে বললেন—তবে রাতদিন যাগযজ্ঞ, বেদপুরাণ নিয়ে এত যে সব লিখে যাচ্ছ, তারই বা মূল্য কী?

নানার হয়ে আমিই জবাব দিলাম—

—এ কী কথা বলছো, নানী? নানা ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিন-তিনটি বেদের মালিক, তিনি লিখবেন না তো লিখবে কে? আর সেই জন্যেই তো লোকে ত্রিবেদী

মশাই বলে। চলতি কথায় তেওয়ারীজী, বাংলায় ভবিযুক্ত হয়ে নানা ত্রিবেদী হয়েছেন। অথর্ববেদটা বাদ গিয়েছে কেন, জানো? নিজের দেহে অথর্ব হয়ে পড়েছেন বলেই সে বেদ গ্রহণ করেন নি—নইলে আজ চতুর্বেদী অর্থাৎ আমাদের চোবেজী হয়ে বসে থাকতেন।

আমার এই বেদসম্বন্ধীয় মৌলিক ও কৌলিক তত্ত্বকথায়, রামেন্দ্রসুন্দর শুধু একবার আমার মুখের দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়েই মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন।

তবে ইন্দুপ্রভার লাভের অঙ্কে এই দেখা গেল, নানা কথা দিলেন, আচ্ছা, কলকাতায় গিয়ে তোমাদের নিয়ে একদিন দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যাবে।

মথিলিখিত সুসমাচারের মতই নানী যে শুধু মনের নোটবুকে সেই কথাটি লিখে রাখলেন, তা নয়, সেই মুহূর্তে এ কথাও আদায় করে নিলেন, ভোরে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে গঙ্গাস্নান, ওখানেই রান্নবান্না ও প্রসাদগ্রহণ, তারপর নৌকাযোগে বেলুড় দেখে সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে একটি কথা শুনেছিলাম, অগত্যা।

নানাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, অ্যাদ্দিনের মধ্যে কই কোনদিন তোমায় কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর যেতে দেখি নি, তা হলে তোমার যাওয়াটা বুঝি এবার পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হবে, কী বল, নানা?

হয়তো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি, তাই তিনি হেসে চুপ করে রইলেন।

আমরা সবাই পুণ্যসঞ্চয় করে ফিরে এসে দেখি, নানা বেশ মজার সুখে এক মাঝিকে দিয়ে সাজা কল্কে ধরিয়ে নিয়েছেন। আলবোলায় ঘন ঘন টান, আর চারিদিকে খাতাপত্তর বই ছড়ানো। নিজের মনে হাসছেন, আপন মনেই কথা বলছেন, আর টানা লিখে চলেছেন—

আমরা যে এসে পড়েছি, সেদিকে তাঁর হুঁশ নেই। নানী প্রসাদীফুল নানার মাথায় ঠেকাতেই তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

নাও, হাঁ কর, প্রসাদ খাও।

সঙ্গে সঙ্গেই নানার মুখ-ব্যাদান। কাঁচা সন্দেশ মুখে নেওয়া, মাথায় পুষ্প ঠেকানো—সবই হল। কিন্তু নানা যেভাবে নানীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, মনে হল না, তার মধ্যে কোনও অর্থ ছিল। উদাসী রামেন্দ্রসুন্দরের মন হয়তো তখন অন্য কোন ভাবরাজ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

নানী সেটা বুঝতে পেরেই বেশ মিঠেকড়া শুনিয়ে দিলেন : আচ্ছা লোক যা হোক, বলি, দয়া করে হাত দুটো কপালে ঠেকাও।

দেবী ভারতীর অর্চনারত নানার সচকিত উত্তর : অ্যাঁ, কী বললে ?

এবার নানীর সুরে অনুরাগের মূর্ছনা : প্রসাদ খেলে, একবার মাথা নামিয়ে প্রণামটা করেই ফেল না, তাতে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

এ সুযোগ কি আর ছাড়া যায় ? আমি তখুনি নানীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কাকে ? তোমাকে ?

নানা হঠাৎ যেন এ জগতে ফিরে এসে আমার কথাটি শুনলেন। দম-ফাটা হাসিতে বজরার ছোট কামরাটি কেঁপে উঠল। মনে হয়, কত জন্মের তপস্যা-নির্মল এই সুন্দর পবিত্র হাসি !

পরদিনই তারাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার আগে নানা ও নানী তারাপ্রসন্নকে বারংবার সতর্ক করে দিলেন : দেখো, ওকে ছেড়ে কোনও স্টেশনে নেমে যেন এটা-ওটা খাবার কিনতে যেয়ো না, তা হলে হয়তো খোকা উধাও হয়ে যাবে। যা চঞ্চল ! রাজা বাহাদুরের কাছে জিম্মা দিয়ে আবার ফিরতি ট্রেনেই চলে আসবে।

নানীও তারাবাবুকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, যেন জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে না থাকে, চোখে কয়লা পড়বে।

নানা আমাকে বুকে চেপে ধরে ইন্দুপ্রভাকে বললেন, খোকা সর্বদা আমার কাছেই খায়-দায় শোয়, সে চলে গেলে আমারই যেন কেমন লাগবে, ওর চঞ্চলতার জন্যে ওকে শাস্তি দিতে হয়, আবার না-দেখেও থাকতে পারি না। এদিকে যাই বল, ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান।

নানী চোখ টিপে রামেন্দ্রসুন্দরকে বাধা দিলেন : আর সামনে বলে কাজ নেই, তা হলেই আঙুল ফুলে কলাগাছ।

আমি এবার নানীকেও দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম।

নানার মুখে আমার সম্বন্ধে কখনোই কোনও মিষ্টিকথা শুনি নি। যদিই বা আজ সে ভাগ্য হল, তাতে তোমার এত হিংসে কেন ?

দুজনেই হেসে উঠলেন। প্রণাম করতেই রামেন্দ্রসুন্দর আমার মাথায় হাত দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ভাবলাম, তা হলে নানার অন্তরেও আমার একটা বিশেষ স্থান আছে।

আমার সঙ্গে যেতে না পারায় ঘিয়ের অবস্থা কাহিল। ইন্দুপ্রভার ছলছল চোখ, বললেন, আর চোদ্দ-পনের দিন পরে আমরাও ফিরে আসছি, তুই না থাকলে বজরাটা একেবারেই খালি লাগবে। তোর লাফ-ঝাঁপ না দেখলে আমারই দম বন্ধ হয়ে যায়।

ট্রেনে কলকাতায় এসেই তারাবাবু আমাকে গ্রে স্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে ঠাকুরদার কাছে পৌঁছে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে নানাও কলকাতায় তাঁর নীরস কর্তব্য পালন করে ফিরতিমুখে দাদার সঙ্গে দেখা করে চলে গেলেন।

সম্রাটের আগমন উপলক্ষে অনেক কিছুই দেখলাম। সেই গড়ের মাঠে চারিদিকে লোক থই থই করছে—সমুকুট পঞ্চম জর্জ, আট কি ষোল ঘোড়ার জুড়িতে বসে, ঠিক মনে নেই—পাশেই সম্রাজ্ঞী মেরী। জনতার বিরাট অভিনন্দনের সঙ্গে তাঁরাও প্রত্যভিবাদন করে চলেছেন।

বিভিন্ন রঙের ব্রিটিশ পতাকা চারিদিকে উড্ডীয়মান। রাত্রে ফায়ার ওয়ার্কস—বাজি পুড়িয়ে গরিব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ছাই হয়ে গেল।

উৎসব ফুরিয়ে গেল। রামেন্দ্রসুন্দরও সপরিবারে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। ঠাকুরদা আমাকে তাঁর জিম্মায় রেখে লালগোলায় রওনা হলেন।

ধুলো-পায়ে পার্শীবাগানের বাড়িতে ঢুকে নানাকে প্রণাম করেই কলকাতার ধুম-ধড়াক্কা যা দেখলাম তারই একটা বিবরণী নানার হাতে তুলে দিয়ে বললাম তোমার বলার আগেই কাজটা সেরে রেখেছি। জানি তো, আমায় দিয়ে না-লিখিয়ে ছাড়বে না!

তিনি সেইদিনই আমার রচনাটি পাঠ করে একটি লাইন একেবারেই কেটে দিলেন। সেটি অবশ্য আমার ধার করা—নিজের বলে চালাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল! আসল কথা, জলুস দেখতে গিয়ে একজনকে বলতে শুনেছিলাম 'রাজ-আগমন উপলক্ষে রাজমার্গে বংশদণ্ড প্রোথিত হয়েছে।' আমার রচনায় সেটি বেমালুম বসিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কথাটি তিনি কেন কেটে দিলেন জিজ্ঞেস করায় তিনিই আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, লিখতে লিখতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই হঠাৎ এখানে এমন একটা সাধু ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে কেন? এটা কি তোমার নিজের গবেষণা?

—না, গড়ের মাঠে একজনকে বলতে শুনেছিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর গম্ভীর। চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। জোর দিয়ে বললেন,

—পরের কথা নিজের বলে চালিও না। যা মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সেটি প্রাঞ্জলভাষায় লিপিবদ্ধ করাই রচনার আদর্শ। কখনও ভাষার অপব্যবহার করবে না।

আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুযুগল সুনীল ও সন্তোষের দৈনিক হাজিরা ও খেলাধুলো যথানিয়মে চলতে থাকে, আবার অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়াও করি। আমাদের খেলার বল যদি রাজশেখর বসুর পাঁচিলের ও-ধারে পড়ে যেত, তা নিয়ে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মেয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়, বলটা আর সে ফিরিয়ে দিতে চায় না। তাঁদের আর আমাদের বাড়ির মাঝখানে প্রাচীর মাত্র সাড়ে তিন ফুট উঁচু। গোলমাল শুনে রামেন্দ্রসুন্দর ওপর থেকে দেখেই মীমাংসা করে দেন।

আমি দেখেছি, রামেন্দ্রসুন্দর প্রায়ই রাজশেখর বসুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কত কী আলোচনা করতেন। ওসব আমার ভাল লাগবে কেন? বরং সে সময়টা বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে আলাপ জমিয়ে নেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রাজশেখর বসুর তখন পূর্ণ যৌবন। কে জানত, সেই তিনিই উত্তরকালে "পরশুরামে"র সাহিত্যিক কুঠার চালিয়ে, অনবদ্য রসমাধুর্যে আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তলোক এমন অসংশয়ে জয় করে নেবেন!

ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু আমাদের কারও অসুখ-বিসুখ হলেই আসতেন, সে সময় তাঁর ফী মাত্র দু টাকা। তখনই শুনেছিলাম, তিনি নাকি হিপ্‌নটিক ট্রিট্‌মেণ্ট করেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার যে শুধু ঝগড়াই হত তা নয়, ভাব হলে ও-বাড়িতে গিয়ে গাছে উঠে আমি আর সেই মেয়েটি দুজনেই পেয়ারা খেতাম। এটাও রামেন্দ্রসুন্দরের চোখ এড়াত না। ওপর থেকে দেখেই আমাদের তাড়া দিয়ে নামিয়ে দিতেন, কী জানি পড়ে গিয়ে কারও যদি হাত পা ভেঙে যায়!

একদিন আমাদের ক্রিকেটের বল গিয়ে রাজশেখর বসুর জানলার কাচে লাগতেই তা ঝন ঝন শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর আগেও কয়েকবার এ রকম হয়েছে, তাই নানা বাড়িতে ব্যাটবল খেলা একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। আমরা কখনও টেবিলের ওপর ব্লো-ফুটবল খেলি, কখনও বা টেবিল-টেনিস—

এমনি করেই দিন যায়, মাস যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর অসুস্থ হওয়ায় একদিন তাঁর কনিষ্ঠ দুর্গাদাস ত্রিবেদী আর নীলকমল ত্রিবেদী পদ্মমাকে নিয়ে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর মাথার যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাই তিনি

দীর্ঘদিনের ছুটি নিলেন। কলেজে যান না, তবে সাহিত্য-পরিষদে মাঝে মাঝে না গিয়ে পারেন না। ঠিক আগের মত যেতে পারেন না বলেই হয়তো মনের দুঃখ শরীরে আত্মপ্রকাশ করে।

ছুটি ফুরিয়ে গেল, আবার ছুটি নিলেন। তার পর যতদূর মনে আছে, সেটাও শেষ হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন—আমাকে এবার অবসর দেওয়া হোক, শরীর অপটু হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যতে আর হয়তো পারব না।

সার্ সুরেন্দ্রনাথের উদারতা ভোলবার নয়, তদুত্তরে তিনি নিজে এসে বললেন, আপনি যেতে না পারলেও, আপনার নাম কলেজে যেমন আছে তেমনি থাক্, আপনার পে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, বিশেষ জরুরি কাগজপত্র অমৃতবাবু বাড়িতে এসে সই করিয়ে নিয়ে যাবেন।

কলেজে শুনতাম, একটা চোখ কানা ছিল বলে অমৃতবাবুকে ফক্কড় ছেলেরা নেপথ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলত।

রামেন্দ্রসুন্দর আপত্তি জানালেন, ন্যায়ের দিক দিয়ে এটা হয়তো ঠিক হবে না।

কলেজের অন্যান্য সতীর্থ অধ্যাপক সার্ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও জোর দিয়ে বললেন, আপনার শরীর অসুস্থ বলে যদি এখন এই অবস্থায় রিপন কলেজের গবর্নিং বডি আপনার আবেদন মঞ্জুর করেন তা হলে সেদিক দিয়েও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ন্যায়বিচার হবে না।

অনেক আলোচনার পর বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে রামেন্দ্রসুন্দর শেষটায় রাজী হলেন।

সে সময় নানা প্রায়ই গৌর নাপিত বা আমাদের দিয়ে মাথার চাঁদিতে পুরনো ঘি মালিশ করাতেন। আর একটা বড় গামলার সামনে মাথা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে বেশ ভাল করে মুছে ফেলতেন। এবার মাস খানেকের মধ্যেই সুস্থ বোধ করাতে আবার কলেজ আর সাহিত্য-পরিষদ্ সমান তালেই চলতে লাগল।

অসুখের মধ্যেও দেখেছি, তাঁর লেখাপড়ার একদিনের জন্যেও কামাই নেই। তিনি আপন মনে যখন কিছু লিখতেন বা পড়তেন, তাঁর কনিষ্ঠ দুর্গাদাস বা নীলকমল ত্রিবেদী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদূরে বসে থাকতেন। বিভোর হয়ে তিনি কাজ করে যেতেন, ভ্রাতাদের সঙ্গে কোন কথাই হত না, হয়তো তাঁদের উপস্থিতিই তাঁর খেয়ালে আসত না। এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলেন এই ত্রিবেদী তাপস। একদিন

দুর্গাদাস বললেন, বাবুদাদা, আমি ডি. এল. রায়ের পাশের বাড়িতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আপনার অসুখের খবরটাও তাঁকে বলব।

বাস্, আমিও লাফিয়ে উঠে নানাকে ধরে বসলাম, আমিও সেই পথে একবার ডি. এল. রায়কে দেখে আসব।

তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার, লেখাপড়ার বালাই নেই, আমি মেজো নানার সহযাত্রী হলাম।

পথে যেতে যেতে দুর্গাদাস বললেন, ডি. এল. রায় যখন আমাদের কাঁদীতে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর সঙ্গে খুব খাতির ছিল। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন আপনি কী নাটক লিখছেন?

তিনি হেসে বললেন, আপনাকেই লিখছি।

কথাটা বুঝলাম না, প্রশ্ন করলাম, আপনাকে লিখছি মানে?

দুর্গাদাস।

ওই নামে বুঝি তাঁর কোনও নাটক আছে?

হ্যাঁ।

ডি. এল. রায় তখন 'সুরধামে' উঠে এসেছেন। বাড়ির সামনেই বিস্তৃত সবুজ লন। তার মাঝে দেখলাম, আমারই বয়সী একটি সুন্দর ছেলে আর একটি ফুটফুটে মেয়ে—বেশ মিষ্টি। তারা সাজগোজ করে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গাদাস বললেন, এ দুটি ডি. এল. রায়ের ছেলে মেয়ে—মণ্টু আর মায়া।

যদিও সেদিন দিলীপকুমার ওরফে মণ্টুর সঙ্গে আলাপ হয় নি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসে ফেললাম, উত্তরজীবনে অবশ্য সেটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

সামনের বারান্দা পার হয়ে দেখি, সম্মুখের হল-ঘরে প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড-টেবিল, ঢুকেই বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বসে। ঘরে অনেক লোক জমজম করছে। দু-একজনকে চিনলাম। একজন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আর একজন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজপতি মশাই প্রায়ই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে যেতেন। তিনিও নানার মত তাকিয়ায় মাথা রেখে বেশ লম্বা-চওড়া জায়গা নিয়ে সটান শুয়ে পড়তেন, আর মাঝে মাঝে নানার কাছে কখনও দুশো-একশো, কখনও পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে যেতেন।

দুর্গাদাস ঘরে ঢুকেই বললেন, আপনার একজন বিশেষ ভক্তকে সঙ্গে এনেছি। "আমার দেশ" গানটি ভারি সুন্দর গায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে ডেকে কত আদর করলেন, কাছে বসিয়ে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গাইতে বললেন।

সামনেই তবলা, পাখোয়াজ আর একটি টেবিল-অর্গান ছিল। তিনি তড়াক করে অর্গানের সামনে বসেই সুর দিলেন, আমার গানের সঙ্গে তিনিও কোরাসে গাইলেন। আমার কিশোরকণ্ঠে গানটা তখন মন্দ শোনায় নি। শেষ হতেই দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করার সময় বললাম, আমরা সকালে-বিকেলে প্রায়ই এই গানটা গেয়ে থাকি। আর খুব ভাল লাগে। তার সঙ্গে আরও নতুন দুটো লাইন সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে যোগ করে দিয়েছি, শুনবেন ?

কী বল তো ?

বললাম—

বোমার বিধান দিল বারীনদা
প্রফুল্ল চাকী ত্যজিল প্রাণ,
ক্ষুদিরাম বসু হাসিতে হাসিতে
ফাঁসিতে করিল জীবনদান।
তুই কি না মা গো তাদের জননী—

আর বলা হল না, সমাজপতি মশাই আর পাঁচকড়িবাবু দু ধার থেকে দু'জন সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, উঃ, লাগে যে !

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর লাল টুকটুকে হাতখানা আমার পিঠে বুলিয়ে দিলেন।

দুর্গাদাস ত্রিবেদীর বিশেষ একটা কাজ থাকায় তখুনি উঠতে হল।

আসবার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল বার বার অনুরোধ করলেন, একে সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ আমার কাছে নিয়ে আসবেন, ছেলেটিকে বড্ড ভাল লেগেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ; মেজো নানা পাশের বাড়িতে গিয়ে ভদ্রলোকটির দেখা পেলেন না, একটা চিরকুট লিখে রেখে আমাকে নিয়ে পার্শিবাগানে ফিরে এলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চাইতেই বললাম, লেখবার কিছুই নেই তবে আজ প্রাণ খুলে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানটি তাঁর সামনেই গেয়ে এসেছি।

রামেন্দ্রসুন্দরের যখন মাথার যন্ত্রণা বেড়েছিল, ডাক্তার বারংবার তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন রোজ অতি প্রত্যুষে কিছুটা পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসেন। আমরা তাঁকে খুঁচিয়ে, ধরে-বেঁধে, মাত্র দুদিন প্রাতভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু 'মর্নিং ওয়াক্' রামেন্দ্রসুন্দরের ধাতে সইবে কেন? সেটা যেন তাঁর কাছে 'মোর্নিং ওয়াকে' দাঁড়িয়ে গেল! তিন দিনের দিন তিনি শয্যাত্যাগ না করেই বালকের মত জিদ ধরে বসলেন—নাঃ, আমার দ্বারা অত ভোরে উঠে আর বেড়ানো চলবে না।

ইন্দুপ্রভার ঝঙ্কার শোনা গেল।

—তা চলবে কেন? তোমার শরীর ভাল থাকলে যে আমার একটু উপকার হয়, সেটা যে তুমি কখনই করবে না, তা জানি। না ঘর সংসার দেখা, না মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দু দণ্ড বসে কথা বলা, কিছুই তোমার দ্বারা হবে না। কেবল একগাদা পুঁথি-পত্তর নিয়ে বসে থাকলেই তোমার চলবে— আমার যেমন কপাল!

তিনি আর দাঁড়ালেন না, গজ্ গজ্ করতে করতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কথাটি আমার ঠাকুরদার কানে উঠতেই, গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্যে একটা গাড়ি তিনি কলকাতায় নানার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এক জোড়া মস্ত বড় ওয়েলার ঘোড়া সমেত একটা সুবৃহৎ ল্যাণ্ডো—পেছনের সহিস আর কোচোয়ানের পরনে সাচ্চা জরির কাজ করা কী ঝকমকে সাজ-পোশাক!' 'রোল্‌স্', 'হাম্বার', 'ক্যাডিল্যাক'-এর যুগ সেটা নয়; ফিটন, ল্যাণ্ডো গাড়িই ছিল তখনকার দিনের ধনদৌলতের ব্যারোমিটার।

রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে এ সব খাপ খায় কী করে? তাই তিনি বিষম বিপদে পড়ে গেলেন। শুধু আত্মীয় বলে নয়, আমার ঠাকুরদাকে নানা যথেষ্ট খাতির করতেন, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল বলেই আরও শ্রদ্ধা করতেন। পরমাত্মীয়ই হোন আর অনাত্মীয়ই হোন, রাজামহারাজাই হোন আর কোটিপতিই হোন না কেন, তিনি ফিরেও চাইতেন না, যদি না দেখতেন তার মধ্যে মানবতার বিকাশ। এই রকম স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

রামেন্দ্রসুন্দর দেখে-শুনে সদীর্ঘনিঃশ্বাসে বললেন, রাজা বাহাদুর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন। দু-চারবার চড়তে হবে বইকি। এতে মাঝে মাঝে খোকাকে নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ্ যাব। আমার ছ্যাকড়া গাড়িই ভাল, কী বল খোকা? তোমার কী ইচ্ছা? আমার দলে থাকবে, না ওই গাড়িতে উঠবে?

প্রাণের আবেগে রামেন্দ্রসুন্দরের গা ছুঁয়ে বলে ফেললাম, জানই তো নানা, তোমারই কথায় নিজের হাতে কাপড় কাচি, জুতোয় কালি-বুরুশ করি, মাথায় আজ পর্যন্ত টেরি কাটা দূরে থাক্—কোনও গন্ধতেল মাখি না, জামায় আজ পর্যন্ত সেণ্ট পড়ে নি। সেই মানুষের ওই সব জুড়ী গাড়িতে চড়া পোষায় কি না, তুমিই বল না! নাঃ, ওসব হবে না, তোমার সঙ্গে আমিও ছ্যাকড়া গাড়িতেই যাব।

নানার চোখে বিদ্যুৎ দেখলাম, তিনি আমায় জড়িয়ে বললেন ছিঃ, কারও গা ছুঁয়ে কোনও কথা কাউকে বলতে নেই, যা তোমার মনে আসে তাই সোজা কথায় বলবে, শপথ করলে মানুষের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

আমিও ঘর ফাটিয়ে হেসে উত্তর দিলাম, কী ভাগ্যে আজ তোমার মুখে ভগবানের নাম শুনলাম!

রামেন্দ্রসুন্দর সহাস্যে বললেন, ভগবানের নাম বুঝি মুখে বললেই করা হয়, কেমন? মুখে নাম আর ভেতরে ভেতরে অন্য ফন্দি আঁটব, তাতে ভগবান কখনই সন্তুষ্ট হন না।

বয়সের তুলনায় আমি প্রবীণের মতই কথা বলতাম, এ অভ্যাসটা আমার হয়েছিল কেবল নানার মত জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণের সঙ্গে সর্বদাই থাকতাম বলে। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আমার জিজ্ঞাসারও অন্ত ছিল না, তাঁরও আমাকে বুঝিয়ে দেবার ধৈর্যের সীমা ছিল না।

তা ছাড়া, সব জিনিস খুঁটিয়ে জেনে নেবার চেষ্টাও ছিল প্রচুর। তাই নানাকে আবার প্রশ্ন করি, তা হলে 'হরের্নামৈব কেবলম' কথাটা কেন হয়েছে? এই যে সব সাধু-সন্ন্যাসী আর যাঁরা ভগবানের নাম করেন, তাঁরা কি সবাই ভণ্ড বলতে চাও?

বেশী তর্ক কোর না।—বলেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

চুপ করে গেলে চলবে না, কথাটা ভাল করে আমায় বুঝিয়ে দাও।

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কেউ চলে, আবার কেউ নিজের ছক নিজেই কেটে নেয়। যে দিক দিয়েই

হোক, তাঁর পুজো হলেই হল। তবে দেখতে হবে, যে পথ দিয়ে চলেছি, সেটা ঠিক কি না?

এবার আমি চুপ করে গেলাম। মনে পড়ে গেল একদিন সরস্বতী-পুজোয় নানা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আজ এক ঘণ্টা পড়ে তোমার ছুটি।

আমি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, আজ অনধ্যায়, লিখতে পড়তে নেই। সব ছেলেরাই সরস্বতী-পুজোয় মেতে উঠেছে, না খেয়ে সবাই আজ অঞ্জলি দেবে, আর তুমি কিনা পড়তে বলছ?

ইন্দুপ্রভা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার গাল টিপে বললেন, তোর নানা তো তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই সরস্বতী-পুজো করে, আর তোরা কেবল একদিন হুজুগে মেতে উঠিস। আসল পুজো তোরা করিস কই?

ইন্দুপ্রভার কথা শেষ হলে, রামেন্দ্রসুন্দরও আর একটা লাইন জুড়ে দিলেন, আর তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই যদি অনধ্যায় হয়, তা হলে তোমাদের খুব ভাল লাগবে, কী বল?

একটু এগিয়ে এসেছি। আবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক। সেদিন সাহিত্য-পরিষদের কী একটা জরুরী সভা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর সেদিন ল্যাণ্ডো গাড়িতে উঠলেন। এই গাড়িতে নানা মাঝে মাঝে চড়তেন বটে, তবে বেশীর ভাগ সময়ই ইন্দুপ্রভা দেবী আমার মাসতুতো ভাই-বোনদের নিয়ে কখনও গঙ্গাস্নান কখনও বা বিকেলে বেড়িয়ে আসতেন। আমিও ক্বচিৎ কদাচিৎ ফুরসতমাফিক তাঁদের সঙ্গে যেতাম, খেলাধুলো তো আছে! সাধারণতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের সেই চিরন্তন ছ্যাকড়া গাড়িতেই আমরা দুজনে উঠে মুখোমুখি বসি, তারপর মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—আমাদেরও দৌড় সাহিত্য-পরিষদ্।

কোচম্যানের ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্ 'ফুট বেলে'র আওয়াজে রাস্তা কাঁপিয়ে ওই ল্যাণ্ডো গাড়ি ছুটে চলে পরিষদের দিকে, মাঝে মাঝে পশ্চাতে জোড়া সহিসের সচকিত হাঁকডাকে রাজপথ মুখরিত। রামেন্দ্রসুন্দরের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্যের চিহ্নমাত্র নেই, সঙ্গে আছেন রিপন কলেজের প্রফেসার বিপিনবিহারী গুপ্ত আর স্বনামধন্য অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ললিতবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আসতেন। খোলা ছাতে দুটি মাদুর বিছানো থাকত, দুজনেই খালি গায়ে শুয়ে পড়তেন। কত গল্প, কত

গবেষণা যে চলত তার ইয়ত্তা নেই। মাস্টার মশাই চলে যাবার পর আমিও তাঁদের কাছে গিয়ে বসতাম। ললিতবাবু দু-এক লাইন বাংলা বলে মুখে মুখেই তার ইংরেজী অনুবাদ শুনতে চাইতেন। আমার উত্তরে তিনি খুশীই হতেন।

পড়াশুনা শেষ করেও রেহাই নেই—আমি সরে পড়বার চেষ্টায় থাকি ; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কড়া দৃষ্টিপাহারায় সে সুযোগটুকুও মেলে না।

একদিন কথায় কথায় ললিতবাবু বললেন, তোমাদের লালগোলার লাইনেই আমার বাড়ি, তা জান ?

কই, না ! কোথায় ?

নিষ্পত্র তরুবর।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে—এটি আবার কোন্ জায়গা ? বলি, কই, কখনও শুনি নি তো !

ললিতবাবু আমাকে এই নামটির অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ করতে বলেন।

আমি ভেবেও কিছু কূলকিনারা পাই না—তিনি হেসে সমস্যার সমাধান করে দিলেন, মুড়াগাছার ভাল নাম 'নিষ্পত্র তরুবর' নয় কি ?

রামেন্দ্রসুন্দর আমার অহেতুক লজ্জাকে আড়াল করে উত্তর দিলেন, আমিই হয়তো পারতাম না, খোকার কাছে এটা আশা করাই ভুল।

যা হোক, সেদিন ললিতবাবু আর বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে বহুবিধ আলাপনে মগ্ন রামেন্দ্রসুন্দরের হয়তো খেয়ালই নেই যে, এটা ল্যাণ্ডো গাড়ি। স্থান অকুলান হওয়ায় দুর্গাদাস ত্রিবেদী সাহিত্য-পরিষদের দিকে আগেই সাইকেলযোগে রওনা হয়েছেন। আমরা চলছি। হঠাৎ কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের কাছাকাছি, একটা লাঠি এসে পড়ল অশ্বপৃষ্ঠে। আমি গাড়ির দরজায় হাত রেখে বাহিরে চেয়ে দেখছিলাম, ঠিক আমার হাতের পাশেই একটা লোহার ডাণ্ডা এসে প্রচণ্ডভাবে পড়ল—যেন মোহমুদ্গর ! ঘোড়ার পিঠে পুরু চামড়ার সাজ থাকায় আহত হয় নি বটে, তবে একটা বিকট হ্রেষারব করে দুই ঘোড়াই একবার লাফিয়ে উঠে আরও জোরে ছুটে চলল, আর আমিও প্রাণে বেঁচে গেলাম।

রামেন্দ্রসুন্দরের চিৎকার : কী হল ? কী হল ?

ললিতবাবু, বিপিনবাবু আঁতকে উঠেই পরস্পরকে জাপটে ধরলেন। আর এদিকে আমি নানার পরিধিকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করতে না পারলেও চেপে ধরলাম।

বকর-ঈদ্ উপলক্ষ্যে গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে সময় খুব দাঙ্গা

মাথা-ফাটাফাটি চলছিল—তাই আমাদের মত নিরীহ যাত্রীদের উপরও এই নিষ্ঠুর আক্রমণ। সকলের পৈতৃক প্রাণ রক্ষা পেল বটে, কিন্তু উদ্বেগ গেল না। কী জানি, পথিমধ্যে আবার যদি কিছু নূতন বিভ্রাট হয়!

ভাগ্যে ল্যাণ্ডো গাড়িটা খোলা হয় নি—সেই ঢাকা গাড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ললিতবাবু দু ধারের দুটো নীল পর্দা টেনে নামিয়ে দিলেন যেন আমরা পরদানশীন জেনানার দল চলেছি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভীতিবিহ্বল চক্ষু দুটি এখনও আমার মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই আমাকে শিক্ষা দিতেন: ভয় করেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল, সাহসী হবে, ভয়কে জয় করতে শেখো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন সুন্দর সুযোগ কি আর জীবনে পাব? নির্বিকার ধীরেন্দ্রনারায়ণ ভীতি-বিহ্বল রামেন্দ্রসুন্দরকেই বরং সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যা হবার হবে, অত ভয় কিসের? তুমিই যখন-তখন আমাকে সাহসী হতে বল, আর তুমি কিনা নিজেই—

আর বলতে হল না, একটা ছোটখাটো তাড়া খেলাম।

সাহিত্য-পরিষদে পৌঁছেই আমাদের চক্ষু কপালে উঠে গেল। দেখলাম, দুর্গাদাস ত্রিবেদীর কপাল ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরিয়ে আসছে। শুনলাম, তিনি সাইকেলে আসবার সময় তাঁকেও লাঠি মেরেছে। সেই অবস্থায় তিনি কপালে এক হাত চেপে সজোরে সাইকেল চালিয়ে এখানে এসেছেন। দুর্গাদাস ত্রিবেদী প্রত্যহ প্রাতে গুনে গুনে এক শো ডন-বৈঠক দিতেন, দেহে শক্তিও ছিল অসীম। তাই এই গুরুতর আঘাত লাগলে তিনি এতটা পথ চলে আসতে সক্ষম হয়েছেন। দেখলাম, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত আর পরিষদের সামনে মার্বেল পাথরের মেঝে পর্যন্ত রক্তে লালে লাল।

ভ্রাতৃ-অন্ত প্রাণ রামেন্দ্রসুন্দরের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, তিনি ছোট ভাইকে রক্তাপ্লুত দেখে রীতিমত কাঁপতে লাগলেন। দুর্গাদাস ত্রিবেদীই তখন অগ্রজকে বরং সান্ত্বনা দেন: ও কিচ্ছু না বাবুদা, এখুনি ব্যাণ্ডেজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনও ভয় নেই।

এই অবস্থায় ওই ধরনের কথা যে বলতে পারে, তাঁকে নিশ্চয়ই বাহাদুর বলতে হবে। সেটা শুনে আমার এত ভাল লাগল যে তখুনি তাঁকে প্রণাম করে বসলাম।

এমন সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখুনি তাঁর গাড়িতে মেজো নানাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজে কাছেই কোথায় গিয়ে লেফটেনান্ট গভর্নর বেকার সাহেবকে ফোন করে সব অবস্থা বললেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম, শুনলাম ছোটলাট বলছেন—শুনে দুঃখিত হলাম। আমি

আর কী করতে পারি, পুলিসে বরং খবর দিন।—এই বলে তিনি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত হলেন।

তারপর যথারীতি পুলিসেও খবর দেওয়া হল। তারাও ভিড়ল না, বোধ হয় তলে তলে নিশ্চয়ই কলকাঠি নাড়া ছিল।

সেদিনকার মত পরিষদের মীটিং শিকেয় তোলা রইল, দু-চারজন ছাড়া কেউ সেদিন আসেন নি। ইতিমধ্যে দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহারাজের গাড়িতে ডাক্তারের বাড়ি থেকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরে এলেন। নেহাত যখন গরিষ্ঠ বলের সাহায্য পাওয়া গেল না, একটি কনিষ্ঠ বল অর্থাৎ কনস্টেবলের শরণ নেওয়া হল। তাকে শিখণ্ডীর মত কোচম্যানের পাশে বসিয়ে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌছলাম। দুর্গাদাস ত্রিবেদী তাঁর সাইকেল পরিষদে রেখে আমাদের সহযাত্রী হলেন। ললিতবাবু, বিপিন গুপ্তও আছেন। পথে আসবার সময় দুর্গাদাস আমায় জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ তখন আমায় প্রণাম করলি যে? এতটা ভক্তি উথলে উঠল কেন?

কারণ সবিশেষ বর্ণনা করেই রামেন্দ্রসুন্দরকে বললাম, যাই বল নানা, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন না করি কভু ভয়' এই আবৃত্তিটা আমার কাছে তুমি শুনতে চাও; কিন্তু কাজে মেজো নানাই সেটা আজ দেখিয়ে দিয়েছে, যা তুমিও পার নি।

রামেন্দ্রসুন্দর তখন সুস্থির হয়েছেন, সুপ্রসন্ন মন। আমার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন।

তাঁর সঙ্গে ললিতবাবু-বিপিনবাবুও সেই হাসির কোরাসে যোগ দিলেন। ললিতবাবু বললেন, এবার নাতি কিন্তু দাদুকে বেজায় হারিয়ে দিয়েছে, কী বলেন ত্রিবেদী মশায়?

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল।

সুরেন বাঁড়ুজ্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জের তখন খুব নামডাক—শক্তিচর্চা করে চেহারাখানাকে দেখবার মত করে তুলেছেন। কী বুকের ছাতি, কী গর্দানা! দেখা হলেই হাতের মাংসপেশী ফুলিয়ে দেখাতেন। শোনা গেল, ইনি নাকি অনেক গোরা ঠেঙিয়েছেন। বাঙালীদের মধ্যে এমন সচরাচর দেখা যায় না বলেই আমি ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম। তিনি প্রায়ই হাফশার্ট পরেই চলাফেরা করতেন।

রিপন কলেজে বহুবার তাঁকে দেখেছি, মাঝে মাঝে তিনি আমাদের বাড়িতেও

আসতেন। একদিন দেখি রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর হাতের মাংসপেশী টিপে ধরে পরীক্ষা করে দেখছেন, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন রামেন্দ্রসুন্দরের ডন-বৈঠক-করা অনুজ দুর্গাদাস। যেন নীরব ভাষায় বলতে চান, আমিও কম যাই না।

আর কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? দুর্গাদাস মনের কথাটি বলেই ফেললেন, তাহলে বাঙালী শুধু অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব নয়। সঙ্গে সঙ্গেই হাত বাড়িয়ে বললেন, আমারটাও একবার টিপে দেখুন বাবুদাদা।

রামেন্দ্রসুন্দর তখন দু হাতে দু জনের হাতের গুল টিপে দেখছেন, এমন সময় আমিও কচি হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে যেতেই রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি: রক্ষে কর, আমি ত্রিভুজ নই।

তারপরই সাফাই গেয়ে বললেন, এবারকার মত আমার ব্যায়ামচর্চা হল না বাঁড়ুজ্জে মশাই, তবে দুগ্‌গোদাস সেটা আমার হয়ে পুষিয়ে নিয়েছে। বাঙালীর ঘরে এইরকম একখানা শরীর দেখলে বড় আনন্দ হয়।

আমিও সুযোগ বুঝে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলাম: তবেই দেখ নানা, শরীর ভাল রাখতে গেলে, খেলা বন্ধ রাখা চলে না।

রিপন কলেজের নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন এসেছেন লেফটেনাণ্ট গভর্নর বেকার—নামও যেমন, কাজেও তেমনই। বেকার-সমস্যার সমাধান করুন আর নাই করুন, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে ইনি বেশ মজা দেখতেন—এ রকমের প্রবল জনশ্রুতি। তার একটা দৃষ্টান্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদীর মাথা ফাটার সময় আমরাও পেয়েছি।

নানা ধড়াচূড়া পরে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। আসবার সময় বললাম, যাত্রাদলের জুড়িদারের মত তোমার পোশাক হয়েছে, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। উত্তর পেলাম: 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ', আচার মেনেই মানুষকে চলতে হয়।

আমিও শেরওয়ানী ও প্যাণ্ট পরে নিয়েছি। নানার সঙ্গে প্রতি বছর কনভোকেশনে যাবার সময় বছরে একবার এই পোশাকটি আমায় পরতে হত। রিপন কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ আছেন, অন্যান্য কলেজেরও সব আচার্য অধ্যক্ষ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন।

বেকার সাহেব আসতেই সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসালেন। মাল্যদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানকার্য সুসম্পন্ন হল। দু-চারজন বক্তৃতা দিলেন। তারপর সুরেন্দ্রনাথ উঠে যেন ইংলিশ চ্যানেলে ঝড় বইয়ে দিলেন।

যেমন ইংরেজী উচ্চারণের ভঙ্গি তেমনিই ওজস্বিনী ভাষা। এক হাত কোমরের পিছনে দিয়ে আর এক হাত মুঠো করে রিপন কলেজের গোড়াপত্তন থেকে সেদিন পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ অনর্গল বলে গেলেন। মাঝে মাঝেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম শোনা যাচ্ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন, তার পূর্বে এই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। জ্ঞানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিমত্তায় প্রবীণ আচার্য কৃষ্ণকমলের সমকক্ষ তদানীন্তন যে কজন কৃতী বঙ্গসন্তান বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা সে যুগে নিতান্ত বিরল ছিল। সেই তিনিই রিপন কলেজ হতে অবসর নিয়ে চলে যাওয়ার কয়েক বছর পরে, সেই কলেজের জনৈক অধ্যাপক পূজনীয় পণ্ডিত কৃষ্ণকমলের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মুখে রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যক্ষতায় রিপন কলেজের বহুবিধ উন্নতির কথা শুনে কৃষ্ণকমল মন্তব্য করেছিলেন, এখন কলেজ ভাল হবে না কেন? পূর্বে এটা খোলাঝাড়া ভটচার্যির অধীনে ছিল। এখন রামেন্দ্রসুন্দর হচ্ছেন তিন তিন যুগের কবিদের নায়ক—বাল্মীকির রাম, বেদের ইন্দ্র ও কলির ভারতচন্দ্রের সুন্দর—আর, তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার কি কখনও তুলনা হয়!

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হল, হাততালিও পড়ল, তার পর তিনি বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে তালিকা অনুযায়ী একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ বলেই বুঝি প্রথমে নানার ডাক পড়ল। তিনি উঠে এসে মাথা সোজা করে ছোটলাটের সামনে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন, সে সময়ে অবনমিত মস্তক তাঁর দেখি নি। সমান্তরাল রেখায় মাথাটা তুলে উঠল বটে, কিন্তু মোটেই নিম্নমুখী হয় নি, সেটা লক্ষ্য করলাম। আর সবাই মাথা নুইয়ে 'শেকহ্যাণ্ড' করলেন। তার পর বেকার রাজকীয় কায়দায় উঠে এসে একটি ঝকঝকে চাঁদির কর্ণিক দিয়ে পাশের সিমেণ্ট উঠিয়ে ভিত্তিস্থাপন করলেন।

হাসি এল, চাঁদির কর্ণিক দিয়ে কি ইমারত গাঁথা যায়? হয়তো এখানে জাঁকজমকটাই বড় কথা। নকল কর্ণিক দিয়েই আজ বাণীর দেউল গাঁথা হল! কিন্তু এর শিক্ষায় জীবনের সত্যিকার ইমারত গড়ে উঠবে কি না কে জানে? নকল দিয়ে যার আরম্ভ, নকলেই কি তার পরিণতি হবে? আমি সুরেন বাড়ুজ্জের পাশেই ছিলাম—ফুটফুটে ছেলে দেখেই বেকার সাহেব দু পা এগিয়ে এসে আমার কথা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। পরিচয় শুনেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নাতি দাদুর চেয়ে এককাঠি সরেস। তিনি বড়, আমি মাথায় ছোট। তাই উর্ধ্বাভিমুখী হয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম। নানার দেখাদেখি মাথা নীচু করি নি। তিনি আমার চোখে দু-চার সেকেণ্ড নীলচক্ষু স্থাপন করে সহাস্তে এক-একটি প্রশ্ন করে যান—কী পড় ? বয়স কত ? কোন্ খেলা তোমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? ইত্যাদি। আমিও যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে যাই। শেষে প্রশ্ন করলেন, তোমার গান ভাল লাগে ?

এত জড়িত ভাষায় ইংরেজী বললেন যে, প্রথমটা বুঝতেই পারি নি। সুরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাতেই তিনি ইংরেজীতেই স্পষ্ট করে কথাটা বললেন।

উত্তর দিলাম, ও, ভেরি মাচ—ডি. এল. রয়'স ন্যাশনাল সংগ্—'বঙ্গ আমার জননী আমার'—

আবার সেই একজোড়া নীলচক্ষুর তীব্র দৃষ্টি। তারপরই গম্ভীর হয়ে বললেন, আই সী।

বাস্, এইখানেই আলাপন শেষ—সপারিষদ লাটসাহেবকে সুরেন্দ্রনাথ গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন।

আবার একজোড়া নীলচক্ষুর পাল্লায় পড়লাম—তিনি রামেন্দ্রসুন্দর। আমার কাছে এসেই—কী কী কথা হল জানতে চাইলেন। আমিও সব পুনরুক্তি করে গেলাম। নানার মুখে হিন্দীবাত্ শোনা গেল। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বহুৎ আচ্ছা"।

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ফিরে এসে আমার তারিফ করে বললেন, ওয়েল সেড মাই বয়—ভেরি নাইস রিপ্লাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি বুঝি বাহান্ন ইঞ্চি হয়ে গেল। ফেরবার পথেই তাঁর আনন্দের মাত্রাটা টের পেয়েছিলাম। আমার জন্যে একেবারে আধ সের গরম জিলিপি কিনে বসলেন—শুধু তাই নয়, পথেঘাটে খাওয়া রামেন্দ্রসুন্দর পছন্দ করতেন না—তবুও আমি যখন গাড়িতে বসেই দু-একখানা জিলিপি মুখে ফেলছি, সেদিন কিন্তু আপত্তির নামগন্ধ নেই—মাত্র একবার বললেন, দেখো, জামায় রস লাগে না যেন।

আর একটি স্মরণীয় দিনের কথা মনে আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন—ইনিও রিপন কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। তখন রাত্রি আটটা, হঠাৎ রামেন্দ্রসুন্দর মাস্টার মশাইকে ডেকে পাঠালেন। যতই জরুরী

কাজ থাক্ না কেন, আমাকে পড়াবার সময় কখনই কোনও শিক্ষককে তিনি ডেকে পাঠাতেন না, আজ চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে আমি ও মাস্টার মহাশয় দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। গঙ্গাধরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে নানার কাছে গেলেন। আমিও তাঁর অনুবর্তী হলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর তাকিয়া বুকে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছিলেন। গঙ্গাধরবাবু আসতে উঠে বসেই বললেন, রবিবাবুর পঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁকে টাউন হলে অভিনন্দিত করা হবে—সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর একটা অভিনন্দন লিখেছি, কেমন হয়েছে একবার শুনুন।

তিনি আবেগ দিয়ে সদ্য-রচিত অভিনন্দনের খসড়াটি একটানা আদ্যন্ত পড়ে গেলেন। সেটা পাঠ করেই গঙ্গাধরবাবুর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন।

কেমন লাগল ? আপনার যদি কিছু বলবার থাকে বলুন।

মাস্টার মশাই স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে তাঁর আবেগভরা রচনাটি শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁকে কোন কথাই বলতে শুনলাম না। শুধু একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল ঃ খুব সুন্দর।

সলজ্জ হাসিতে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, আমি কিন্তু একটা ভাবনায় পড়েছি—

তাঁর অসমাপ্ত কথা মুখেই থেকে গেল। রামেন্দ্রসুন্দরের পাঠের ভঙ্গি, ভাষার গাম্ভীর্যে আমার অন্তরেও কেমন যেন ছোঁওয়া লেগেছিল। আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, কী সুন্দর তুমি লেখ নানা! দাও, তোমার হাতে একটা চুমু খাই।

নানা একবার আমার দিকে চেয়ে তাঁর সেই ভাবনার কথাটি গঙ্গাধরবাবুকে বললেন ঃ দেখুন, এখানে এক জায়গায় লিখেছি, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে কালিদাসের পশ্চাতে বসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ—এটা ঠিক হবে কি না ? প্রথম কথা, রবিবাবুকে কালিদাসের পশ্চাতে বসানো—কথাটিতে তাঁর কোনও অমর্যাদা হবে কি না! তা যদি হয়, তা হলে "সমপর্যায়ে আসীন হইয়াও" যদি লেখা যায়—সেটাও আবার উচিত হবে কি না!

ভাল করেই বুঝলাম, রামেন্দ্রসুন্দর রবিবাবুকে এত প্রগাঢ় ভক্তি করতেন যে তাঁকে পশ্চাতে না সম্মুখে, পার্শ্বে কিংবা সমপর্যায়ে বসাবেন, সেটাই তাঁর চিন্তার প্রধান কারণ। মনের বিচিত্র গতি! কখন সে যে কোন্ তারে ঘা দিয়ে বসে, বলা যায় না!

গঙ্গাধরবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে—মাস্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন,

আর একটি কথাও হয়তো ভেবে দেখা উচিত—শুধু কবি কালিদাস নয়, বাল্মীকি, ভবভূতি প্রভৃতি আরও তো অন্যান্য কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর গঙ্গাধরবাবুর কথা শুনে বললেন, তাও তো বটে, আবার ওই স্থানটা তিনি পড়তে শুরু করলেন।

"কিউ"-এর পরে "ইউ" যেমন থাকেই, আমিও তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের পাশে—

আর চুপ করে থাকতে পারলাম না—নানার কাছ ঘেঁষে ফস্ করে বলে বসলাম—হয়তো ভগবানই আমার মুখ দিয়ে কথাটি বের করে দিলেন।

কোথায় বসাবে, মাথায় না বুকে, আগে কিংবা পেছনে এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? লিখে দাও না, তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ।

হঠাৎ আমাকে বুকে জাপটে ধরেই রামেন্দ্রসুন্দর আমার পিঠে ব্যাণ্ড বাদ্য শুরু করে দিলেন। গুম গুম শব্দ একটানা চলতে থাকে। আজ রামেন্দ্রসুন্দরের আনন্দের মাত্রাটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, ওদিকে আমার মাস্টার মশাইয়ের এক জোড়া দীর্ঘ গোঁফের আড়ালে হাসি যেন আত্মপ্রকাশ করেও সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে চায় না।

তিনি বললেন, এটা মন্দ হবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর "কালিদাসের পশ্চাতে বসিয়াও" কথাটি তখুনি কেটে দিয়ে "তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও" কথাগুলি বসিয়ে দিলেন।

সেই দিনই আমি তাঁর কাছে জাতে উঠলাম কি না কে জানে! আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের পার্শিবাগানের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন। পরদিন প্রাতে বেলা নটার সময় সারদাচরণ মিত্র তাঁদেরও সঙ্গে তুলে এনেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর গত রাত্রির সেই লেখার পাণ্ডুলিপি তাঁদের সবাইকে পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। পাঠান্তে আমার কথাটি যে তিনি বসিয়েছেন, সেটাও হয়তো তাঁদের বলেছিলেন। হঠাৎ আমার ডাক পড়ল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমার পিঠে একটা থাবা দিয়ে বললেন, কী হে ছোকরা, তুমি নাকি ত্রিবেদী মশাইয়ের লেখার উপরেও হাত চালিয়েছ?

লজ্জায় মিশে গেলাম। তাঁরা সব চলে যাবার পর নানাকে বললাম, একটা কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, আর তুমি কিনা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছ! আচ্ছা লোক যা হোক!

আজ রামেন্দ্রসুন্দরের মেজাজ সুপ্রসন্ন, তিনি আমার ঘাড় ধরে বললেন, এত বুড়োপনা শিখলে কোথায় ?

আবার কোথায় ? এই তোমার মত অকালবৃদ্ধের কাছ থেকেই আমার অকালপরিপক্কতা।

রামেন্দ্রসুন্দর হো-হো শব্দে হেসে উঠেই বললেন, রবিবাবুর এই জন্মোৎসবে তোমায় নিয়ে যাব।

সেটা না বললেও চলে, আর কী সব দেখলাম সেটাও আবার লিখে তোমায় দেখাতে হবে, এই তো ? তার চেয়ে বললে না কেন, আমার যা মনে লাগে, তাই লিখে নিয়ে সেদিন আমিও পড়ব। তার আগে আমার হিজিবিজি লেখা দেখে-শুনে ঠিক করে দিয়ো, কী বল ?

রামেন্দ্রসুন্দর আমার মাথার একরাশ চুল ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ! সেটা আরও কিছুদিন পরে। যাও, এখন পড়তে বোস গে। যা লিখতে বলেছি, লিখে নিয়ে এস।

সদ্য সন্তোষের কাছে শেখা একটি ছড়া নানাকে শুনিয়ে দিয়ে পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লাম—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি চাপা পড়ে সেই।

নানার নির্দেশে "বাঙালীর বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখে তাঁর ঘরে ঢুকতেই দেখি, একটি ছিপছিপে গড়নের অল্পবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। ইনি প্রায়ই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আসতেন, নাম বিনয়কুমার সরকার—হাতে এক গাদা বই। তিনি এলেই নানা তাঁকে দেখিয়ে আমায় বলতেন—এঁকে দেখে রাখ। এই একজন—যিনি তেরো বছর বয়সে এনট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছেন, পনরো বছরে আই. এ., সতরো বছরে বি. এ.তে ফার্স্ট। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন।

নানার হাতে লেখাটি দিতেই তিনি আমাকেই সেটা পড়তে বললেন। বাঙালীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার জানা ছিল—বৌদ্ধযুগের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে বাঙালী বীর বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়, এ যুগের প্রথম বাঙালী যিনি বিলেত গিয়ে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেই রাজা রামমোহন, প্রথম

বাঙালী যিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি—সেই ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এমন কি প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাউকেই বাদ দিই নি। মোহনবাগানের জয়লাভের কথা টাটকা মনে ছিল, সাহেবদের খেলায় তাদেরই হারিয়ে দেওয়া কি কম কৃতিত্বের পরিচয়! বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রথম বোমা তৈরি করেছিল তারাও এই বাঙালী—দৃপ্তকণ্ঠে সমস্তটা পড়ে গেলাম।

এক ফাঁকে চেয়ে দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে যেন একটা খুশির আলো ছল্‌কে উঠছে। পড়া শেষ হতেই বিনয়কুমার সরকার তাঁর ঝোলার মধ্যে থেকে খানকয়েক চটি বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ লিখেছ, আমার এই বইগুলো পোড়, বুঝলে?

এর পর যখনই বিনয়কুমার সরকার আমাদের বাড়িতে আসতেন, নানা তাঁর কথামত আমাকে ডেকে পাঠাতেন।

কিছুদিন পরেই টাউন হলে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা। সে কী উত্তেজনা, কী বিপুল উৎসাহ! জনগণের মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের তো কথাই নেই।

টাউন হলে ন স্থানং তিলধারণং। গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ এসে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে এগিয়ে দিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই আমাকে বসালেন। সেই সভায় যোগদানকারী অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। যে কিশোর সেদিন তাঁর অদূরে বসে ছিল, সে আমি।

অনেকে লিখিত বক্তৃতা, কেউ বা কবিতা পাঠ করলেন। পরিষদের পক্ষ হতে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর পুরাকালের তালপাতার পুঁথির মত দেখতে লাল অক্ষরে খোদাই করা হাতীর দাঁতের পুঁথি খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন। তাঁর সমস্ত প্রাণ, জীবনের সমস্ত আবেগ আজ যেন তাঁর কণ্ঠে খেলা করে যায়।

তারপর উঠলেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী চমৎকার বক্তৃতা দিলেন! ভাষাও যেমন সুন্দর, কণ্ঠেও ছিল এক মধুর সঙ্গীত। এত ভাল লাগছিল তাঁর ভাষণ যে, আমি তন্ময় হয়ে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাঁর দিকে চাইছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন সমস্ত টাউন হলকে মাতিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ সুললিত ভাষায় তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব কণ্ঠে সমবেত নরনারীদের চিত্ত অভিষিক্ত করে দিলেন—কী সুন্দর ভাষার গাঁথনি দিয়ে মর্মস্পর্শী ভাবের সংমিশ্রণে শুরু হল তাঁর আবেগ-কম্পিত উচ্ছল ভাষণ! সুরের কাঁপনে যেন আজ সবাইকে মাতাল করে তুলেছে। সেদিনের কথা জীবনে ভোলবার নয়। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই জানেন, কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেমে এসে সবাইকে যেন মুগ্ধ করে দিয়ে গেল, প্রাণে কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সবাইকে জাগিয়ে তুলল।

সমস্ত হল-ঘর গমগম করছে, অনুষ্ঠানের কার্যগুলি একে একে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর আজ অনেক পরিচিত জ্ঞানী-গুণীকে একসঙ্গে পেয়েছেন। বেরিয়ে আসবার পথে এখানে-সেখানে তাঁর স্টেশন, এঁর-ওঁর সঙ্গে কথা বলেন; দু পা এগিয়ে যান আবার থামেন। সভা ভঙ্গ হলেও জের কাটতে চায় না। এই ভাবে টাউন হল থেকে বেরিয়ে আসতে নানার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

আসবার পথে নানার কাছে এক কপি ছাপানো অভিনন্দন-পত্র চেয়ে নিয়ে নানার পঠনভঙ্গির হুবহু রেকর্ড বাজিয়ে দিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর উচ্ছল হাস্যে বললেন, বাঃ, তা হলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেই তো বেশ হত!

বাড়ি ফিরে এসেই শুনলাম, মণীন্দ্রগোপাল, ওরফে দুম্বা, একটা কুকাণ্ড করে ফেলেছে। সে কী একটা দোষ করায় নিবারণ পণ্ডিত তাকে ঠেসে কান মলে দিয়েছেন, তাই শীতকালে পণ্ডিত মশাইকে জব্দ করার জন্যে তাঁর একমাত্র কাঁথায় জল ঢেলে ভিজিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রে পণ্ডিত মশাই শুতে পারেন নি, শীতের হাওয়া তাঁর হাড়ে নাকি ছুরি বসিয়ে দিয়েছে, একটা অর্ধমলিন চাদর গায়ে গোটা রাত ঠক ঠক করে কেঁপেছেন।

নানা উপরে চলে যেতেই, পণ্ডিত মশাইয়ের শাণিতকণ্ঠ শোনা গেল—তাঁর আওয়াজটা যেন সুরে বলছে না। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঢুকেই এই অঘটনের কথা শুনলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা হয়েছে কাল, এসব কই নানার কানে তো এখনও ওঠে নি? চিল-চিৎকারে পণ্ডিত মশাই বললেন, আজ রবিবাবুর ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই বলা হয় নি, এবার বলব।

আজকাল নানার সমর্থন পেয়ে আমার সাহস কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। আমি পণ্ডিত মশাইয়ের পা ধরে তুম্বার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, নানাকে জানিয়ে দরকার নেই, তিনি শুনলে ওকে আর আস্ত রাখবেন না। আমিই এর বিহিত করে দিচ্ছি।

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে হাঁক দিলাম, এই তুম্বা!

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল : যাই ধীরেনদা।

সামনে যখন সে এল, দেখলাম তার চোখে মুখে অপরাধীর লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

তুমি পণ্ডিত মশাইয়ের কাঁথায় জল ঢেলেছ কেন? উত্তর দাও।

তুম্বা নির্বাক, অচল, অটল।

ইদানীং আমারও ভাষাটা কিঞ্চিৎ ভারী হয়ে উঠেছিল, বললাম, মানুষ হয়ে জন্মেছ, বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা সবই থাকা উচিত, তারপর কিনা পণ্ডিত মশাই—যিনি গুরু তাঁর কাঁথায় জল ঢেলে বীরত্ব দেখানো! পশুরা যখন যা খুশী তাই করে, তা হলে তোমাতে আর পশুতে তফাত কী? চুপ করে থাকলে চলবে না, তোমায় বলতে হবে কেন জল ঢেলেছ?

তুম্বার চোখ দুটো বার কয়েক মিটিমিটি করেই স্থির হয়ে গেল। আমারও মেজাজ তখন সপ্তমে, ছুটে গিয়ে তুম্বার বগল ধরে হিঁচড়ে টেনে এনে পণ্ডিত মশাইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে আদেশ করলাম, পা ধরে ক্ষমা চাও।

তবুও তুম্বার মাথা নীচু হতে চায় না। গালে ঠাস করে একটা ওজনসই চড় মেরে বললাম, এখুনি পা ধর্, নইলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন! বিচারপর্ব প্রত্যক্ষ করে পণ্ডিত মশাইয়ের ভাবান্তর ঘটে গেল, কণ্ঠস্বর দ্রবীভূত: আহা বেচারীকে ছেড়ে দাও।

না পণ্ডিত মশাই, আপনার পা ধরে ক্ষমা না চাইলে ওকে আজ কিছুতেই ছাড়ব না।

আমার বিচারকের ভূমিকা এইখানেই শেষ। পশ্চাতে রামেন্দ্রসুন্দরের হুঙ্কার শোনা গেল—তিনি আমার চিৎকার শুনে কখন যে নেমে এসেছেন, জানতে পারি নি।

সব শুনেছি, তুম্বা যা করেছে। সেটা আবার আমাকে নালিশ করতে হবে কেন, পণ্ডিত মশাই? আপনি নিজেই দশ-বিশ ঘা পিঠে বসিয়ে দিলেন না কেন?

রামেন্দ্রসুন্দর জ্বলে উঠলেন, আর কোনও কথাটি না বলে তিনি পায়ের বিদ্যাসাগরী

চটি খুলে ডুম্বার দিকে তেড়ে আসতেই বাধা দিয়ে করযোড়ে নানাকে মিনতি করে বললাম, আমি বড় ভাই, আমিই শাসন করে দিচ্ছি, দয়া করে আজ তুমি ওকে কিছু বোল না।

কী জানি কেন, সেদিন আমার কথায় তিনি নিরস্ত হলেন। ওই ঘরের একটি মাত্র বেরিয়ে যাবার পথ আগলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

ডুম্বার দিকে ফিরে একটা বিরাট ঘুঁষি পাকিয়ে বললাম, কি রে, বেহায়ার মত এখনও দাঁড়িয়ে? যা বললাম শুনবি কি না? নইলে—

ডুম্বা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেই তখুনি পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে আছড়ে পড়ল আর কাটা কাটা স্বরে হাঁপিয়ে বলতে থাকে, ক্ষ-ক্ষমা করুন, আ-আর কক্ষনো ক-করব না, প-পন ম-ম-মশাই-ই! এই না-নাক কা-কান ম-মলছি, ই-ই-উঁ-উঁ-উঁ।

ওদিকে পণ্ডিত মশাইও ডুম্বার সঙ্গে তাল দিয়ে ফ্যাঁচ করে কেঁদে উঠলেন, তার সঙ্গে স্কন্ধবিলম্বিত গামছা দিয়ে ঘন ঘন নাসিকা মর্দন।

রামেন্দ্রসুন্দর আর দাঁড়ালেন না। আমার বিচার-মাহাত্ম্যে আসামী ও ফরিয়াদীর এই অপূর্ব মিলন সন্দর্শন করে হৃষ্টচিত্তে তিনি উপরে উঠে গেলেন।

পণ্ডিত মশাই তাড়াতাড়ি ডুম্বাকে দু হাত দিয়ে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের এক কোণে সযত্ন-রক্ষিত বাবা বৈদ্যনাথের পেঁড়া বের করে ডুম্বার হাতে দিয়ে বললেন, নে, এটা খেয়ে নে, আর কাঁদে না।

আমি বললাম, বাঃ, বেশ তো মজার শাস্তি। এ রকম হলে সে তো রোজই এমনটা করবে, তার ওপর ও যা দারুণ পেটুক!

ইতিমধ্যে ডুম্বার চোখে মুখে রৌদ্রকিরণ দেখা দিয়েছে, সে তখন মিষ্টান্নের রসাস্বাদনে মত্ত।

গালভর্তি পেঁড়া মুখে নিয়েই তার অর্ধোচ্চারিত শব্দ শোনা গেল, আর কক্ষনো করব না ধীরেনদা, কক্ষনো না!

দেখলাম রামেন্দ্রসুন্দর ইন্দুপ্রভার দরবারে আরজি পেশ করে নিবারণ পণ্ডিতের জন্যে একটা লেপ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ হর্ষোৎফুল্ল। কৃষ্ণ যবনিকা সরে গিয়ে উজ্জ্বল দৃশ্যের অবতারণা। দু হাত বাড়িয়ে লেপটি বগলদাবা করেই গদগদ ভাষ: আমার ছেঁড়া কাঁথাটা ভিজিয়ে দিয়ে ভালই করেছিস ডুম্বা, বড্ড শীত আজ, গায়ে দিয়ে বাঁচব। যা, এখন তোরা যা।

হাত বাড়িয়ে বললাম, যাচ্ছি, তবে আমার পাওনাটার কী হল ?

পণ্ডিত মশাই যেন আঁতকে উঠলেন, গোল গোল ক্ষুদ্র চোখ দুটি বেরিয়ে আসে আর কি : তোর আবার পাওনা কিরে ?

কেন, আমাকেও একটা পেঁড়া দিতে হয়।

ও, এই নে, যা এবার যা।

উপরে নানার কাছে এসেই দেখি, এক ভদ্রলোক এসেছেন। বেশ গৌরবর্ণ, কটা চোখ, এক জোড়া লালচে রঙের গোঁফ, সামনে একটা নাতিবৃহৎ টিনের চোঙা। শুনলাম তিনি ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। সামনের বস্তুটির নাম ইকমিক-কুকার, নানাকে দিতে এসেছেন।

তারাপ্রসন্ন ভাল করে বুঝে নিচ্ছেন, কী প্রক্রিয়ায় কী কী তৈরী করা যায়, মাংস নাকি ভাল রান্না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কখনও ভোজন-বিলাসী ছিলেন না, নানীর কৃপায় খাবার সময় দুটি খেতে পেলেই তিনি নিশ্চিন্ত, তার বেশী কিছু আকাঙ্ক্ষাও ছিল না ; আজ এটা খাব, কাল ওটা খাব, অমুক জিনিস রান্না হল না কেন ? এ ধরনের কথা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি। এ জন্যে নানী প্রায়ই আক্ষেপ করে রামেন্দ্রসুন্দরকে বলতেন, আমার বড় সাধ থেকে গেল যে ফরমাশ দিয়ে কখনও তুমি কিছু খেতে চাইলে না। নানী প্রায়ই নানার ধ্যানভঙ্গ করিয়ে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করতেন, আর নানার উত্তর শুনতাম, যা খুশী কর, আমার কিচ্ছু বলার নেই।

যখন ভাবি, তখনই মনে হয়, কোন্ জগতের মানুষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর !

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুপ্রভা ফস্ করে রামেন্দ্রসুন্দরকে বলে বসলেন, আচ্ছা, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী শাড়ি গয়না কত কী পেয়ে থাকে, কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত একটা গয়নাও তুমি দিলে না। অথচ, মাস মাস একগাদা পুথি-পত্তর কিনতে তো পয়সার অভাব হয় না দেখি।

রামেন্দ্রসুন্দরের চমক ভাঙল, কেতাব বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে ইন্দুপ্রভার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ; সমস্ত মুখখানা ঘিরে কী এক কুণ্ঠিত কাতরতা ! যেন একরাশ চিন্তার জালে আটকা পড়ে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী মুখ টিপে হাসলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে সমস্ত দুর্ভাবনার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন, না গো না, অত চিন্তার কোনও কারণ নেই, একটু ঠাট্টা করে দেখছিলাম, কী বল !

তা হলে একটা কাজ কর, আমার অলঙ্কার বিক্রি করে তোমার গয়না গড়িয়ে নাও।

ইন্দুপ্রভার ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন : কী রকম ?

আমার এক আলমারি বই বেচে দিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ও, রসিকতা হচ্ছে।

নানা ও নানী দুজনেই হেসে উঠলেন।

সেই একবার দু জনকে কোরাসে হাসতে দেখলাম।

দু-একদিন পরেই আর একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেল। নিবারণ পণ্ডিত দুর্দান্ত শীতেও দিন-দুপুরে নগ্ন গাত্রে থাকতেন, কাঁধে তাঁর চিরন্তন নস্যি-মোছা অর্ধমলিন গামছাটি হামেশাই পড়ে থাকত। তিনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট মেজাজের লোক ছিলেন।

পণ্ডিত মশাই তক্তপোশে বসে আপন মনেই থেলো হুঁকোয় সুখটান দিচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর রসভঙ্গ করে একটা টেনিস বল জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সোজা ঢুকে কলকে উড়িয়ে দিলে, ফলে জ্বলন্ত টিকে তাঁর গায়ে পড়ায় তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আর কিছুটা বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল।

আর যাবে কোথায় !

পণ্ডিত মশাই একেবারে অগ্নিশর্মা, জবাকুসুমসঙ্কাশং আরক্ত লোচন, ফাটল-ধরা বাঁশের বাঁশীর উঁচু পর্দায় তাঁর সুর বেজে উঠল : কে করেছিস বল্ ? চাঁটিয়ে ঠিক করে দেব।

আমি সুনীল সন্তোষ দুম্বা ও ঘি বল নিয়ে এর ওর হাতে লোফালুফি করছিলাম। পাশেই তাঁর ঘর। সন্তোষের হাত ফসকে বলটা সজোরে এসে তাঁর সদ্য সাজা কলকের ওপর পড়েছিল। এটা নিশ্চয়ই কারও ইচ্ছাকৃত নয়। পণ্ডিত মশাই ভাবলেন, কেউ দুষ্টুমি করেই এমনটা করেছে। সন্তোষ এগিয়ে এসে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ক্ষমা চাইল, পণ্ডিত মশাই বেরিয়ে এসে তার কান ধরে দু-তিনবার ঝাঁকুনি দিয়েই তাকে বের করে দিলেন : যা নির্বংশের ব্যাটা, অনড্বান কোথাকার !

পণ্ডিত মশাই চটিতং হলেই এই দুটি মোক্ষম গাল দিতেন। অনড্বান কথাটি শব্দরূপে পড়েছি, কিন্তু 'নির্বংশের ব্যাটা' কী বস্তু ? যার বংশ নেই তার আবার ব্যাটা কোত্থেকে এল ? পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে একদিন মানে জানতে চাইলাম।

তিনি আরও জ্বলে উঠলেন। অগত্যা নানার শরণাপন্ন হতেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুত্র যদি উপযুক্ত না হয়, ছেলে থাকাও যা, নির্বংশ হওয়াও তাই।

সন্তোষ চোখ-মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই আবার আপন ঘরে ঢুকে চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া টিকের আগুন নিভিয়ে দিতে বসলেন।

দু-চারদিন কেটে গিয়েছে, সন্তোষের কোনও সাড়াশব্দ নেই, হয়তো পণ্ডিত মশাই এসব ভুলেই গিয়েছেন। একদিন অদূরে বাথরুম থেকে এসেই দেখলেন, বড় বড় অক্ষরে চক-পেন্সিলে তাঁর দরজায় লেখা আছে—"ওরে পণ্ডিত, উল্‌টো করে পড়ে দেখ তিব্বতের রাজধানী। তুমি তাই, তুমি তাই গো!" পাশেই আঁকা শিংওয়ালা গরুর মুখ।

সেকেলে পণ্ডিত মশাই, ভূগোলেই যত গোল ছিল। অর্থটা মালুম না হওয়ায় সোজা উঠে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে কথাটি উচ্চারণ করে তাৎপর্য জানতে চাইলেন।

আবার কী হল আপনার?

আমার দরজায় কে এই কথাটা লিখে রেখেছে একবার দেখবেন চলুন।

আমিও তাঁর কাছেই ছিলাম। পণ্ডিত মশাই, রামেন্দ্রসুন্দর আর আমি, চটির ফটফট শব্দে নীচে নেমে এলাম।

নানার চক্ষু স্থির! তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও বুঝি এই উদ্ভাবনী শক্তির কাছে হার মেনে যায়। কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হতেই একটা অদম্য হাসির মুখে পাথর চাপা দিয়ে চিন্তিত স্বরে আমি প্রশ্ন করলাম, লেখাটি কার?

তখুনি দুম্বা ও ঘিয়ের ডাক পড়ল।

নানা অঙ্গুলি নির্দেশে লেখাটি দেখিয়ে মাথা নাড়তে শুরু করলেন। এক লহমায় পণ্ডিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবার ভাব-বিশ্লেষণ শুরু করি: তিব্বতের রাজধানী লাসা—তার উলটো হচ্ছে—

পণ্ডিত মশাইয়ের আর্তস্বর শোনা গেল: অ্যাঁ, তবে কি শালা!

এতক্ষণে তাঁর যথার্থ অর্থটি উপলব্ধি হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের গম্ভীর বয়ান—বিস্ফারিত চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি; আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কে লিখেছে জান?

আমি একবার দুম্বা ও ঘিয়ের দিকে তাকিয়ে অকপটে উত্তর দিলাম, আমি কিচ্ছু জানি না।

ঘি আর দুম্বা যেন আকাশ থেকে পড়ল। রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস হল—আমরা

কেউ এর মধ্যে জড়িত নেই। নিবারণ পণ্ডিতের তীব্র মিহি স্বরের আওয়াজ স্তব্ধ মধ্যাহ্নকে কেটে যেন দু টুকরো করে ফেলতে চায়: অ্যাঁ, এই ছ্যান কত্তে গেছি, এরই ফাঁকে কে এমন লিখলে?

কোথেকে একটা ঝাড়ন নিয়ে এসে জলে ভিজিয়ে নানা নিজের হাতেই লেখাটা রগড়ে ভাল করে মুছে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। পণ্ডিত মশাইয়ের মনের দাগ মুছল কিনা জানি না—কিন্তু আমার মনে একটা দাগ থেকে গেল, কে এমন সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিলে! যিনিই হোন তাঁর ফাইন আর্টসের কেরামতি আছে বলতে হবে। ইনভার্টেড কমার মধ্যে "তুমি তাই, তুমি তাই গো"—বড় অক্ষরে "গো" লিখে তার নীচে দাগ দেওয়া—তার উপরেও কিনা আবার ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে। ওই বিশ্রী গাল দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। আবার গরুও বলা হয়েছে! এই "গো"র শব্দরূপ পণ্ডিত মশাইকে বিশদভাবে ব্যাখা করে বুঝিয়ে বলতেই তিনি আরও খাপ্পা হয়ে তাঁর ছোট্ট ঘরে দ্রুত পাদচারণা শুরু করে দিলেন। অনতিকাল পরেই যৎকিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বপাক-শুদ্ধ-সিদ্ধ-পক্কের হাঁড়িটা থালায় উল্‌টে যথাবিহিত আচমনের পর ভোজনে বসে গেলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম—লেখাটি তবে কার? হস্তাক্ষর অপরিচিত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সন্তোষকে পণ্ডিত মশাই কান ধরে তাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সে এই কাণ্ডটা করেছে নাকি! তার হাতের লেখাও তো আমার অচেনা নয়। তবে কি সুনীল? না অসম্ভব—সে ও ধরনের ছেলেই নয়।

মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম, লোকটাকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। অনেক চিন্তা করেও কোন হদিশ পেলাম না। অস্বস্তি বেড়েই গেল। সুনীল রোজ বিকেলে খেলতে আসে—সন্তোষকে পণ্ডিত মশাই তাড়িয়ে দেবার পর আর সে আমাদের বাড়িমুখো হয় না। আমার বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি না থাকলেও একদিন তাকে গিয়ে ধরে আনলাম। কথায় কথায় পণ্ডিত মশাইয়ের দরজায় ওই সব লেখার কথা বলতে সে ঠোঁট উল্‌টে বলল, আমিই তো আমার এক বন্ধুকে দিয়ে ওই সব লিখিয়েছি, তার হাতের লেখা কেউ চিনবেও না—আর আমিও ধরা পড়ব না।

সন্তোষের ওই বেপরোয়া আচরণে আমি দুঃখ পেলাম। তাকে যতই বুঝিয়ে বলি, বাপ-মা, গুরুজন, শিক্ষককে অসম্মান করলে নিজেকেই অপমান করা হয়। ততই সে চটে ওঠে, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না, এবং উল্‌টে সে জোর গলায় বলল, বেশ করেছি, আরও করব।

বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল, তা হলে তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই, খেলাধুলো করা দূরে থাক্, আর কথাও কইব না।

সন্তোষ আরও চটে গেল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, তা হলে আমার তো ভারি বয়েই গেল। যা, তোর বাড়িতে আর আমি কক্ষনো আসব না।

সন্তোষ চটেমটে হনহন করে বেরিয়ে গেল—তবু চেঁচিয়ে বললাম, তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম, শুনিস ভালই, নইলে শেষে নিজেই পস্তাবি।

মুখ ঘুরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সে উত্তর দিল, আরে যা যা, তোর মত ঢের ঢের লেকচার আমার শোনা আছে। ইস্কুলের মাস্টারকেই থোড়াই কেয়ার করি, হুঁ!

কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার আমাকে শাসিয়ে গেলঃ দেখে নেব তোকে আর তোর ওই হাড়গিলে পণ্ডিতকে, তবেই আমার নাম সন্তোষচন্দর—ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও দুষ্টুমি করলেও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতাম। তিনি আমার বাবাকে শিশুকাল থেকে পড়িয়েছিলেন—হাতেখড়িও দিয়েছিলেন। আমারও হাতেখড়ি তাঁরই কাছে। এখন তিনি আমাকে বাংলা সংস্কৃত পড়ান। তাঁর সম্বন্ধে এই হীন উচ্চারণ শুনে সটান উপরে উঠে নানাকে সব কথা খুলে বলেই পরিচ্ছেদের শেষ টানলামঃ আজ থেকে সন্তোষের সঙ্গে জীবনের মত বাক্যালাপ বন্ধ।

রামেন্দ্রসুন্দর বন্ধুবিচ্ছেদের কাহিনী শুনে ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, যাক বাঁচা গেল। ওই সব ছেলেদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না।

সেদিনই রামেন্দ্রসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা মাসী কলকাতায় এসেছেন। ঘিয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছ মাস পরে হবে, তাই কিছুদিন কলকাতায় থাকবেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্বামী—শ্রীসৌরীন্দ্রগোপাল রায়। রামেন্দ্রসুন্দর মাসীমাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিলেন আর একজন সেলাই শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী রেখে দিলেন। অবশ্য তারাবাবুই তাঁকে সংগ্রহ করে এনেছেন। চঞ্চলা মাসী আহার ও নিদ্রার সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘড় ঘড় করে সেলাই শিক্ষা করেন—খবরের কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হল, তারপর হাত পড়ল কাপড়ে। তিনি বুদ্ধিমতী, এক মাসের কাজ সাত দিনেই সড়গড় করে নিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের একটা জামার নমুনা দেখে ঠিক তার মাপে জামা তৈরি করলেন।

নানার স্নানের পর তাঁকে পরিয়ে প্রণাম করে বললেন, গাছের প্রথম ফল যেমন দেবতার চরণে উৎসর্গ করে, আমার হাতের প্রথম কাজও আমার প্রত্যক্ষ দেবতার গায়ে পরিয়ে তৃপ্তি পেলাম। বাবা, আমার হাতের তৈরী জামা আপনার গায়ে সুন্দর ফিট করেছে—আমার সেলাই শেখা সার্থক।

নানার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখলাম না, শুধু একবার এ হাত উঠিয়ে ও হাত ঘুরিয়ে করকরে জামাটা দু-একবার দেখে নিয়ে বললেন, তা ভালই হয়েছে বলতে হবে।

আমি পাশেই ছিলাম, নানার নতুন জামায় একটা টান দিয়ে বললাম, বাস্, এইটুকু? তুমি নিশ্চয় চঞ্চলা মাসীর সব কথা শোন নি! উত্তর পেলাম না। অস্বস্তি বোধ হওয়ায়, ধোপদুরস্ত জামাটা ছেড়ে খালি গায়ে নানা খাবার-ঘরে ঢুকে পড়লেন।

চঞ্চলা মাসী অনেকটা নানার মত দেখতে—ধন্যা পিতৃমুখী কন্যা। আমার দুই মাসীমা, চঞ্চলা ও গিরিজা দেবী নানার খাবারের কাছে বসে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করতেন। সকাল-সন্ধ্যায় অনেক লোকজনের সমাগম হত বলে নানীর মত তাঁরাও বাবার কাছে বসে দু দণ্ড কথা বলার সুযোগ পেতেন না। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরাও কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কোটেশন দিতেন। রবিঠাকুরের যে কোন একটা বই তাঁদের হাতে থাকতই। চঞ্চলা মাসী বেশী কথা বলতেন—সর্বদাই হাসিখুশি মুখ। আর ঠিক উল্‌টো ছিলেন—তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী গিরিজা দেবী। স্বল্প-ভাষিণী, স্থির, ধীর, গম্ভীর। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মল—সাতেও নেই পাঁচেও নেই, ধমক দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে—তবু নালিশ করে না; আর ওদিকে চঞ্চলা মাসীর পুত্র দুষ্বা তেমনই প্রাণচঞ্চল—চলনে বলনে চৌকস। এই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবকে সামলান দায়। দুর্বল নির্মলের প্রতি সবল দুম্বার অহেতুক আক্রমণ হলেই তাকে উদ্ধার করতে আমাকে প্রায়ই হিমশিম খেতে হত—মাঝে মাঝে নানাও উত্ত্যক্ত হয়ে আমাকে আদেশ করতেন, দুজনেরই কান মলে দাও। দুম্বার কানে হাত পড়লেই আমার মোচড়টা বেশ বজ্রকঠিন হয়ে উঠত। কারণ সদ্য চুরি করে জিলিপি খাওয়াটা তখনও ভুলতে পারি নি।

নিরপরাধ নির্মলের কানটা একবার ছুঁয়েই ছেড়ে দিতাম, জানতাম সে বেচারা নির্দোষ; এই নিয়েই দুম্বা একদিন নানার কাছে নালিশ করে বসল।

রামেন্দ্রসুন্দর চোখ দুটি তুলে তুহিন-শীতল কণ্ঠে বললেন, আর একবার দুম্বার কান মলে দাও।

আমিও প্রস্তুত, তখুনি তার কর্ণদ্বয়ে আর একবার হাতের খেল দেখিয়ে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, আগেই সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন। সেদিন বুঝি খবর না দিয়েই হঠাৎ বিকেলে এসে পড়েছেন। সঙ্গে জনৈক ভদ্রলোক, কোথায় সভা-সমিতি ছিল, ফিরতি পথে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। আমরা তখন সবাই নগ্নপদে একটা ফুটবল নিয়ে নীচে ছোটাছুটি করছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে দেখেই তারাপ্রসন্ন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে নানাকে খবর দিতে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে সামনে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তিনি তখন সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, তাঁর ধপধপে পাঞ্জাবির এখানে-সেখানে দাগ লেগে গেল।

ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দরও খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতেই আমার এইরূপ আচরণ দেখে হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ বরং রামেন্দ্রসুন্দরকে বাধা দিয়ে বললেন, এতে আর কী হয়েছে? বালকের চঞ্চলতা আমার ভালই লাগে।

এদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের অবস্থাও সঙ্গীন। রবীন্দ্রনাথের আসার সংবাদ পেয়েই তিনি নগ্নগাত্রে ছুটে এসেছেন সে বিষয়ে খেয়ালই নেই। অনুচর তারাপ্রসন্ন মনে করিয়ে দিতেই তিনি মহা অপ্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ রহস্য করেই বললেন, পোশাকী রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা দেখতে চাই না—আটপৌরে ত্রিবেদী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে।

ইতিমধ্যে নানা তারাপ্রসন্নের হাত থেকে জামাটি নিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছেন, বোতাম লাগানোর সময় নেই।

একথা সেকথা চলতে থাকে, তারাপ্রসন্ন এসে নানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কী বললেন, রামেন্দ্রসুন্দর আধ আধ ভাষায় করযোড়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জলযোগের বিনীত অনুরোধ জানালেন: সামান্য মিষ্টান্ন—যদি একটু—আমার স্ত্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করেছেন।

আমি যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তা বেশ, দিচ্ছেন দিন, রামেন্দ্র-শক্তির অনুরোধ—আমি তো অসম্মত হতে পারি না।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে হাসি ধরে না। তারাপ্রসন্নের ঝটিতি অন্তঃপুরে গমন।

অন্দরে শরবত ও মিষ্টান্ন সাজানোই ছিল। তারাপ্রসন্ন দু হাতে দুখানি থালা

নিয়ে আবির্ভূত হলেন, সঙ্গে ঘি—তার হাতে দু গেলাস শরবত। পশ্চাতে ভৃত্যের হাতে সরপোশ ঢাকা দু গেলাস জল। ঘি ফরাশের উপর গেলাস নামিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল। তারাপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গের ভদ্রলোকটির সামনে থালা ধরে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নস্যের টিপ নেওয়ার মত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সহযোগে একটি মিষ্টান্নের অগ্রভাগ ছিন্ন করে আলগোছে মুখে ফেলে দিলেন, তারপরই এক ঢোক শরবত।

একে ভোজন না বলে দৃষ্টিভোগ বলাই উচিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তাঁর আহারে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সামনের দৃষ্টান্ত দেখে তিনিও হাত গুটিয়ে তাড়াতাড়ি গেলাসের জলেই আচমন সেরে নিলেন।

ঘি যখন ফল-মিষ্টান্নের থালা নামিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে পাশে দাঁড়িয়ে গেল, নানা ঘিকে দেখিয়ে বললেন, এটি আমার বড় মেয়ে চঞ্চলার জ্যেষ্ঠা কন্যা। চঞ্চলা প্রায়ই আপনাকে পত্র লেখে। তার ভারি অহংকার যে তার সব চিঠির উত্তরই আপনি দেন। সেগুলি সে খুব যত্ন করে তার নিজস্ব বাক্সে তুলে রেখেছে, কাউকে দিয়ে ওর বিশ্বাস নেই।

স্মিতহাস্যে রবীন্দ্রনাথ ঘিয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেই সে একছুটে সোজা অন্দরে চলে গেল, মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে, নানার কানে ফিসফিস করে কী বলতেই, তাঁর মাথা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলে উঠল—যেন অক্ষমতা জানাতে চান।

নির্বাক চলচ্চিত্রের ন্যায় দুজনের এই ভাব-বিনিময় কবিবরকে ফাঁকি দিতে পারে নি। আয়ত নয়নের স্বপ্নভরা দৃষ্টি তুলে তিনি জানাতে চাইলেন, আবার কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে ?

চলতি কথায় আছে, খেতে পেলেই শুতে চায়। রামেন্দ্রসুন্দর সবিনয়ে নিবেদন করলেন : ওঁরা আপনার একটি গান শুনতে চান, তা কি হয় না ?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গীতানুরাগের ইতিহাস পূর্বেই অবগত ছিলেন, কৌতুক করে রামেন্দ্রসুন্দরকেই প্রশ্ন করলেন, কেন হবে না ? কী গাইব আপনি ফরমাশ করুন।

এবার কিন্তু নানা বিপাকে পড়ে গেলেন। কী বিভ্রাট ! যিনি সঙ্গীতের কিছুই খবর রাখেন না, তাঁর উপরই কিনা এত বড় ভার দিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ !

নানার মুখে আশঙ্কা ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ খেলা করতে লাগল। এ বিপদে নানাকে ত্রাণ করতে আমি ছাড়া আর কে আছে ?

ফস করে বলে বসলাম, সেই গানটা সেই "ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ"—

রবীন্দ্রনাথের চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি, প্রশ্ন করলেন, প্রথম লাইনটা বুঝি ভুলে গিয়েছ ?

উঁহু, ভুলব কেন ? ওতে যে নানার নাম আছে—সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার। আবার নানীর নামও আছে, ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ !

কবিবর পুলকিত হাস্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, আপনার নাতিটির মনে রাখবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব।

এত বড় একটা শুভসংবাদ—রবীন্দ্রনাথ গাইবেন তাঁর বাড়িতে ! নানা কি স্থির থাকতে পারেন ? ঝিকে বললেন, তোর মা আর মাসীকে ডেকে আন্।

ঝি রবীন্দ্রনাথের সামনেই বিপদ্‌টা আরও ঘনীভূত করে তুলল : ইন্দুমাকেও ডেকে আনি ?

হ্যাঁ, তাঁকেও খবরটা দিয়ো।

সে যুগে বাড়ির মেয়েরা কারও সামনে বের হতেন না। তবে রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাদের পরিবারের কাছে মানুষ ছিলেন না, ছিলেন দেবতা।

চঞ্চলা ও গিরিজা মাসী দুজনেই এসে রবীন্দ্রনাথের দুই পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই দুজনকে আদর করে উঠিয়ে তিনি বললেন, এ যে লক্ষ্মী সরস্বতী।

চঞ্চলা মাসী বললেন, বাবা আপনার কথা নিয়েই থাকেন, আমরাও পা ছুঁয়ে আজ ধন্য হলাম। মনে বড় সাধ ছিল, আজ তা পূর্ণ হল।

গিরিজা মাসী নীরব, তাঁরও চোখে মুখে ভাষাহীন কথা।

সেই গানটিই আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ ভাবে বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন।

গান শেষ হতেই রবীন্দ্রনাথ বিদায় চাইলেন বটে, নেওয়া হল না। হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি এক জায়গায় আটকা পড়ে গেল। কার্পেটের উপর উল দিয়ে বোনা একটি লেখা ভাল ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছিল—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণতলে।" রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার সেই লেখাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই, নানা আমতা আমতা করে বললেন, যেন কতই অপরাধী : স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতেই এই বিভ্রাট।

রামেন্দ্রসুন্দরের কৃপায় গানটি আমার জানাই ছিল, তাই মাঝপথেই নানার সঙ্কোচভরা টুকরো টুকরো কথাগুলির মুখে অনায়াসে সম দিয়ে বসলাম: আচ্ছা, ভগবানের চরণে কি ধুলো আছে? আর চরণ আছে কি না, দেখেছেন? ছবিতে নয়, নিজের চোখে?

একটা বালকের এই প্রশ্নে তিনি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ভাবই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল!

বিন্দুবিসর্গও বোধগম্য হল না, অবাক হয়ে চাইতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভগবান তোমার বুকে, তাঁকে যখন বাইরে আনবে, তখনই তাঁর চরণ দেখতে পাবে, আর সে চরণ শুধু এই দুখানা পা নয়, তোমার সামনে যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর চরণ, তাঁর বিচরণ।

এবার রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। আজ রামেন্দ্রসুন্দর একটি মহাভুল করেছেন। গোড়াতেই একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিতে ভুলে গিয়েছেন। ঘিয়ের প্রণাম দেখেই তাঁর টনক নড়ে উঠল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাবার সময় ডবল প্রণাম করে তিনি জমা-খরচের হিসেব বজায় রাখলেন। প্রথম প্রণাম হল রবীন্দ্রনাথ যখন আসন ছেড়ে উঠলেন, তারপর আর একটি প্রণাম করলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধানের অনেক পরের ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে, আমিও সেখানে বেড়াতে গিয়েছি। আমরা প্রায়ই বিকেলে তাঁর কাছে যেতাম। রবীন্দ্র-কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হত। একদিন কথায় কথায় তাঁকেই জিজ্ঞেস করে বসি, 'অরূপ, তোমার বাণী'—অরূপের কি বাণী আছে?

রবীন্দ্রনাথের মুখে স্নিগ্ধ হাসি, তিনি বুঝিয়ে দেন, আছে বইকি! কানে শোনা যায় না, মনের তারে ঘা দিয়ে যায়।

আমারও মনে পড়ে গেল, রামেন্দ্রসুন্দর শেষের দিকে প্রায়ই বলতেন—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে—

বহুদিন পরের কথা। ইংরেজী ১৯৩৪ সন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের

সম্বর্ধনায় আমি স্টীমার-পার্টির আয়োজন করেছি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি সেখানে আসবেন। রবীন্দ্রনাথকেও নিয়ে আসার কথা হল। কিন্তু তিনি কোথাও যেতে চান না, সেই কারণেই কেউ তাঁকে বলতে সাহস পায় না। তখন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ইহজগতে নেই। তিনি থাকলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা মোটেই অসম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমিও বাল্যকালে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহচর্যে তাঁকে যতটুকু কাছে পেয়েছিলাম, এবং তিনিও আমাকে যতখানি স্নেহ করতেন, সেই দাবী, সেই জোরেই আমারও বিশ্বাস ছিল, আমি অনুরোধ করলে তিনি কখনই অসম্মত হবেন না। শরৎবাবু বললেন, রবীন্দ্রনাথ এলে তো ভালই হয়। তাঁর সঙ্গে বসে ফটো তোলার সৌভাগ্য আমার আজ পর্যন্ত হল না। তবে মনে হয়, তিনি আসবেন না। একবার চেষ্টা করে দেখুন—তিনি সম্মত হন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসা হয়ে ওঠে না।

'না'কে 'হ্যাঁ' করা আর 'হ্যাঁ'কে 'না' করাই আমার জীবনের একটা খেলা। তাই কোনরকম দ্বিধা না করেই গেলাম তাঁর কাছে। দেখলাম, তাই তো, এ যে দেখছি কিছুতেই রাজী নন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার বাল্যকালের স্মৃতি-কথা ঝালিয়ে নিলাম। যখনই রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলি—তাঁর চোখ দুটি জলে ওঠে। এত করেও কিছু সুফলের আশা নেই দেখে বলে উঠলাম, তবে আপনার দরজায় সত্যাগ্রহ করব। এতক্ষণে তিনি হেসে সম্মতি দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে আনতে গিয়ে দেখি, তাঁর শরীর মোটেই ভাল নেই—ডাক্তার সামনে বসে। তবু, শুধু আমাকে বিমুখ করবেন না বলেই, উঠে এসে গাড়িতে বসলেন। স্টীমারে যখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, "সোনার তরী" আজ আমার কাছে সার্থক—আপনার স্পর্শে তরী আজ সোনার হয়ে গেল।

হাস্যোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—তুমি বেশ কথাটি বলেছ।

শরৎবাবু সামনে আসতেই তাঁকে বলি, এগিয়ে আসুন, এবার আপনার বহু-কালের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

গ্রুপ ফোটো তোলার জন্যে ফোটোগ্রাফারও প্রস্তুত। 'ক্লিক্' করে একটা শব্দ হতেই, আমাদের মধ্যে পাশাপাশি উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আলোছায়ার খেলায় চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে রইলেন।

৮· অনেকদিন আগের কথা। রামেন্দ্রসুন্দর তখন চাঁপাতলার বাড়িতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত। রামেন্দ্রসুন্দর তখন কী একটা সভায় গিয়েছেন—তাই দেখা হল না। সে সময় পদ্মমাও দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ফিরে আসতেই পদ্মমা নানাকে বললেন, ওরে রাম, আজ দুটি ছেলে তোকে ডাকতে এসেছিল, যেন একজোড়া পুন্নিমের চাঁদ—তারা ঢুকতেই ঘর যেন আলো হয়ে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর যা উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা আজও মনের গভীরে সযত্নে তুলে রেখেছি।

তিনি মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলেছিলেন, শুধু ঘর নয়, গোটা বাংলা দেশ এঁদের জন্যে আলো হয়ে আছে। একদিন সারা ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আবার চঞ্চলা মাসীর কথায় ফিরে আসি। তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিন আসন্ন—সঙ্গে ঘিকেও নিয়ে যাবেন—মাস দুই পরেই তার বিয়ে। সন্তোষের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আগেই হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন আমি আর ঘি একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি, সেও চলে যাবে—মনটা কেমন কেঁদে উঠল। দুম্বা ফোড়ন দিয়ে বলল, ঘি বাবুদিদিও চলে যাচ্ছে—আমাদের দলে ভাঙন শুরু হল, এবার কী হবে ধীরেনদা?

নানার ভাবভঙ্গী যেন আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। মুখে দার্শনিকের গাম্ভীর্য—কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব রামেন্দ্রসুন্দরের ঔদার্য মিশিয়ে উত্তর দিলাম, কী আর করা যেতে পারে? যাওয়া-আসা নিয়েই তো পৃথিবী—এই সুখ-দুঃখ নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকা। সে সময় রামেন্দ্রসুন্দর আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধমকে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার কোন থিয়েটারের পার্ট মুখস্থ হচ্ছে নাকি?

দুম্বা আমার হয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে নানাকে বুঝিয়ে দিল—এমন সময় আবার ঘিয়ের আবির্ভাব।

ধার করা গাম্ভীর্য আর কতক্ষণ টিকবে—চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেই প্রথম রামেন্দ্রসুন্দর কাপড়ের খুঁট দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে বললেন, এতে কাঁদবার কী আছে? সব মেয়েরাই তো শ্বশুরবাড়ি যায়।

নানা তো এক কথায় মামলা ডিসমিস করে দিয়ে গেলেন—কিন্তু আমাদের তিন-জনের ঘরোয়া বৈঠক যেন শেষ হতে চায় না।

ঘিয়ের হাত ধরে আমি কাঁদি, সেও কাঁদে, দুম্বাও যোগ দেয়। আমাদের

ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়ে গেল, যেন শুভবিবাহ নয়—এটা তার 'কন্‌ডোলেন্স মীটিং' বসেছে। এমন সময় নানী আসতেই তিনজনের কান্না একসঙ্গেই থেমে গেল। মূল তাৎপর্য অবগত হয়ে নানী এক তাড়ায় ক্রন্দনের ত্রয়ী চুক্তিকে ভেঙে দিলেন। চঞ্চলা মাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, ওরে দেখে যা, 'আম'না হতেই আমায়ণ'।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম। স্বামীর নাম কিনা! তাই ইন্দুপ্রভার মুখে 'রাম নাম' নেবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রামচন্দ্রকে 'আমচন্দ্র' বলেই কাজ চালিয়ে দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবী উভয়কে একসঙ্গে 'আম-দরবারে পেলেই, এই আম কথাটি নিয়ে কত যে ঠাট্টা করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

চঞ্চলা মাসী তাঁর পিতৃদেবের কাছে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রথম কাজ ঘিয়ের বিবাহে তিনি যেন উপস্থিত থাকেন, আর সেই জন্যেই গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতেই ঘি-এর বিয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন—উদ্দেশ্য, রামেন্দ্রসুন্দরের কলেজের ছুটিও থাকবে—আর সাংসারিক দিক দিয়েও তাঁর অনেকটা সুবিধা হবে। কিন্তু, তা হল না।

পাত্রপক্ষের ঘোরতর আপত্তি—অত গরমে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; খাওয়া-দাওয়া আছে, আত্মীয় কুটুম্বকে বাদ দেওয়া চলে না—ছেলের বিয়েতে কিছু ধুমধাম না করলেই বা লোকে বলবে কী? তাই অগত্যা, ফাল্গুন মাসেই বিয়ের দিন স্থির হল। চঞ্চলা মাসী যাবার সময় বার বার সেই কথাটি রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। পিতৃদেবের পদধূলি নিয়ে গাড়িতে উঠেই নানীকে পুনরায় বললেন, মা, বাবাকে নিয়ে বিয়ের অন্ততঃ সাতদিন আগে আসা চাই, তুমি রোজ সে কথা একবার করে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

রামেন্দ্রসুন্দর নির্বিকার।

মেসোমশাই গাড়িতে উঠলেন। ঘি প্রণম্যদের পায়ের ধুলো নিয়ে আমার কাছে আসতেই আমি ছুটে উপরে পালিয়ে গেলাম। পড়ার ঘরে খিল এঁটে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। মালপত্র বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়ির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ করে দূর থেকেই কানে আসে, শ্রাবণের ধারা চোখে নেমে এল। রামেন্দ্রসুন্দর, ইন্দুপ্রভা দেবী আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই সোজা উপরে এসে আমার রুদ্ধ দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করতে থাকেন, তবুও সাড়াশব্দ নেই।

শেষটায় দরজা খুলতেই আমার সিক্ত চক্ষু দেখে নানা থমকে দাঁড়ালেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কথায় কথায় পুরুষমানুষের চোখে জল কেন?

কিন্তু নানীর অবস্থা কাহিল, চঞ্চলা মাসী এবার অনেক দিন তাঁর কাছে ছিলেন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কোন্ মায়ের মন না কেঁদে ওঠে? তার-ওপর ঘিকে আশৈশবে পালন করেছেন, তাই তাঁর চোখেও জল। আমায় বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন: এ কদিন পরেই আবার ঘিকে দেখতে পাবি—কাঁদিস নে, ঘিয়ের বিয়েতে তোকে নিয়ে যাব।

আমাকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু নানী নিজেই বেসামাল।

রামেন্দ্রসুন্দর ইন্দুপ্রভাকে সরিয়ে দিলেন।

তাঁরা চলে যেতেই আবার দরজায় খিল দিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর কলেজে মাস খানেকের ছুটি নিলেন। আমরা সব বাড়িমুখো। সাজ সাজ রব পড়ে গেল—কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কাকস্য পরিবেদনা। চিরদিন যেমন দেখেছি, আজও তেমনই। রওনা হবার পাঁচ মিনিট আগেও সেই আত্মসমাহিত ভাব। তারাপ্রসন্ন দস্তুরমত মুশকিলে পড়ে গেলেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি নানীর শরণাপন্ন হতেই তিনি ছুটে এসে নানাকে সজাগ করে দিলেন, কই এস, গাড়ি ফেল হয়ে যাবে যে!

রামেন্দ্রসুন্দর তখনও বইয়ের পাতায় চোখ লাগিয়ে আপন মনে কী বিড়বিড় করছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, এই যে যাচ্ছি।

তারাপ্রসন্ন নানার জামা হাতে দাঁড়িয়ে। সেদিকে দৃক্‌পাত না করেই চটি পায়ে নানা নীচে নামছিলেন, নানী পেছন থেকে আর একবার বচন দিলেন: অমনই যাবে নাকি? জামাটা গায়ে দিয়ে নাও, আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল যা হোক।

নানা থতমত খেয়ে বললেন, কই?

এই যে আমার হাতে।—তারাপ্রসন্ন জামাটা এগিয়ে দিতেই নানা লক্ষ্মী ছেলের মত সেটা নিয়েই মাথা গলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আমার লাঠিটা?

নানী তাঁর যষ্ঠি নিয়েই অনুগমন করছিলেন, আমি একটু রসিকতা করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি, বলে উঠলাম, এই যে তোমার পেছনের লাঠি হাতে নানী, আবার কিছু বেচাল হলেই তোমার পিঠে বসিয়ে দেবেন। খুব সাবধান।

নানার একটা দমকা হাসি, ওদিকে নানীর একটা অম্লমধুর তাড়া।

গাড়িতে উঠবার আগেই রামেন্দ্রসুন্দর হঠাৎ থেমে গেলেন। জামার উপর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ বোতাম খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি যে উল্‌টো করে জামা পরেছেন সেটা খেয়াল নেই।

নানী ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি জামাটি ছাড়িয়ে আবার সোজা করে পরিয়ে দিয়ে বললেন, কী আর বলব তোমাকে? আমার কপাল!

রামেন্দ্রসুন্দর এবার একটা জুতসই জবাব দিয়ে বসলেন: সেটা অ্যাদ্দিন বুঝলে, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে!

এবার আমাকে শিক্ষকের আসন নিতে হল, নানাকে জড়িয়ে ধরে বলি, তোমার অত ভুলো মন কেন, বল তো? কার সঙ্গে আপন মনে কথা কও, সব সময় কী যে ভাব, তোমার মনটা যে কোথায় পড়ে থাকে?

আরও হয়তো বহুবিধ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতাম, মাঝপথে নানী আমায় থামিয়ে, আবার আমার কাছেই জানতে চাইলেন, তুই যদি বলতে পারিস, তোর নানা দিনরাত কার কথা ভাবে, তা হলে বুঝব তোর কিছুটা বুদ্ধি হয়েছে।

সোৎসাহে উত্তর দিই, না বললে বুঝি বুদ্ধিমান বলবে না, এই তো? আচ্ছা তবে শোন, বলব নানা?

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখেও কৌতূহল।

ছোটনানীর কথা।

নানীর উচ্চকিত স্বর: সে কি রে? সে আবার কে?

কেন, সাহিত্য-পরিষদ্।

নানীর হাসি যেন আর বাঁধ মানে না, তার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরেরও অবাধে যোগদান।

নানী আদর করে আমার মত বুড়ো ছেলেকেও কোলে নিয়ে বললেন, ওরে আমরা পাগলা ছেলে, ঠিক, বলেছিস, ওটা আমার ঘোর সতীন!

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত বক্র: এটি তোমার নিজস্ব আবিষ্কার, না, অন্য কেউ মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে?

সত্যি কথা বললেই আমার মৌলিকত্ব চলে যাবে, এটা জেনেও তাঁকে ঠিক কথাটিই বলি: তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, যেদিন সাহিত্য-পরিষদের নতুন গৃহ-প্রবেশ হয়েছিল, তার আগের দিন নগেন্দ্রনাথ বসু এই কথাটি আমায় বলেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ দিয়ে ছোট্ট একটি কথা বেরিয়ে এল: হুঁ-উ-উ-উ! বটে!

... ধুরন্ধর তারাপ্রসন্নের সুনিপুণ পরিচালনায় আমরা সদলবলে লটবহর সমেত জেমোর

নূতন বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। সে যুগে বাস-মোটরের চল ছিল না, জেমোতে যেতে হলে সব-কিছু যান-বাহনেই চড়তে হত—সে যে কী কষ্ট! কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ট্রেন-যোগে যাওয়া, তারপরই ছ্যাকড়া গাড়িতে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত হটর-মটর করে পৌঁছনো, তারপর কিস্তি যোগে গঙ্গাপথ পার হয়ে রাধার ঘাটে, আবার মালপত্র বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়িতে সুদীর্ঘ বিশ মাইল অতিক্রম করা—সে যে কী ঝাঁকুনি—গায়ের ব্যথা যেতেই দু একদিন লেগে যেত। শুধু কী তাই? আবার মাঝপথে রণগাঁ—সেখানেও ছোটখাটো একটা রণ-সচল এবং অচল লাগেজ নিয়ে পারাপার হতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক!

ঘিয়ের বিয়ে জেমোর নূতন বাড়ি থেকেই হবে, এটা পূর্বেই ঠিক হয়েছিল। ঘিকে আবার দেখলাম, আবার হাসলাম—কিন্তু সে আর কদিনের জন্যে? সেই কথাটি চিন্তা করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উর্ধ্বে উঠে আপনার ভারে বুঝি আবার মাটিতে পড়ে গেল।

১৩১৮ সাল বসন্তকাল। ফলে ফুলে বাংলার সবুজ আঁচল ভরে গিয়েছে। পাতায় পাতায় রঙের ঢেউ, ভ্রমরও বুঝি ফুলের কানে কানে কত কী প্রণয়ের কথা শুনিয়ে যায়, সবারই প্রাণে ফাল্গুনের আমেজ—কেবল রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বারে ষড়ঋতুর ঐশ্বর্য করাঘাত করে ফিরে যায়।

সেদিন ঘিয়ের বিয়ে। দুর্গাদাস ও নীলকমল ত্রিবেদী দুই ভাই ভীষণ ব্যস্ত। গিরিজা ও চঞ্চলা মাসীর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, বাড়িতে জেমো রাজবাড়ির পাঁচ-ছ তরফের বহু নরনারীর সমাগম, মেয়েরা সকলেই আজ লালপাড় হলুদ-রঙা শাড়ি পরে এধার-ওধার কারণে অকারণে ছোটাছুটি করছেন। ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়িতে যে তাঁরই নাতনীর বিয়ে, তাঁকে দেখে কিছুই টের পাওয়া যায় না—যথাপূর্বং তথাপরং। সেই চিরন্তন লেখা আর মামুলী খাতাপত্তর বই নিয়েই তিনি নিজেকে নির্বাসিত করেছেন। দুনিয়া কোথায় চলেছে, খেয়াল নেই।

ঘিয়ের পিতৃদেব আমার মেসোমশাই শ্রীযুত সৌরীন্দ্রগোপাল রায়—ডাকনাম ছিল নন্দলাল এবং সেই নামেই নানা ও নানী তাঁকে ডাকতেন। তিনি মাঝে মাঝে নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠতেন—'নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ!' তারপরই একটানা পিলে-চমকানো হাসি। বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। ঢেউ দেওয়া চুলে মাঝখানে সিঁথিকাটা—দাড়ি এত ঘন ছিল যে দৈনিক ক্ষৌরকার্য

সম্পাদন করলেও গালের ওপরে একটা নীলাভ স্বপ্ন জড়িয়ে থাকত। বাড়ি বাঘডাঙায়। দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলেই, তিনি বুক ঠুকে বলতেন, Tiger Land। কুস্তি পরিদর্শনে বেজায় শখ, ভারতের সব বড় বড় কুস্তিগীরের নাম মুখস্থ। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানেই নাম করা পালোয়ানদের মল্লযুদ্ধ হোক না কেন, তিনি 'সর্বধর্মান্' এমন কি সর্বকর্ম 'পরিত্যজ্য' সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কুস্তি পরিদর্শনের ইতিহাস আছে। তখন অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর দেহরক্ষা করেছেন।

১৯২৯ সন, সদ্য কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে গিয়েছে; সেই প্যাণ্ডেলেই ছোট গামার সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ গোবর গুহের কুস্তি হবে। দলে দলে সেখানে লোক আসছে। আমার নন্দ মেসোর কী উৎসাহ—দু-চার দিন আগে থেকেই বাড়ির সকলের কর্ণ বধির হয়ে গেল যে আমাদের গোবর জিতবেই। গোবরের আখড়ার আশে-পাশে তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক ঘোরাঘুরি করা চাই, ফিরে এসে রন্দা মারা, গোঁত্তা মারা, ধোবিকে পাট ইত্যাদি বহু শ্রুতিকটু এবং শ্রুতিমধুর শব্দের সঙ্গে বিশেষ অঙ্গভঙ্গী মারফত পরিচয় করিয়ে দিতেন। কার কত বাদাম পেস্তার বরাদ্দ, কে কী পরিমাণ ঘিউ খায়, এ সবের হিসেব তাঁর আঙুলের ডগায়।

যেদিন কংগ্রেস মণ্ডপে কুস্তি হবে, সেদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেই তিনি এমন হৈ-চৈ শুরু করলেন যেন কুস্তিটা তখুনি আরম্ভ হয়ে গেল আর কি। সকাল থেকে বিকেল তিনটে অবধি উত্তেজনায় কাটিয়ে নন্দ মেসো ঘণ্টাখানেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে! তাঁর কার্যকলাপ ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যেন তিনি স্বয়ং আজ ছোট গামার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। কী বুক ফুলিয়ে চলা, সঘন গোঁপে হাত দেওয়া ইত্যাদি।

কুস্তি আরম্ভ হবার দেরি নেই এমন সময় সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডেকে তাঁর পাশেই বসতে বলল। এমন সময়ে দেখি, ছোট গামা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে অহেতুক চিৎকারে রণভূমি মাতিয়ে তুলেছে। ওদিকে গোবরবাবু ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন। কুস্তি আরম্ভ হল।

সেদিন বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয়। রেফারীর মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনায় আমাদের গোবরবাবু হেরে গেলেন। সেই বুড়ো বয়সেও আমার হাঁপিয়ে কান্না। আরক্ত মুখে সুভাষ উঠে পড়ল। যাবার সময় গাঢ় কণ্ঠে বলে গেল, অত বিচলিত হয়ো না ভাই।

নন্দ মেসোর পাত্তা নেই। অগত্যা একাই বাড়ি ফিরে এলাম। দেখি, তিনিও ধরাশায়ী। যেন ছোট গামা তাঁকেই 'চিত' করেছে। অতঃপর দশ দিন কারও সঙ্গে বাক্যালাপ নেই, দাড়ি কামানো বন্ধ—যেন কঠোর অশৌচ পালন করে চলেছেন। পোড়া পেট মানে না, তাই মুখে দুটি গুঁজে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকেন।

নন্দ মেসোর আর একটি মহৎ গুণ ছিল। কথায় কথায় 'ওরে আমার ধন রে মানিক রে চাঁদ রে' আর কখনও বা 'বাবা রে বাবা রে' শব্দে এমন একটা দিলদরিয়া হাসি হাসতেন যে তাঁকে দেখলেই মনে হত তিনি অষ্টপ্রহর বেশ খোশ মেজাজেই আছেন। তিনি আজ কন্যা সম্প্রদানের জন্যে গরদের কাপড় পরে এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করছেন। মুখে সেই চিরন্তন হাসি লেগে আছে বটে, কিন্তু প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পরের হাতে তুলে দিতে হবে তারই যেন একটা করুণ ছায়া আজ সেই চিরাচরিত হাসির আড়ালে লুকোচুরি খেলছিল।

বহড়ায় ঘিয়ের বিয়ে, বর আসছে, দূরে ব্যাণ্ডবাদ্য শোনা যায়। পদ্মমা তাড়াতাড়ি বাইরে নানার তপোবনে ঢুকেই ডাক দিলেন, ওরে রাম, একবার বাইরে এসে দাঁড়া, ওরা যে সব এসে পড়ল।

নানাও যে অবস্থায় ছিলেন, সেই ফতুয়া গায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অনেক বাজি পুড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সুসজ্জিত বর সমুজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ঘেরা চতুর্দোলা থেকে নামলেন।

আমি পদ্মমার সঙ্গে ছুটে এসেই নানাকে বলি, আমার বোনকে রাহাজানি করতে ওরা কেমন ব্যাণ্ড বাজিয়ে ঘটা করে এসেছে। ওরা সব ডাকাতের দল—

আরও হয়তো বলতাম, নানা আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, ছি, ওসব কথা বলে না।

পাশেই পদ্মমা ছিলেন, আমার মাথায় একটা মিষ্টি টোকা দিয়ে বললেন, তুইও এমনই করে একদিন ডাকাতি করতে যাবি।

ইস! আমার ভারি দায় পড়েছে।

মাতা ও পুত্রের মিলিত হাস্যধ্বনি কানে এল।

আমি ততক্ষণে ছুটে গিয়ে জৌলুসের মধ্যে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছি। পদ্মমা অন্দরে চলে যেতেই নানাও এগিয়ে এলেন।

বর দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ঘি পটে আঁকা সুন্দরী না হলেও দেখতে মোটামুটি ভালই। তার বর হল কিনা কালো রোগা প্যানপেনে!

আবার এসে নানাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঘিয়ের বর আমার পছন্দ হল না, একে চোখ ছোট তার উপর রঙ ময়লা। ওকে আর বর বলে না, বর স্কোয়ার বলাই উচিত।

আমার গাণিতিক হিসাব শুনে নানা মৃদুহাস্তে বললেন, ও রকম কথা বলতে নেই।

কেন? ভগ্নীপতিকে ঠাট্টা করা যায় না? যাই বল না কেন, আমার পছন্দ হয় নি।

কোকিল যে কালো, তাতে কী বা আসে যায়? গুণ থাকলেই হল।

উত্তর পছন্দ হল না। সদ্য-শেখা কথাটি আউড়ে দিলাম, আগে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি।—তার পরেই ভিড় ঠেলে ছুটে গেলাম অন্দরের দিকে। কর্মব্যস্ত নানীকে উদ্ব্যস্ত করে তুললাম: ও রকম একটা কালো বরকে কে পছন্দ করেছে, জানতে চাই। যেন কী একটা কিম্ভুত—

নানী মুখ না তুলেই জিহ্বা কর্তন করে বললেন, ভূত হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ষাট ষাট, ও কথা মুখে আনতে নেই। অমন সোনার চাঁদ ছেলে! আহা, খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে থাক্ তা হলেই হল!

তা বেঁচে থাক্ আপত্তি নেই, কিন্তু কে তোমার ওই সোনার চাঁদ ছেলেকে পছন্দ করেছে, তা তো কই বললে না?

নানী কিছুটা বিরক্ত হয়েই মৃদু ভৎর্সনা করে বললেন, যা এখন তুই, বাইরে নাচ-গান হচ্ছে, দেখ্‌গে যা। আর জ্বালাতন করিস নি। আমার হাতে অনেক কাজ।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা আমার পাশেই ছিলেন। তিনি ফোড়ন দিয়ে বললেন, রূপ না থাকলেই বা—ওদের যে অনেক টাকা তা বুঝি জানিস না?

বাস্, তবে আর কী? এখন থেকে তা হলে সাহেব বলেই ডাকব। যাই একবার ঘিকে সুখবরটা দিয়ে আসি।

ছুটলাম ঘিয়ের কাছে। ওপরের এক কোণের ঘরে পুরললনারা সবাই ঘিকে ঘিরে বসে আছেন, কেউ বা দাঁড়িয়ে আর কেউ সযত্নে কত পারিপাট্যের সঙ্গে তাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন। ঘি ঘেমেই অস্থির। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে জটলা করেন সংসারের যাবতীয় কথা—কে কী রান্না করে, কে কী খেতে ভালবাসে, বড় বউয়ের ছেলে-পুলে হল না, কত মানত-মুনত করলাম—মা ষষ্ঠী মুখ তুলেও চাইলেন না। মেজো বউ আরাম-কেদারায় শুয়ে কেবল নাটক-নভেল পড়ে, গেরস্থালীর কাজকর্ম কিছুই

দেখে না। আর ছোট বউয়ের কথা কী বলব পিসী, এমনই সে মুখরা, একটা কিছু বলেছি কি দশঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ও-বাড়ির বউ দেখলে কেমন চোখ জুড়িয়ে যায়, আহা যেন রূপে গুণে লক্ষ্মী। শ্বশুর-শাশুড়ীর কী সেবাযত্ন কী ভক্তি, ভোর থেকে রাত অবধি খাটে, মুখে রা-টি নেই। যাক, যাদের সংসার তারাই দেখে শুনে নিক, আমি আর কদ্দিন। এই দু দিন পরেই তো কাশীবাসী হব। দুটি খাব আর বাবা বিশ্বনাথের চরণে পড়ে থাকব! আমার আর কি!

ওই মুখেই তখুনি আবার কাদু পিসীর গা টিপে অন্য কথা পেড়ে ফেললেন: ওই দেখ, কমলার কেমন গা-ভরা গয়না, কেমন আসমানী রঙের শাড়ি, পায়ে চটকদার চটি। মেয়ে হয়ে আবার 'ছিলিপার' পরা—ঘেন্নায় মরে যাই। ওর সোয়ামী কোন্ কোম্পানিতে মোটা মাইনে পায় কিনা তাই এত ঠাট! কমলির কী দেমাক দেখেছ পিসী? মর্ মর্, গরমে মাটিতে পা পড়ে না!

এমনই কত কী সব আবোল-তাবোল আলোচনা চলতে থাকে। যেন বিয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্বন্ধই নেই—শাড়ি অলঙ্কারের বহর দেখিয়ে লেডিস পার্কে বেড়াতে এসেছেন।

মনে হল ঘিকে তার বরের কথাটা বলি। না, কাজ নেই, সে কষ্ট পাবে। আর বলেই বা কী লাভ? উত্তীর্ণ-সন্ধ্যার প্রথম লগ্নেই বিয়ে, একটু পরেই তো চার চক্ষুর মিলন হবে।

বাইরে এসেই দেখি শ্রীমান্ বর পুষ্পশোভিত উচ্চাসনে বসে আছেন। বরযাত্রীর দল সব ঢালাও ফরাশে—কেউ বা তামাক টানছেন, কেউ বা সিগারেট ফুঁকছেন, আর কেউ বা তাকিয়া ঠেস দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে খোশ মেজাজে কত না আজগুবি গল্প জুড়ে দিয়েছেন। আসর সরগরম, মাঝে মাঝে বিকট অট্টহাস্য। কেউ বা চুটকি বাজিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেই স্রেফ 'নস্যাৎ'-এর সামিল করে তুলতে চান। এদিকে কন্যাপক্ষ থেকে করযোড়ে কত আদর আপ্যায়ন, গোলাপজলের ফোয়ারা, কোনও কিছুরই ত্রুটি নেই। ট্রে-ভর্তি সোনালী তবক দেওয়া পান দন্ত বিকশিত করে বরপক্ষীয়দের কর-কদলীতে সমর্পণ—বরযাত্রী কিনা, তাই আঙুল ফুলে কলাগাছ। সামনেই নাচ শুরু হয়েছে, শুনলাম খেমটা নাচ বরকর্তারা নাকি সঙ্গেই এনেছেন।

ঠাকুরদালানের সামনেই মস্ত বড় উঠোন। তারই এক কোণে একটি চাঁপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখে যাই কত বিচিত্র ভঙ্গীর সঙ্গে নর্তকীর বকের মত কণ্ঠ দুলিয়ে নৃত্য! ও কি! ওর চোখে এমন অদ্ভুত চাউনি কেন? ওর মুখে এত হাসি—

কিসের? চোখ ইশারায় ও কাকে ডাকছে? তবলাবাদক তবলার ওপর বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে চলেছে—যেন দার্জিলিঙ মেল! বাঁয়ার বোল উঠছে— যেন একজোড়া কপোত-কপোতীর অশ্রান্ত কূজন! 'বহুৎ আচ্ছা' 'কেয়াবাৎ' দর্শনধারী বাবুদের মুখে হরদম চলতে থাকে। এসব আমার অজানা জগৎ, তাই অবাক হয়ে মিনিট দশেক ধরে দেখছি, এমন সময় খপ করে আমার হাত ধরতেই আমি চমকে উঠে দেখি, স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর।

হয়তো তাঁর সন্ধানী চোখ আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনি তো সেখানে ছিলেন না, হঠাৎ এসে আমায় গ্রেপ্তার করলেন কেন, কারণ বুঝলাম না।

মাথা দুলিয়ে নানা জিজ্ঞেস করেন, কী দেখা হচ্ছে?

নাচ।

আর দেখে কাজ নেই। ভিতরে চল।

নানী যে দেখতে বললেন—

তা হোক, এখন তুমি আমার কাছে থাকবে।

তুমি যাও নানা, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

আর কোনও কথাটি না বলে রামেন্দ্রসুন্দর আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন।

নিজের কক্ষে আমাকে নিয়ে এসেই, এই বিয়ের দিনেও নানা কঠিন শাস্তি বিধান করলেন।

এতক্ষণ যা দেখলে, ভাল করে লিখে আমাকে দেখাও।

আমার চোখে জল এসে গেল।

বিয়ে বাড়িতে সবাই আনন্দ করবে আর আমি সেটা দেখতেও পাব না?

হ্যাঁ, সবাই দেখবে, আর তুমি শুধু তারই কথা লিখবে—এই তোমার কাজ।

নানার মুখ দিয়ে সেদিন যে কথা বেরিয়েছিল কে জানত তারই বোঝা আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে!

অগত্যা খাতা পেনসিল নিয়ে বসলাম। সভার বর্ণনা, বরের জাঁকজমক, বরযাত্রীদের চঞ্চলতা, দর্শকদের ঔৎসুক্য, তার মধ্যে নর্তকীর স্প্রিংয়ের মত কণ্ঠ দুলিয়ে নৃত্যভঙ্গী, তবলচীর মাথা দোলানো—যেটুকু দেখেছিলাম কিছুই বাদ পড়ল না। আমার বিদ্রোহী মন এই ফোড়নটুকু দিতেও ছাড়ে নি যে, বোনের বিয়েতে এসেও বন্দিত্বের ইতিহাস এই বুঝি প্রথম।

নানাকে দেখাতেই তিনি সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন। প্রত্যেক বিষয় প্রত্যেকটা শব্দ ওজন করে যেন কষ্টিপাথরে আমার মনটাকে যাচাই করে দেখতে চান। নাচের বর্ণনা পড়বার সময় নানা আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই মুখ নামিয়ে পড়তে শুরু করলেন। কোথায় যে আমার আকর্ষণটা খুব বেশী ছিল লেখার মধ্যে তার কোন হদিস না পেয়ে নানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ভাল হয়েছে, এটাকে কালি দিয়ে তোমার পাকা খাতায় লিখে রাখ।

মনে করেছিলাম, ঘিয়ের বিয়েতে খুব খানিকটা আমোদ-আহ্লাদ করব, তা আর ভাগ্যে হল কই! সব পরিকল্পনাই শিকেয় তোলা রইল। নানা একজনকে ডেকে তাঁর ও আমার খাবার আনতে বললেন। সেদিন আমাদের দুজনের বিয়ে দেখা ওইখানে শেষ।

শয্যায় লুটিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে নানাকে অনুযোগ করি: আমরা যেন অপরের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি, বিয়েটা যেন তোমার নাতনীর নয় আমার বোনেরও নয়, কী বল?

বেশী বকে না, এখন ঘুমিয়ে পড়।

বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পরদিন সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু ঘিয়ের আনন্দঘন মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বর-কনে বিদায় হবার সময় আর একবার তাকে ভাল করে দেখে নিলাম। ঘিয়ের চোখে জল—চিরপরিচিত ঘর ছেড়ে নূতন রাজ্যে প্রবেশের মুখে হর্ষমিশ্রিত বেদনার অশ্রু!

অবাক হয়ে একদিন দেখলাম, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বাড়ির সংলগ্ন পুকুরে স্নানে নেমেছেন, এমন কি তিনি আবার একটু সাঁতার কেটে দু কানে দুই আঙুল চেপে ঘন ঘন ডুব দিচ্ছেন আর উঠছেন। পদ্মমা তার আগের দিন কী উপলক্ষে নিরম্বু উপবাস করেছেন, তাই ভোরে উঠেই ছেলেকে অবগাহন স্নানের আদেশ দিয়েছেন। সদ্য-স্নাত জ্যেষ্ঠপুত্রের ললাটে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তিনি জল খাবেন।

নানাকে পাকড়াও করেই আমার প্রশ্নবাণ শুরু হয়: তুমি আবার সাঁতার শিখলে কখন্? কই, কোনও দিন তো তোমায় সাঁতার কাটতে দেখি নি—ভাগলপুরেও না, নবদ্বীপেও না। বেশ ডুবে ডুবে জল খাও দেখছি!

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে শিশুর সারল্য। স্মিতমুখে উত্তর দিলেন, সাঁতার শিখেছিলাম সেই সাত আট বছর বয়সে, এখন আর পারি না, বড্ড হাঁপিয়ে পড়ি।

সেদিনই আর একটি হাসির খোরাক পেয়ে গেলাম। স্নানান্তে মায়ের হাতে জয়তিলক নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ফরাশে বসে যথারীতি কী একটা বিষয়ে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। অন্দর থেকে দু-তিনবার ইন্দুপ্রভার ডাক এসেছে—তদুত্তরে হুঁ আচ্ছা যাচ্ছি এই সব মামুলী ছোট্ট উত্তর দিচ্ছেন বটে, কিন্তু 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' যে হয় নি এটা আমি হলপ করেই বলতে পারি। আমাকে দিয়েও একবার ডেকে পাঠালেন। তাতেও উত্তর পেলাম—আঃ, এখন বিরক্ত কোর না।

আমিও কথাটি হুবহু নানীর কানে কানে বলতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরেন আর কি! তবে এটা তো আর নূতন নয়, সারস্বত কুঞ্জের অধিবাসী রামেন্দ্রসুন্দরের সাংসারিক ঔদাসীন্যের প্রমাণ তিনি বহুবারই পেয়েছেন, তাই নিজেকে তখুনি সামলে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বাইরের ঘরে কেউ আছে কিনা?

আছে বইকি—

কালি, কলম, মন—
লেখে তিনজন।

নানী মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে ছুটে এসে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করে বললেন—চোখ দুটিতে বিপুল অভিযোগ : তোমায় কি কোনও কালেই খুঁজে পাব না?

কলম থেমে গেল। চমকে উঠে অসহায় শিশুর মত নানা নানীর দিকে চেয়ে রইলেন।

নানীরও কণ্ঠ খাদে বেজে উঠল : তোমাকে ডেকেও ফল নেই। কলকাতায় হলে কিছু বলবার ছিল না, এখানে শাশুড়ী আছে, জা রয়েছে, তবু বাইরে আসতে হল। তারপর বিনা ভূমিকায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শাঁখাটা ফেটে গিয়েছে, 'বেড়ে' দাও।

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা, তাই নানীকে ধরে বলি, 'বেড়ে' দাও মানে? পেনসিলই তো বেড়ে দেয় জানি, তবে?

নানী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, শাঁখা ভাঙার কথা মুখে আনতে নেই, তাই ওরকম বলতে হয়।

তা বেশ তো, এর জন্যে নানাকে কেন? আমিই তো ছিলাম।

অন্য কাউকে দিয়ে এ সব চলবে না, স্বামীকে দিয়েই করাতে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল। লেখবার হয়তো আরও অনেক কিছু বাকী। তাড়াতাড়ি বললেন, দাও।

নানীর হাতে ছোট্ট একটি শিল-নোড়া ছিলই, নানার হাতে দিয়ে বললেন, ঠিক করে বেড়ে দাও দিকি। যে-সে-দিনে তো আর নতুন শাঁখা পরা যায় না, তাই এত ডাকাডাকি।

নানা যন্ত্রচালিতবৎ কার্য করে গেলেন, আমারও কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নানাকে ধরে বসলাম : এ সবের হেতু কী?

সংস্কার। বাংলার মেয়েরা এরই পুজো করে জীবন কাটিয়ে দেয়, এর যে কী সার্থকতা কে জানে!

নানী বিদ্রূপ করে বললেন, তোমার সার্থকতা কেবল ওই পুঁথিপত্তর আর সাহিত্য-পরিষদ্। ওই নিয়েই থাক!

আমিও সায় দিয়ে বললাম, দাও না, ওই শিল-নোড়া দিয়ে নানার দোয়াত কলম ভাল করে বেড়ে দিয়ে যাও।

নানীও হেসে বিদায় হলেন নানাও আবার নিজের জগতে ফিরে গেলেন। শুধু সেই অনাবিল তপস্যার মাঝখানে তাঁর এই ক্ষণিক বিরতিটুকুই আমার স্মৃতিমঞ্জুষায় জমা হয়ে রইল।

ঘিয়ের বিয়ের পর জেমোতে আরও দিন আষ্টেক ছিলাম। রাজবাড়ির মাতুলদের এক একটি কার্যকলাপ দেখি আর রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিবরণ দিয়ে হেতুটা জানতে চাই : বল তো নানা, পালকি চড়ে বড় তরফের মামা ঘুঘু মারতে যান এর মানে কী? আরও মজার কথা শুনবে? বাঘডাঙায় কে নাকি পালকিতে চড়ে প্রাতঃকৃত্যে যেত, এটা কি সত্যি?

নানা নিরুত্তর।

আরও শুনলাম, সিদ্ধি খাওয়াটা নাকি মোটেই দোষের নয়—স্বয়ং মহাদেবও সিদ্ধি খেয়ে থাকেন, তাঁর একটা নাম ভাঙড়। দেবতারাও নাকি সুরাপান করেন, স্বর্গে তার নাম হয়েছে সোমরস। ঘিয়ের বিয়েতে সেদিন যে নাচ হয়েছিল, তার নাম খেমটা। ইন্দ্রের সভাতেও নাকি খেমটা নাচ হয়, উর্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা এরাও নাকি খুব ভাল নাচে।

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখ দুটি তখন কপালে। জানতে চাইলেন, কার কাছে এ সব বিদ্যে শেখা হল? দু দিনেই তোমাকে বেশ তালিম দিয়েছে দেখছি!

আমি এক একজনের নাম করে যাই, তাঁর চোখে ফুটে ওঠে ঘৃণা শঙ্কা অপরিসীম ক্রোধ। হঠাৎ আমার এবম্বিধ জ্ঞানের পরিধি দ্রুত সীমা লঙ্ঘন করায় তিনি ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

অতএব স্থানত্যাগেন দুর্জনাৎ।

ঘি অষ্টমঙ্গলার পর ফিরে এসেছে। চোখে মুখে হাসি, দেখেই বুঝলাম বরকে তার পছন্দ হয়েছে, বাঁচলাম। আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, কিরে, শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগল?

ঝাঁকা ভরা চুল নিয়ে ফাঁকা উত্তর দিয়ে ঘি পালিয়ে গেল: জানি না, যাও।

দেখলাম ঘি আর কাঁচা নেই, সে এখন পাকা ঘি!

মেয়েদের ধর্মই হল সব অবস্থার সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, আর এই বৈশিষ্ট্যই হল বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ।

এদিকে পরদিনই তারাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে আমাকে লালগোলায় চালান করে নানাও নিশ্চিন্ত হলেন।

লালগোলায় পক্ষকাল কাটিয়ে আবার কলকাতায় রওনা হ'লাম। এবার ফিরে আসার সময় ঠাকুরদার কাছে দশটা টাকা চেয়েছিলাম। তাঁর কাছে টাকা-পয়সা চাওয়া এই প্রথম। কোনও কৈফিয়ত তলব না করেই তিনি একেবারে করকরে পঁচিশ টাকা আমার হাতে দিয়ে দিলেন। আমি মহা খুশী, জীবনে টাকা সেই প্রথম হাতে এল। খুব সযত্নে কলকাতায় বয়ে এনে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সেটা গচ্ছিত রাখলাম।

এবার ঘি নেই, সন্তোষ আগেই বিদেয় হয়েছে। মনটা কেমন যেন অবসন্ন। একমাত্র সুনীল, সেই শুধু আসে। তারই সঙ্গে বিকেলে খেলাধূলা করি, আবার সেও চলে যায়। সকালে ভিখিরী কেউ খঞ্জনি বাজিয়ে ভিক্ষে চাইতে আসে, কেউ বা হাঁক ছাড়ে—দুটো ভিক্ষে পাই বাবা? আমি পণ্ডিত মশাই মারফত আগেই টাকা ভাঙিয়ে পয়সা করে নিয়েছি, তাই ওদের হাতে রোজ একটি করে পয়সা দিই, তারাও আশীর্বাদ করে চলে যায়। একদিন রবিবারের দুপুরে এক ফিরিওয়ালা অনেক রকমের খেলনা বিক্রি করতে এসেছে, তাকে ডেকে একটা দম দেওয়া রেলগাড়ি কিনে ফেললাম।

বিকেলে সুনীল আসতেই ঘন ঘন দম দিয়ে গাড়িটা চালাচ্ছি, রামেন্দ্রসুন্দর দেখতে পেয়েই আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন, ওটা কে কিনে দিল ?

কেউ না, আমি নিজেই কিনেছি।

তিনি জেরা শুরু করলেন : পয়সা পেলে কোথায় ?

আসবার সময় ঠাকুরদার কাছে দশটা টাকা চেয়েছিলাম, তিনি পঁচিশ টাকা দিয়েছেন।

টাকাটা কোথায় ?

পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে রেখেছি।

আমার হাতে দিলে না কেন ?

কখন্ তুমি থাক না থাক তোমায় পাব কোথায় ? তা ছাড়া সকালে তোমার কাছে অনেক লোকজনের ভিড়, দশটা কথা বললেও একটা কথার উত্তর পাওয়া যায় না।

তোমার নানীর হাতে দিতে কী হয়েছিল ?

ওই একই কারণে। নানীর পুজো-পাঠ, তারপর হেঁসেলঘর আছে না ? দুপুরে নানী ঘুমিয়ে থাকে। কাজকর্ম নিয়ে তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই—আমার সকালেই তো পয়সার দরকার।

কেন ?

ভিখিরীদের দিই। পণ্ডিত মশাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

কথাটি শুনে তিনি খুশী হলেন, কিন্তু শেষে প্রশ্ন করলেন, তোমার দাদু যে টাকা দিলেন আমায় বল নি কেন ? গোপন করার উদ্দেশ্য কী ?

অন্য কিছু নয়। তবে তুমি একদিন বলেছিলে, আমার হাতে পয়সা দেবে না, যখন যা দরকার জানিয়ে তোমার কাছে চেয়ে নিতে হবে। তোমাকে বললেই টাকাটা তোমার কাছেই রাখতে হত, সময়মত পাওয়া যেত না, তাই বলি নি। যাই হোক, এটা আমার অন্যায় হয়েছে।

তবে জেনেশুনেই করেছ বল ?

হ্যাঁ।

তোমাকে শাস্তি দেব। ওই বিলিতি খেলনা কিনলে কেন ? ওটা চুরমার করে তোমাকেই ভেঙে ফেলতে হবে।

মাথায় বজ্রাঘাত হল। অত শখের খেলনা, সেটাও ভাঙতে হবে—তাও নিজের হাতে !

রামেন্দ্রসুন্দর বিলিতি দ্রব্যের উপর হাড়ে চটা ছিলেন, সেটা আগেই জানতাম। তবুও যখন কিনেই ফেলেছি সেটা কি তিনি ক্ষমা করবেন না? সাহস সঞ্চয় করে তাঁকে করযোড়ে বললাম, এবারকার মত মাফ কর আর কক্ষনো করব না।

সে তো বুঝলাম। যা করেছ তার ক্ষমা নেই। ওটা এক্ষুনি ভেঙে ফেল।

আছড়ে খেলনাটা চুরমার করে দিলাম। মনে হল বুঝি নিজের বুকের পাঁজরা-গুলোই ভেঙে গেল। তার উপরেও রামেন্দ্রসুন্দর ঘন ঘন পদাঘাত করে টুকরোগুলোর এমন অবস্থা করলেন যে আর বলা যায় না। এতেও যবনিকাপাত হল না। তিনি নিবারণ পণ্ডিতকে ডেকে জানতে চাইলেন, খোকার দরুন আর কত টাকা আছে?

তিনিও ত্বরিতপদে নিচে নেমে গিয়ে খরচের হিসেব সামনে রেখে বললেন, দশ টাকা ছ আনা অবশিষ্ট।

পণ্ডিত মশাইয়ের আগেই কর্ণগত হয়েছে কী কারণে রামেন্দ্রসুন্দর এতটা উত্তেজিত হয়েছেন, তাই আমার হয়ে সাফাই গেয়ে বললেন, খোকা তো বাজে খরচা করে না। বাড়ির দরজায় গরিব-গুর্বোরা এলেই পয়সা দেয়, কেবল দু-তিন দিন হল ওই খেলনাটা কিনেছে।

বেশ, আপনার কাছেই ওটা রেখে দিন। আর দেখবেন, ওদের পয়সা দেওয়া ছাড়া আর এক কপর্দকও যেন কোনও বিলিতি জিনিসে অপব্যয় না করে।

খেলনা ভাঙার দুঃখ তখনও ভুলতে পারি নি, ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম, আমায় অবিশ্বাস করছ কেন? তুমি যখন বারণ করেছ আর কক্ষনো বিলিতি খেলনা কিনব না।

রামেন্দ্রসুন্দর আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, যখন যা দরকার হবে আমায় বলবে। আর ওই পয়সা সব খরচ হয়ে গেলেই রোজ এক টাকা হিসেবে মাসিক ত্রিশ টাকা পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আমি জমা রেখে দেব। যত পার গরিবদের দিয়ো। বিলিতি জিনিসে হাত দেওয়াটা শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর পাপ—এটা সব সময়ে মনে রাখবে।

বেশ তাই হবে। কিন্তু তুমি ওই বিলিতি ঘড়িটা ব্যবহার কর কেন?

উপায় নেই, ওটা না হলে মানুষের চলে না। দেশে তৈরি হলে নিশ্চয়ই বিদেশী কিনতাম না।

তা হলে 'পারত পক্ষে' কথাটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা তার্কিক হয়ে পড়েছ। এখুনি মহারাজাকে লিখছি,

তোমার হাতে এক পয়সাও আর যেন দেওয়া না হয়, প্রয়োজন বোধ করলে আমিই দেব।

তখনই তিনি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। পত্রটি শেষ করে নিজের হাতে খাম এঁটে ভৃত্যকে ডেকে বলে দিলেন, যাও, এখুনি ডাকে দিয়ে এস।

আমি ততক্ষণে স্থির হয়ে বসে একবার নানার মুখের দিকে আর একবার ভাঙা খেলনাটার দিকে চেয়ে দেখছিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দরের উষ্ণ ভাবটা তখন প্রশমিত হয়েছে। বললাম, এবার ঠাণ্ডা হয়েছ নিশ্চয়। তুমি তো আমাকে একটু আগে তার্কিক বলে আখ্যা দিয়েছ, সেটাও হয়েছি তোমার জন্যে। যখন যেটা সন্দেহ হবে সেইটে ভাল করে খুঁটিয়ে জেনে নিতে তুমিই আমাকে কত বার যে বলেছ তার ঠিকানা নেই। তুমি সাহস দিয়েছ বলেই একটা কথা জানতে চাই, তুমি আমার হাতে টাকা দিতে চাও না কেন? আমাকে অবিশ্বাস কর? আমি কি কখনও কাউকে মিথ্যে বলে ঠকিয়েছি? বরং আমায় টাকা ঘাঁটতে দাও—তা হলেই তো ওর প্রতি আর লোভ থাকবে না। আমার টাকা পেতে ইচ্ছে হয় অথচ পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, টাকা কী একটা অপরূপ জিনিস যে ছুঁলেই জাত যাবে? প্রয়োজনের জন্যই তো ওর প্রয়োজন, নইলে আর কী।

আগেই বলেছি, বয়সের তুলনায় আমি প্রবীণের মত কথা বলতাম। সেদিন আরও হয়তো বলে যেতাম, কিন্তু মাঝপথেই নানা আমার লেকচার থামিয়ে দিলেন। দেখলাম রামেন্দ্রসুন্দরের উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ।

সেদিন সস্নেহে বন্ধুর মত আমায় কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন, কেন বিশ্বাস করি না জান? আমি তোমায় বিলিতি খেলনা কিনতে বারণ করেছি, তা সত্ত্বেও তুমি কিনেছ এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? আমাকে না বলে গোপন করাটাই তো নিজের কাছে মিথ্যে বলা, নিজের মনকে ঠকানো। সেখানে তো আর ফাঁকি চলে না। একবার মনের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখ তা হলেই বুঝতে পারবে, লোভকে এখনও জয় করতে পার নি বলেই তো এমনটা হয়েছে। আমাকে লুকিয়ে ওই সব কিনেছ, পয়সা তোমার কাছে না থাকলে কিনতে কেমন করে?

অকাট্য যুক্তি! এর পর আর কথা চলে না। ঘাড় পেতে মেনে নিলাম। মনে পড়ে গেল, লালগোলা থেকে বিলিতি কাপড় পরে একবার কলকাতায় আসতেই তিনি তখুনি সেটা ছাড়িয়ে দিলেন। পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দিয়েই

প্রত্যাহার করে বললেন, কোনও কানা খোঁড়া মানুষকে নিজের হাতে দিয়ে দিয়ো। ফরাসডাঙার ধুতি পরতে কী হয়?

এবারও আমি মাথা নীচু করেই চলে আসছিলাম, রামেন্দ্রসুন্দর ডেকে বললেন, শুনে যাও, এই নাও দশ টাকা। তোমার নিজের কাছে রাখবে। কিসে খরচ করেছ, আমাকে পাই পয়সার হিসেব দিয়ো, এ ছাড়া পণ্ডিতের কাছেও ত্রিশ টাকা থাকবে।

সংসার খরচের টাকা নানীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। আর কিছু টাকাকড়ি তাঁর হাত-বাক্সেই রাখতেন। সাহায্যপ্রার্থীর তো অভাব ছিল না। কিছু না দিয়ে তিনি যেন তৃপ্তি পেতেন না—এটাও তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক।

সামনের বাক্স থেকে টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। সেই প্রথম নানার কাছ থেকে আমার নগদ দশ টাকা প্রাপ্তিযোগ। তবু নানাকে অব্যাহতি না দিয়ে বললাম, এখুনি যে দাদুকে লিখে দিলে খোকার হাতে যেন টাকাকড়ি না দেওয়া হয় অথচ নিজের কথাটি পালটে আবার তুমিই আমাকে দিচ্ছ!

হ্যাঁ দিলাম। আর কেন দিলাম সেটা নাইবা শুনলে। এখন যাও, খেলাধুলা করে পড়তে বোস। রবিবার বলেই যে বই ছুঁতে হবে না, তার কোনও মানে নেই।

বাস্, এই পর্যন্ত সেদিনের মত নানা ও নাতির সংবাদ শেষ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল নানার গুপ্ত দানের কথা। কত লোককে যে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করতেন, আমরা এত কাছে থেকেও জানতে পারি নি। মধু গুপ্ত লেনে যখন আমরা থাকতাম, আমাদেরই বয়সী—বছর নয় দশের একটি ছেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলেজ যাবার পথে সেই ছেলেটির অসহায় মুখখানি নানার চোখে পড়তেই তাঁর মন কেমন করে উঠল। কাছে ডেকে তার পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন, নাম ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, যশোহর জেলার অন্তর্গত বাঘডাঙা গ্রামে তার বাড়ি। পয়সার অভাবে তার পড়াশুনা হচ্ছে না। রামেন্দ্রসুন্দরের তখন আর কলেজ যাওয়া হল না। আবার উপরে উঠে হাতবাক্স থেকে কিছু টাকা এনে, বাড়ি ফিরে যাবার পাথেয় আর বই কেনবার জন্যে ছেলেটির হাতে দিলেন, এবং যশোরে তার গ্রামের স্কুলে যাতে ছেলেটি পড়তে পারে, তারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। বছর তিন চার পর, সেই ছেলেটি ফিরে এসে জানালে যে তার একটা চাকরি না হলে চলছে না।

পড়াশুনা ছেড়ে এই বয়সেই চাকরির উমেদারিতে ছুটে আসার জন্যে নানা প্রথমটা ক্ষুণ্ণ হলেন বটে, কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা বুঝে, তখনই তার একটা চাকরির জন্যে চিঠি লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর জমিদারি শিলাইদহে ছেলেটিকে নিযুক্ত করে নিলেন।

বীরভূম জেলার মহম্মদ ইসমাইল নামে তার এক ভূতপূর্ব ছাত্র ইংলণ্ডে লীডস্ শহরে বিদ্যাশিক্ষা করছিলেন। একবার তিনি অর্থাভাবে বিপন্ন হয়ে পত্রযোগে রামেন্দ্রসুন্দরের শরণাগত হন। তাঁর দুরবস্থার কথা জানতে পেরে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণ কেঁদে উঠল এবং তার সাহায্যকল্পে তখুনি তাঁকে তিন শো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই ছাত্রটি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে যে পত্র দেন তার মধ্যে দেখা যায়, অন্তর ঢেলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েও যেন সেই ছাত্রটি তুষ্ট হতে পারেন নি।

আর একটি কথা। সেই সময় দীনেশচন্দ্র সেন রামেন্দ্রসুন্দরের অপরিচিত। তিনি কুমিল্লায় রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খড়ো ঘরে রোগশয্যায় পড়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি সুদীর্ঘ পত্র তাঁর কাছে এল। ডাক্তার যখন তাঁকে জবাব দিয়েছে, মৃত্যু যখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে তাঁর চোখে, ঠিক এমনই সময় রামেন্দ্রসুন্দরের এই পত্রখানি যেন দীনেশচন্দ্রের প্রাণে এক পরম আশ্বাসবাণী বয়ে এনেছিল। তাঁর মনে যেন এই বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে আর ভয় নেই। রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

"তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্যে ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কী করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই। তাঁহার এই সুগভীর আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ফলে আমি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমারকে পাইলাম, লালগোলার রাজাবাহাদুরকে পাইলাম। আমি যে কয় বৎসর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য ও জড়বৎ পড়িয়াছিলাম সে কয় বৎসর আমি তাঁহাকে ঘন ঘন আমার বাড়ীতে পাইয়াছি। আজ অমুক এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন্ সদয় ব্যক্তি আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, রামেন্দ্রবাবু প্রফুল্লমুখে আমাকে আসিয়া প্রায়ই এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে হইত, রামেন্দ্রবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান আমাকে সহায়তা করিতেছেন। সে সকল দিনের কথা মনে হইলে, আজও আমার চক্ষু সজল হয়। হে বন্ধুবর, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলে। যখন হইতে আমার রোগ ভাল হইল, তখন হইতে তোমার শুভাগমন বিরল হইতে লাগিল। সুখের সময় আমি তোমাকে তেমন করিয়া পাই নাই কিন্তু দুঃখের সময়

তোমার সহৃদয়তা, তোমার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতেছি।"

পরের মঙ্গল করাই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-সাধনা, কিন্তু অন্যের উপকার করে নিজের নাম ঢাক পিটিয়ে সাধারণ্যে প্রচার করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই তাঁর নিকটতম ব্যক্তিও রামেন্দ্রসুন্দরের এই গোপন দানশীলতার সন্ধান পায় নি।

দিন যায় মাস যায়, আবার আসে আবার যায়। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পা দিয়েই আমি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছি, আর যেন সেই চপলতা নেই। কেউ দশটা কথা বললে একটা কথার জবাব দিই।

পাড়াটি ছিল ব্রাহ্ম পরিবেশ। কিরণ নামে আর একটি নতুন বন্ধু জুটেছে। গোয়েন্দা তারাপ্রসন্ন মারফত সবিশেষ খোঁজখবর নিয়ে তবে নানা তার সঙ্গে খেলতে অনুমতি দিয়েছেন। তার বড় ছোট তিন বোন, তার মধ্যে একটি কিরণের যমজ, তারাও কিরণের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বিকেলে আসে। তার দেখাদেখি সুনীলও তার দুই বোনকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ব্যাডমিণ্টন খেলে। সকলেরই লম্বিত বেণী পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান। কোমরে শাড়ির আঁচলটা টেনে বেঁধে খেলায় মেতে উঠত। আমায় নিয়ে মোট আটজন। আমি ছিলাম 'কমন ফ্যাক্টর'—দু দলেই খেলতাম। নানী ও নানার কোনও আপত্তি ছিল না—তবে তারাপ্রসন্ন খুব কড়া নজর রাখতেন। কতক্ষণ খেলা হয়, কখন্ তারা যায়, আমি কি করি, কী কথা বলি!

কিরণের বড় বোনকে আমিও দিদি বলি, ছোটদের নাম ধরে ডাকি। আমার মাসতুতো বোন মুরলা ওরফে ঘি আজ এখানে নেই, তার অভাব যেন এরা সবাই ভাগাভাগি করে পূর্ণ করতে চায়। এক রবিবারে ওদের পাল্লায় পড়ে নানার কথামত তারাপ্রসন্নবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্ম উপাসনা-মন্দিরে গেলাম। চক্ষু বুজে পরম করুণাময় নিরাকার পরম ব্রহ্মের কথা আর সুমধুর সঙ্গীত শুনে ঘরে ফিরে এলাম। সেদিন রবীন্দ্রনাথও সেখানে এসেছিলেন।

একদিন নানাকে জেরা করলাম: সাকার চোখের সামনে দেখতে পাই, কিন্তু নিরাকারকে চিন্তা করব কেমন করে?

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে এমনই একটা ভাব ফুটে উঠল যেন তিনি সাকার-নিরাকার দ্বন্দ্বের বাইরে।

ওসব অনুভূতির কথা, যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়।

তুমি ব্রাহ্মধর্ম মানো?

আমার বিশেষ কোনও ধর্ম নেই, সত্যকে ধারণ কর তা হলেই ধর্ম হবে।

সেদিন এই কথাটির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলাম আমারও জীবনের ছন্দ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কয়েকজন গেরুয়াধারী একদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসেছিলেন তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মসভায় কিছু সারগর্ভ বক্তৃতা দেবার জন্যে।

তাঁর মুখে কিছু ভাবান্তর দেখা গেল না বরং করযোড়ে বললেন, দেখুন, ওসব আমার ধাতে সয় না। এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁদের কাউকে নিয়ে যান। না হয় একবার শাস্ত্রী মশাইকে বলে দেখুন।

তাঁরাও ছাড়বার পাত্র নন, অনেক ধর্মের কচকচানি শুরু করে দিলেন। শেষটায় বললেন, আপনি মহাপণ্ডিত, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার মুখে এ ধরনের কথা শুনব, আমরা আশা করি নি।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, পুনরায় করযোড়ে বললেন, দেখুন, আমি যা, তাই যদি আপনাদের না বলে নিজেকে অন্যভাবে জাহির করি, সেটাই কি আপনাদের ভাল লাগবে? তাই বলছি, এক্ষেত্রে অন্য কাউকে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

তাঁরাও চলে গেলেন, নানাও তামাকের নলটা মুখে দিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করে দিলেন।

নিরাকারের কথায় তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তার মর্মাংশ কিছুটা বুঝলেও তখন গ্রহণ করি নি। নানাকে বললাম, আমি আরও উপাসনা-মন্দিরে তারাপ্রসন্ন-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব আর ওরাও থাকবে।

ওরা কারা?

কেন? সুনীল কিরণ আর তাদের বোনেরা? তারাও মাঝে মাঝে যায় কিনা—

রামেন্দ্রসুন্দর গড়গড়ার নলে টান দিয়ে বললেন, হুঁ, তা বেশ, যেয়ো।

এখানে বলে রাখি, কলকাতায় আসার পর প্রথম বার যখন গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে লালগোলায় যাই, সেবারই আমার উপনয়ন হয়েছিল। মুণ্ডিত শিরে কলকাতায় ফিরে এলাম। আমার পরম পূজনীয় নিষ্ঠাবান পিতৃদেবের আদেশে

রোজ দশ বার গায়ত্রী জপ করি। তখন আমার বয়স এই ন বছর। মন্ত্রের কোন অর্থই তখন বুঝতাম না।

পরে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে জেনে নিয়েছিলাম ওই সব সংস্কৃত শব্দের অর্থ কী। ওদিকে দু-একবার উপাসনায় যোগ দিয়ে ওর ভিতরের তত্ত্ব ও তথ্য জানতে সক্ষম হলাম না। চোখ বুজে নিরাকারের অনুভূতি আসে কি না—চেষ্টা করে দেখলাম, কিছুই হল না ছাই। একদিন নিবারণ পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি চশমা খুলে আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, এখন বুঝি বেম্মদের খপ্পরে পড়েছিস। যা, ওসব আমি বুঝি টুঝি না। আমিও নিরস্ত হলাম।

কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করে বাঁচতে চাই, অথচ পাই না কেন?

এরই মধ্যে একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল। বাংলার মরমী কবি আর নেই, তখন "আমার দেশ" এই গানটি আমার কচি মনে দাগ কেটে বসেছে। সেই জীবন-জাগানো, সেই আগুন-জালানো সুর, সেই অগ্নিময়ী ভাষার উৎস আজ শুকিয়ে গেল—সেই ছন্দ-স্পন্দনের প্রবাহ-ধর্মিতাও আজ স্তব্ধ! মনটা কেমন যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দর সেদিন বিকেলে আমাকে নিয়ে সাহিত্য-পরিষদে গেলেন। সেখানে শোকসভা হল, এত জনসমাগম সচরাচর হয় না। পরিষদে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, পরেশনাথের মন্দিরে আমরা সবাই পদব্রজে রওনা হলাম। সামনে কয়েকজন যুবক "আমার জন্মভূমি" গাইতে গাইতে চলেছে, পশ্চাতে চলমান মনীষীবর্গ—রামেন্দ্রসুন্দরও সঙ্গে আছেন। তিনি গাইতে জানতেন না, তাই বুঝি শুধু মুখস্থ বলার মত বলে যাচ্ছেন—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরেশনাথের মন্দিরে পৌঁছে গলাবাজি করে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণকীর্তন শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে আমিও নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলতে পার, মানুষ বেঁচে থাকতে কেউ আদর করে না আর মৃত্যুর পরেই তাঁর অসংখ্য গুণরাশির মহিমাকীর্তনে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, এর কারণ কী?

অর্থাৎ?

এই তো ডি. এল. রায় বেঁচে থাকতে তিনি তোমাদের কাছে আজকের এক-চতুর্থাংশ সম্মানও পান নি, আর এখুনি দেখলাম তাঁর জন্যে সবাই কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সরাসরি বললেন, তা কেন হবে? ওই তো রবীন্দ্রবাবু সেদিন নোবেল প্রাইজ পেলেন। তার আগেই দেশবাসী টাউন হলে তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা করেছে। তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে সাহিত্য পরিষদই এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী। তিনি তো বেঁচেই আছেন। তবে এ কথাও ঠিক, বিলিতি তকমা পাওয়ার পর যদি আমরা ওইটে করতাম তা হলে আজ আমাদের মুখ থাকত কোথায়? আর আমরা নিজেদের কাছেই বা কী কৈফিয়ত দিতাম? ডি. এল. রায় বড় শীগ্‌গির চলে গেলেন, পঞ্চাশ বছর পূর্ণ না হতেই—নইলে তাঁরও যথোচিত সমাদর হত বৈকি!

সেদিনকার মত আর কোনও আলোচনা হল না, ওইখানেই ইতি। দু-একদিন পরেই আর একটি অভিনব আবিষ্কারে রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কও বিচলিত হয়ে ওঠে।

মহিমার্ণব তারাপ্রসন্ন ভোরে উঠেই বেশ ফুল্‌কো গরম থালাভর্তি লুচি খেতেন। যদি সম্পূর্ণটা উদরস্থ না হত বাকীটা তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের একটি ডেস্কের দেরাজের মধ্যে রেখে দিতেন। এটি নানা মাস দুই হল অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। ফরাশে বসে লিখবেন বলে পায়াগুলি ছোট, মধ্যস্থলে কাগজপত্র রাখবার গহ্বর, আর ওপর-নীচে দু-ধারেই দুটি করে চারটি ড্রয়ার। যেদিন প্রথম ওই ডেস্ক তৈরি হয়ে আসে, তারাপ্রসন্ন তাঁর নিজস্ব জিনিস রাখবার জন্য একটি ছোট ড্রয়ার চেয়ে নিয়েছিলেন।

প্রাতঃকালীন আহারের অবশিষ্ট লুচি গুড় মিষ্টান্ন আলু পটলভাজা প্রভৃতি পেট-পুজোর ব্যবস্থা একটা কাগজের মোড়কে জড়িয়ে তারাবাবু তার মধ্যে সযত্নে তুলে রাখতেন। শুধু তাই নয়, তাতে আবার চাবি বন্ধ করে দিতেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, চাবিটা তাঁর কোটের পকেটেই থাকত।

তারাবাবু ট্রেজারী বিল্ডিংয়ে তখন কেরানীর কাজ করতেন। অফিস যাবার সময় টিফিনের জন্যে সেই কাগজের মোড়ক পকেটেই পুরে নিয়ে যেতেন, আবার কোনও কোনও সময়ে হয়তো সেটা নিয়ে যেতেন না—কাজেই দু-চারখানা করে বেশ জমে উঠেছিল। সেগুলোকে আর লুচি বলা যায় না—যেন জুতোর সুখতলা। তারাবাবুর কোনও আপত্তি নেই—হোক না দু-তিনদিনের বাসী, হোক না চামড়ার

মত শক্ত আর চিমড়ে। দ্বিপ্রাহরিক জলযোগ তাতেই সুসম্পন্ন হত। বড় নোংরা থাকতেন তিনি—গায়ের দুর্গন্ধ আর দাঁতের খোশবায়ে পাশের লোকের তিষ্ঠানো দায়। তবু তো এখন গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন।

বাড়িতে কারও গোঁফ নেই, তারাবাবুরই বা থাকবে কেন? এই অজুহাতে একদিন শীতলচন্দ্র ও উমাপতি বাজপেয়ী সমবায়ে রীতিমত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ায়, তিনি অগত্যা গুম্ফ বর্জন করে দলে নাম লেখালেন—এইটুকুই যা মন্দের ভাল। এবার গোঁফের ফাঁকে ময়লা-জমানো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার দুর্ভোগ তাঁদের আর পোয়াতে হবে না।

শুধু কি এই? আরও আছে।

আট দশদিন পর হয়তো একদিন কাকস্নান করতেন। সেও একটা দেখবার মত। মাথায় সিকি ছটাক তেল দিয়েই তিনি চৌবাচ্চার ধারে চলে যেতেন। তারপর খুলতেন তাঁর পিরান, একটা নয় দু-দুটো—তার নীচে ফতুয়া, ভীষণ ময়লা; তারও নীচে যে বস্তুটি থাকত, তার নাম হয়তো একদিন ছিল গেঞ্জী, এখন সেটাকে আর চেনাই যায় না—এমনই তেল-চিটচিটে কালো। অনাবৃত হলেই দেখতাম, সেই লোমশ বক্ষের জঙ্গলে অনেক কিছু ময়লা জমে আছে। সময় অসময় জ্ঞান নেই—থাকার কথাও নয়—বিকৃত মুখে দদ্রু কণ্ডূয়ন লেগেই আছে, পারতপক্ষে ওঁর কাছে ঘেঁষতাম না।

মাথায় এক ঘটি জল ঢেলেই তিনি স্নানকার্য শেষ করে ফেলতেন। গা ভিজত না! তারপর আবার যথাক্রমে একটির পর একটি গায়ে চড়িয়ে নিতেন। পরনের কাপড় বদলাতে অবশ্য ভুল হত না।

এখানে তারাবাবুর আর এক কৃতিত্বের কথা না বলে উপায় নেই। তিনি অফিসে নাম রেখেছিলেন শুধু মাস গেলে মাইনে নেবার জন্যে। তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে নিজের চাদরখানা ভাল করে বেঁধে উনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর উপস্থিতির নমুনা। গায়ে-পড়ে নেওয়া বহুলোকের বহুবিধ উদ্ভট কার্যের সুরাহা করে দেবার জন্যে হাজিরা বইতে কোনও রকমে নাম সই করেই "ফিল্ডওয়ার্কে" বেরিয়ে পড়তেন। কেবল ঠিক রাখতেন অফিসের বড়বাবুর যথাসময়ে বাজার করে দেওয়া এবং তাঁর গিন্নী ও ছেলে-মেয়েদের খুঁটিনাটি সুবিধে-অসুবিধের জন্যে সময়বিশেষে চিন্তিত ভাব দেখান—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। হাজার হলেও বিবেকবুদ্ধি দিয়ে পালিশ-করা মানুষ তো! তবে এর জন্যে অন্যান্য কেরানীরা তাঁকে হিংসেও যে না করত তা নয়; কিন্তু

বড়বাবু একটু "ইয়ে" করতেন কিনা—তাই মুখ ফুটে কারও কিছু বলার সাহস হত না। বছরের পর বছর তিনি বহাল-তবিয়তে খোশমেজাজে কেরানীগিরিটা বজায় রেখে চলতেন। এর ওপর নানীর এটা সেটা ফাই-ফরমাশ তো লেগেই আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন না যে, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য তাঁরই লেখার ডেস্কে এই কাণ্ড করে বসে আছেন। একদিন তিনি কী যেন একটা লিখছিলেন—যত সব পিঁপড়ের ব্যাটেলিয়ন ওই টানা থেকে বেরিয়ে তাঁর গায়ে উঠতে চায়, তাঁর খাতা-পত্তরের উপরেও আক্রমণ চালায়। তিনি শশব্যস্ত হয়ে যে দেরাজ হতে ফৌজের আক্রমণ, সেটা খুলতে গিয়ে দেখেন তালাবন্ধ। অগত্যা ভৃত্য গৌরকে ডেকে ওই পিপীলিকাশ্রেণীকে মুছে দিয়ে যেতে বললেন। তাঁর কথা অনুযায়ী সেও ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। তারপরই আবার আর এক দল লালফৌজের কুচকাওয়াজ। সার সার পিঁপড়ের দল এসে নানাকে জালাতন করতে শুরু করে দিল। তিনি মাঝে মাঝে হাত ঝাড়েন গা ঝাড়েন, খাতার উপর থেকে ক্ষুদ্রকায় জীবদের সরিয়ে দেন, তবুও অভিযানের বিরাম নেই। এমন সময় আমার আবির্ভাব। নানার এই অবস্থা দেখে প্রথমটা একচোট খুব হেসে নিলাম। তারপর বলি, তা বুঝি জান না! ওটা যে তারাবাবুর ভাঁড়ার। তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট যত সব বাসী পুরী-মেঠাই রাখবার সিন্দুক।

রামেন্দ্রসুন্দর অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর অসহায় মুখের ভাব দেখে মনে হল যেন তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও এমন অবস্থার সম্মুখীন হন নি।

চাবি কোথায়?

ওই যে কোটের পকেটেই থাকে—এখন আছে কিনা জানি না।

তারাবাবু নানীর কী একটা ফরমায়েশী ওষুধ কিনতে সকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন। কোট সামনেই টাঙানো।

নানা বললেন, দেখ তো চাবিটা আছে কি না!

আমি কারও পকেটে হাত দিই না। গৌরকে ডেকে দিচ্ছি।

সে আসতেই বললেন, ওই কোটের পকেটে যদি কোন চাবি থাকে, নিয়ে এসে এটাকে খুলে দেখ তো কী আছে?

গৌর সব পকেটে হাত চালিয়ে বুক-পকেটে হাত দিতেই বেরিয়ে এল একটা ময়লা সুতো-বাঁধা চাবি আর সর্বদক্রহুতাশনের কৌটো। ওই টানাটা খুলতেই রামেন্দ্রসুন্দরের চক্ষু স্থির। রাশি রাশি পিঁপড়ের দল লুচি-মেঠাইকে ছেয়ে ফেলেছে;

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! তার পরেও কিনা একটা জ্যান্ত আরশোলা তার মধ্যে! ওরে ব্বাবা!

নানা তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত পদে সরে দাঁড়ালেন। গৌরকে ওই উড়ন্ত বাঘ ধরে নীচে ফেলে দিতে বললেন, আর ড্রয়ারটা ভাল করে ধুয়ে মুছে আনতে বলে দিলেন।

এমন সময় তারাপ্রসন্নের শুভাগমন। ঘরে ঢুকেই একটা পেটেণ্ট ওষুধ কিনতে কত যে পরিশ্রম করেছেন তারই কৈফিয়ত দিয়ে বললেন,.ওঃ, জানেন বড়বাবু, কী হয়রানিটাই না হয়েছি এটি সংগ্রহ করতে। ইন্দুমা আজ দু-তিনদিন হল আনতে বলেছেন—চারদিক ঘুরে ঘুরেও পাই নি। আজ বহু কষ্টে একটা ছোট্ট দোকানে কী ভাগ্যে পেয়ে গেলাম।

আর আমারও কী ভাগ্য, তোমার মত এমন গুণধর ছাত্র পাওয়া!—রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা।

তারাপ্রসন্ন মনে করেছিলেন, কত না বাহবা পাবেন, তার বদলে এবম্বিধ উচ্চারণ শুনে প্রথমটা কেমন যেন বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ধরনের অভিনব সম্ভাষণ কেন যে বড়বাবু করলেন, তাঁর মস্তিষ্কে আসে নি। নানা পুনরায় হাত দেখিয়ে বলেন, আমার ড্রয়ারে তোমার এত সব মূল্যবান আসবাবপত্তর না রাখলেই কি চলত না? তোমার কী আক্কেল বুঝি না!

এতক্ষণে বোধগম্য হল কিসের জন্যে গুরুজীর এমন গুরুতর উক্তি! পাশে চেয়ে দেখেন তাঁর পুরী-মণ্ডা রাখার গুপ্ত স্থানটি একেবারে চিচিংফাঁক। সেই শূন্য স্থান যেন দন্তহীন ফোকলা মুখে তাঁকেই বিদ্রূপ করে হাসতে চায়।

এর মধ্যেই গৌর দেরাজ ধুয়ে মুছে সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করে দিয়ে গেল। রামেন্দ্রসুন্দর চাবি লাগিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে সেটা নিজের হাতবাক্সে রেখে বললেন, খুব হয়েছে, এটা আমার কাছেই থাক্।

তারাপ্রসন্ন আমার দিকে চাইলেন—তার অর্থ তুমিই যত সব নষ্টের গোড়া। আচ্ছা, তোমায় দেখে নেব, যাবে কোথায়?

তিনি জানতেন তাঁর এই নিভৃত রহস্যের সন্ধান আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেদিনকার মত সব ধামা চাপা পড়ে গেলেও আমি যে একদিন তাঁর চাপে পড়ব, তা ভাবতে পারি নি।

আমার ব্রাহ্ম পরিবেশে মেলা-মেশাটা কেউ সুনজরে দেখত না, কিন্তু নানার অনুমতি ছিল বলে কারও বাধা দেবার সাহস হয় নি। ব্রাহ্মদের আলোকপ্রাপ্ত

পরিবারে "সুনীতি" "সুরুচি" কথাগুলো প্রায়ই শোনা যেত। বলা বাহুল্য, আমিও তারাবাবু আর পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সেগুলোর যথোচিত সদ্ব্যবহার করতাম—ফলে দুজনেই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলেন। পণ্ডিত নিরামিষ মানুষ, এই চটেন এই পটেন, কিন্তু 'নিপাতনে সিদ্ধ' তারাবাবু যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার—খোঁচা দিতে পারলে ছেড়ে কথা বলেন না।

একদিন কিরণ আসে নি, তার যমজ বোন দীপ্তি একাই এসেছে। অশ্রান্তধারায় বর্ষণ শুরু হল। সারা আকাশখানায় কে যেন বিদ্যুতের চাবুক চালিয়ে যায়—কড় কড় কড়াৎ। বেদনাহত পৃথিবী বুকফাটা আর্তনাদে মুহুর্মুহু কেঁদে ওঠে। সেদিন আর ব্যাডমিণ্টন খেলা হল না।

ঘরে বসেই দুজনে দশ-পঁচিশ খেলছি। খেলা যখন বেশ জমে উঠেছে কী একটা বিষয়ে অনৈক্য হওয়ায় আমি কড়িগুলো হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরতেই দীপ্তি দু হাত দিয়ে আমার কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় ঝটাপটি শুরু করে দিল।

না না, দাও ধীরেনদা, এমন করলে খেলা হবে না।

ঠিক এমনই সময়ে সেখানে তারাবাবু মাথা গলিয়েছেন। আমাদের দেখেই তাঁর মুখে-চোখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল; চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, দাঁড়াও, বড়বাবুকে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই প্রশ্ন করি, এতে আবার বলবার কী আছে?

সেটা বড়বাবুর কাছেই শুনো।

তিনি হনহন করে উপরে উঠে গেলেন।

দীপ্তি অবাক্। আমরা কেউ খুঁজে পেলাম না, কী আমাদের অপরাধ! কিন্তু তবু তার বিচার হল।

তারাবাবু নানার কানে কী বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন জানি না, আমার জরুরী ডাক পড়ল।

তারাপ্রসন্নকে তম্বি করা হয়েছে? আর—হুঁঃ—

কী বলতে গিয়ে নানা থেমে গেলেন। তার পরেই বললেন, আজ থেকে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো বন্ধ।

আমার উপর এই অহেতুক শাস্তির কথা দীপ্তিকে বলতেই তার চোখ ছলছল করে উঠল।

আমাদের বাড়িতে আর যাবে না তুমি? দিদিকে কী বলব তা হলে? মাথা নীচু করে বললাম, বোল, তাঁকে আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু আমার আর যাবার উপায় নেই—নিজেই তো সব শুনে গেলে।

হরদম গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত বলে জয়মঙ্গল সিংয়ের ছুটি হয়ে গিয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রামপ্রসাদ—সে আবার তার চাইতেও এককাঠি সরেস, খুব কড়া প্রহরী। নানার আদেশে তার এবং দামোদরের পাহারায় "গ্রীয়ার পার্কে" ফুটবল খেলতে যাই। গলিটা পার হয়েই সামনে খেলার মাঠ। দীপ্তিদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়, সে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার দিদিও রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে কী যেন একটা করুণ আকুলতা। মাথা নেড়ে আমি হনহন করে এগিয়ে যাই। মনের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠলেও রামেন্দ্রসুন্দরের নিষ্ঠুর নির্দেশ কেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছি ভেবে বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে।

ফেরবার পথেও সেই আকুল আহ্বান : ধীরেনদা, এসোই না একটু, শুধু একবারটি দিদির সঙ্গে দেখা করে যাও।

ধরা গলায় বলি, না।

অভিমানে দীপ্তির ঠোঁট ফুলে ওঠে। কিরণও এক-একদিন হাত ধরে টানাটানি করে, তবু যাই না। কিন্তু কেন?

নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরণের বোনদের সঙ্গে আমাকে খেলতে বারণ করেছ কেন? কী করেছি আমি? তারা রোজ আমাকে তাদের বাড়িতে ডাকে, তোমার আদেশে যাই না, তাই কিরণও আর আমাদের বাড়িতে খেলতে আসে না। পরিচিত কেউ ডাকলে, না যাওয়াটাই কি অসভ্যতা নয়?

আজকাল অনেক প্রশ্নই তোমার মনে আসে, সবগুলোর জবাব এখুনি পাবে না। তবে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়াটা এখন স্থগিত।

ফর্মান জারী করেই নানা নানা পুঁথির পাতায় চোখ রাখলেন।

"মালাই-বর-অ-অ-অফ"—লম্বা টান দিয়ে বেশ গোল-গাল সুরে হাঁক দিয়ে যায় ফেরিওয়ালা।

সন্তোষের দীর্ঘ মূর্তি ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাড়ির সামনে দেখা দিল। এসেই

আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ : যা করেছি ভাই—কিছু মনে করিস নি, আমায় ক্ষমা কর্।

আমার ক্ষমতার বাইরে। যদি নানা আর পণ্ডিত মশাই তোকে ক্ষমা করে, আমার কিছু বলার নেই।

বরফওয়ালা কাছে আসতেই সন্তোষ ডেকে বলল, তোর কাছেই তো আমি রোজ খাই না রে বন্ধু? একটু পরেই আবার আসিস তো এদিকে—কুলপি নেব।

বাঁধা খদ্দেরের সন্ধান পেয়ে ফিরিওয়ালা পুলকিত হল কিনা জানি না, কিন্তু সন্তোষের মুখে দেখলাম হাসি আর ধরে না।

তারপরই পাকা থিয়েটারী ভঙ্গীতে পণ্ডিত মশায়ের ঘরে ঢুকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সন্তোষ সন্তোষ-চিত্তে নানার কাছে উপরে উঠে গেল। তাঁর পা জড়িয়ে ধরেই অনুনাসিক স্বরে বলতে থাকে, পণ্ডিত মশাই আমাকে ক্ষমা করেছেন, আপনি অনুমতি না দিলে ধীরেন আমার সঙ্গে কথাও বলবে না, খেলতেও চাইবে না। দয়া করে এবার আমায় ক্ষমা করুন।

কিসের ক্ষমা—কী ব্যাপার? প্রথমটা নানা কিছুই মনে আনতে পারলেন না। তা ছাড়া তিনি যে প্রকৃতির লোক—তাঁর খেয়াল থাকবার কথাও নয়।

আমি স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি বিরূপ হয়ে উঠলেন, না, সে হবে না, তুমি বড় দুষ্টু ছেলে।

কী সুনিপুণ অভিনেতা এই সন্তোষ। টপটপ করে তার চোখের জল নানার পায়ে গড়িয়ে পড়ে। সহজ সরল রামেন্দ্রসুন্দর ভাবলেন, কৃতকর্মের জন্যে সত্যি বুঝি ছেলেটি অনুতপ্ত হয়েছে। তামাকের নলে টান দিয়ে বললেন, মাস্টার-পণ্ডিতকে অসম্মান করাও যা, নিজের বাপকে অপমান করাও তাই। মাস্টারের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তোমরা শুনে রাখ :

কান্দী স্কুলে যখন পড়ি, আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন হরিমোহন সিংহ। অনেক দিন পরে, তখন আমি রিপন কলেজে কাজ নিয়েছি। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেই শুনলাম, তিনি বিশেষ অসুস্থ। আমি তখুনি বেরিয়ে পড়লাম তাঁকে দেখতে। বাড়ি কাছেই। গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি তাঁর পদসেবা শুরু করেছি, এমন সময় চোখ মেলে আমাকে দেখেই যেন আঁতকে উঠলেন : কর কি, কর কি রাম? আমি যে কায়েত, তুমি যে ব্রাহ্মণ—পায়ে হাত দিতে নেই।

পূর্বস্মৃতির কথায় রামেন্দ্রসুন্দর তন্ময়, আমি তাঁকে সচকিত করে তুলি : তারপরে কী হল, তাই বল।

নানা বলে যান : আমি তাঁকে হাতযোড় করে বললাম, এখানে বামুন-কায়েতের কথা আসে না, আমি ওই ধরনের যুক্তি মেনে চলতে পারব না মাস্টার মশাই। তা ছাড়া আপনি আমার গুরু, আমি ছাত্র। এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

নানার কাছেই শুনলাম, প্রিয় ছাত্রের মুখে এই কথা শুনে হরিমোহনবাবু কেঁদে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মাথায় হাত দিয়ে তাঁর প্রাণভরা আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন।

আমি স্থির হয়ে শুনছিলাম। সন্তোষের মনে কোনও আঁচড় কেটেছিল কিনা, কে জানে! নানা কিছুক্ষণ থেমেই সন্তোষকে বললেন, আচ্ছা যাও বারান্তরে আর কোর না।

তখুনি রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসেই সন্তোষের দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ। একটু আগেই তার চোখে যে বর্ষা নেমেছিল, তার কোনও নামগন্ধ নেই। সন্তোষের সঙ্গে আমিও নীচে নেমে এলাম। আবার সে পণ্ডিত মশায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজানো ছিল, তিনি নেই।

পণ্ডিত মশাই দু বেলাই স্নান করতেন। রাত্রের রান্না সন্ধ্যার পূর্বেই সেরে ঢাকা দিয়ে রাখতেন। সন্তোষ ঘরে ঢুকেই আবার আধ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল, দেখলাম চোখে মুখে স্ফূর্তির জোয়ার। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কই রে, পণ্ডিত তো নেই ?

কেন, আবার কী দরকার ?

তাঁকে বলতে চাই, তোর নানাও আমাকে খুশী মনে ক্ষমা করেছেন।

পণ্ডিত মশাইকে এখন পাবি না। তিনি গামছা পরে স্নানে গিয়েছেন।

যাক গে, আর দরকার নেই, আমার কার্য শেষ!

সন্তোষের কথার ধাঁচে এই মনে হল যে, নানার ক্ষমা করার কথাটা তাঁকে আর না বললেও চলে।

এদিকে স্নান সেরে এসেই পণ্ডিত মশাই তাঁর শতচ্ছিন্ন মটকার কাপড় পরিধান করে আহ্নিকে বসলেন।

ঠিক এমনি সময় কুলপিওয়ালা ফিরে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ডানা মেলে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে।

সন্তোষের চোখে-মুখে কথা : ওরে কখনও কুলপি বরফ খেয়েছিস ?

না। খেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু নানার বিনা হুকুমে ছোঁবার উপায় নেই। রাস্তার জিনিস—তাই—

সন্তোষ আমার গায়ে ঠ্যালা দিয়ে ঠাট্টা করেঃ আহা, কী সুবোধ বালক রে! ইচ্ছে হয় তোর কথাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি, আর তোকেও কাঁচের শো-কেসে সাজিয়ে রেখে দিই। ক্যান্ র‍্যা, রাস্তার জিলিপি কি তোর নানা কিনে দেয় না?

আচ্ছা, একটু দাঁড়া। একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

তাই যা, এক্কেবারে যেন কলির যুধিষ্ঠির!

তার টিপ্পনীতে কর্ণপাত না করে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে গিয়ে সটান বললাম, নানা, মালাইবরফ খাব, পয়সা দাও।

নানা মাথা নেড়ে বলে যান, বাজে দুধ দিয়ে ও-সব তৈরী, খেয়ে কাজ নেই। আচ্ছা, তোমার যখন এতই ইচ্ছে, আজকের মত খাও, আর কক্ষনো খাবে না।

শুধু আমি নই, সন্তোষ আর দুম্বাকে নিয়ে আমরা তিনজন।

বেশ, এই নাও তিন টাকা।

সেটি পকেটজাত করে লাফিয়ে সন্তোষের কাছে ছুটে এসেই বগল বাজিয়ে বলি, হুকুম পেয়েছি, আজ প্রাণ ভরে মালাই খাওয়া যাক—কি বলিস?

সে আর বলতে! কালই অর্ডার দিয়ে রেখেছি। খেয়ে দেখিস, কেয়া মজাদার!

আমরা সবাই তোড়জোড় করে সিঁড়ির উপরেই এক একটা চীনেমাটির প্লেট নিয়ে বসে গেলাম।

এমন সময় দেখি মূর্তিমান তারাপ্রসন্ন। আমাদের সমস্ত কার্যকলাপেই এঁর উন্নাসিক ভাব। গেটে ঢুকেই আমায় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, কি, বিহার শেষ করে আহার চলছে বুঝি। দাঁড়াও, প্রহারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। বড়বাবুকে লুকিয়ে কুলপি খাওয়াটা বাছাধনকে টের পাইয়ে দেব।

তার প্রয়োজন হবে না। নানার অনুমতি নিয়েই খাচ্ছি। অতএব তাঁকে জানানো মানেই ভস-স-স্মে ঘি ঢালা। তা হলেও একবার প্রচেষ্টা করে দেখুন না, কী হয়!

টাট্টু ঘোড়ার মত ঘাড় ঘুরিয়ে তারাবাবু তড়বড় করে উপরে উঠে গেলেন। কুলপিওয়ালা তার ময়লা কাপড়-বাঁধা হাঁড়িটা সযত্নে খুলে এক একটি টিনের চোঙা বের করে আমাদের থালায় কুলপি ঢেলে দেয়। দেখে মনে হল কত না যত্নে এক

একটি সাত রাজার ধন মানিক বের করে আমাদের দিয়ে ধন্য করে চলেছে। সবারই পাতে সাদা মালাই, আর আমার বেলায় সবুজ রঙের কুলপি কেন! এর কারণ অনুসন্ধান করায় সন্তোষ বুঝিয়ে দিল—ও যে পেস্তা দেওয়া কড়া কুলপি, খেয়েই দেখ্ না কেমন লাগে!

সন্তোষের মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছিল কিনা সেটা তখন লক্ষ্য করবার অবসর ছিল না।

সে সময় দু আনা করে ছোট আর চার আনায় বড় কুলপি পাওয়া যেত। তিন টাকায় এক একজনের ভাগে বেশ বড় বড় কুলপি চারটে করে নেওয়া হল। মনের আনন্দে খেয়ে গেলাম। দু-এক ফোঁটা সিঁড়ির ওপর পড়তেই দুম্বা সেটা উঠিয়ে চেটে নেবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়, আমি তাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করি। সন্তোষের পকেটে একটা আধুলি ছিল, সে আরও দুটো আমাকে খাইয়ে দিল। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে উদরসাৎ করে ফেলি।

কুলপিওয়ালা বিদেয় হতেই কিছুক্ষণ পরে আমার মাস্টারও এসে পড়লেন, আমিও তাঁর সঙ্গে পাঠকক্ষে প্রবেশ করলাম। সেদিন ম্যাথমেটিক্সের দিন, অঙ্ক কষা আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরেই মাথা যেন ঝিমঝিম করতে শুরু করে। মনে হল, ম্যাথমেটিক্স তো নয়—যেন মাথামাটি। আমার ঝিমিয়ে পড়া ভাব দেখে মাস্টার মশাই আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হেসে উঠলাম—সে হাসি আর থামতে চায় না। মনে হল কে যেন আমায় উপরে তুলে ধরে আবার ধপাস করে মাটিতে ফেলে দেয়। মাস্টার মশাই তাড়াতাড়ি উঠে রামেন্দ্রসুন্দরকে ডেকে আনতেই নানা অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই তাঁর কণ্ঠে যেন বাজ পড়ার শব্দ হল: কী হয়েছে তোমার, ঠিক করে বল?

মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না, হেসেই চলেছি।

নানার গলা ফাটানো চিৎকার শুনে দুম্বা উপস্থিত। নানীও ছুটে হাজির হলেন, দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়েই সচকিত প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে?

কে উত্তর দেবে কী হয়েছে?

যাই হোক, নানা এর ওর তার কাছে জিজ্ঞেস করে শেষটা দুম্বাকে পাকড়াও করলেন। মাস্টার মশাই নানাকে বুঝিয়ে দিলেন, নিশ্চয়ই সিদ্ধির কুলপি খাওয়ার ফলে ওর এই অবস্থা!

রামেন্দ্রসুন্দর অবাক্। কুলপি বরফের মধ্যেও যে আবার সিদ্ধি মেশানো থাকে, সেটা তাঁর ধারণার বাইরে।

নানী তাড়াতাড়ি বড় পাথরের বাটিতে তেঁতুল গুলে আমায় খাইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। মাথায় জল ঢেলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রত্যুষে রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং এসে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমায় বললেন, এদিকে শুনে যাও।

ঝটপট উঠে তাঁর সঙ্গে নানীর কাছে গেলাম।

কাল কী কুলপি খেয়েছিলে জান?

না। কেন যে মাথা ঘুরে উঠল, তাও জানি না।

আমি সব খবর নিয়েছি, জেনেশুনে তুমি সিদ্ধির কুলপি খাও নি? যাক, আজ থেকে সন্তোষের সঙ্গে আর কক্ষনো মিশবে না, কথাও বলবে না, বুঝলে?

কাঁদো কাঁদো হয়ে উত্তর দিলাম, ও আমায় নেশা খাইয়েছে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলা দূরে থাক্, ওর মুখও দেখব না।

ডুম্বা খবর দিল, কাল এদিকে তোমার তো এই অবস্থা, ওদিকে পণ্ডিত মশাই খেতে বসে ঢাকনা খুলেই দেখেন, থালার ওপর কাঁচা মুরগীর মুণ্ডু।

অ্যাঁ, বলিস কি রে?

তুমি পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করেই দেখ। কাল তিনি গোবর-জলে ঘর নিকিয়ে গোবর খেয়ে বিড়বিড় করে কী সব মন্তর আউড়ে প্রাচিত্তির করেছেন—শেষটায় গৌরের ঘরে শুয়ে রাত কাটালেন। কলকাতায় এসে তাঁর নাকি জাত জন্ম সব গেল।

বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে খেলে গেল, ও, সন্তোষ কাল এইজন্যেই বুঝি পণ্ডিত-মশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিল! আচ্ছা ধুরন্ধর ছেলে যা হোক। সেই যে শাসিয়েছিল, তোকে আর তোর ওই হাড়গিলে পণ্ডিতকে দেখে নেব—এই বুঝি তার সেই প্রতিজ্ঞা পালন! নানা যে সেদিন সন্তোষকে এতগুলো উপদেশ দিলেন—একটি কথাও কি তার কানে ঢোকে নি? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী!

একদিন উপর্যুপরি দুটো ঘটনা ঘটে গেল। সকালে সবেমাত্র মাস্টার মশাই আমাকে পড়িয়ে বিদেয় হয়েছেন, দেখি এক আতরওয়ালা এসে নিবারণ পণ্ডিতের

কাছে অনর্গল কী সব বক্তৃতা চালিয়েছে। সামনে আমাকে দেখে, সেই আতর-বিক্রেতা পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি অপূর্ব হিন্দী-বাংলার জগাখিচুড়ি ভাষায় আমার পরিচয় দিতে শুরু করেছেন।

কাছে আসতেই আতরওয়ালা দীর্ঘ সেলাম দিয়ে বলল, আপ মহারাজকুমার কি সাহেবজাদা হ্যাঁয় ?

রুখে বললাম, কেয়া বোলা ? হারামজাদা ?

পণ্ডিত মশাই বুঝিয়ে দিলেন, সাহেবজাদা বলেছে, তার অর্থ—নবাবপুত্তুরকে ওরা ওই কথা বলেই ডাকে কিনা !

কই, আমি তো নবাবপুত্তুর নই।

ওদিকে আতরওয়ালা তুলোয় আতর মাখিয়ে একটা কাঠিতে বেশ ভাল করে জড়িয়ে আমার হাতে দিল। মুখে তার অনর্গল উর্দু কথার তোড়।

আমাকেও একটা উত্তর দিতে হবে তো ! ভাষার ব্যুৎপত্তি নেই, কী করি ? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম, দেরা গাজী খাঁ—দেরা ইস্মাইল খাঁ—

তারপরই সটান অগ্রসর—দশ-বিশ পা এগিয়ে আবার পেছন ফিরেই দেখি, আতরওয়ালার বিরামহীন বক্তৃতা এক নিমেষেই স্তব্ধ। বিস্ময়-বিস্ফারিত সুরমাটানা চোখ দুটি আমার প্রতি নিবদ্ধ। আর দাঁড়ালাম না, সোজা অন্দরে চলে গেলাম।

ঘুরে ফিরে নানার কাছে আসতেই দেখি, আতরওয়ালা রামেন্দ্রসুন্দরের দরবারে হাজির হয়ে আতরের অমোঘ উপকারিতার সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের কানে তার এই হিতোপদেশ ঢুকছিল কি না বোঝা গেল না। তবে একটি কথা বলতে শুনলাম, নেই মাংতা।

আমি তো জানি, রামেন্দ্রসুন্দর নিজে কখনও সেণ্ট বা আতর ব্যবহার করা দূরে থাক্, বাড়িতেও ওসবের প্রবেশাধিকার ছিল না। আতরওয়ালাকে সান্ত্বনা দিলাম : হিঁয়াপর আনাও যা সাহারা মরুভূমি মে যাকে চিল্লানা একই বাত—বুঝতে পাত্তা হ্যায় ?

রামেন্দ্রসুন্দর নাতির এবম্বিধ হিন্দী ভাষার দখল শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। হো হো শব্দে হেসে উঠেই আমার হাতে আতরের তুলো জড়ানো কাঠি দেখতে পেয়ে বললেন, ওটা ফেরত দিয়ে দাও।

আদেশ অনুযায়ী সেটা তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করলাম।

সে বিদায় হতেই আর একজন নবাগতের প্রবেশ। মাথায় বৃহৎ পাগড়ি, চোখে ফাটা কাঁচের চশমা। এসেই হিন্দীভাঙা বাংলায় বললেন, আপনি খুব বিদ্‌ওয়ান বেক্তি আসেন, আপনার নাম শুনিয়েসি, একবের হাতঠো দেখবো।

বগলদাবা ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো পুথি-পত্তর ফরাশে রেখেই নানার হস্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বাক্স খোলাই থাকত। তক্ষুনি একটি টাকা বের করে বললেন, মাফ করবেন, আমি ওসব বিশ্বাস করি না। টাকাটি নিয়ে অব্যাহতি দিন, আমার কথা বলবার সময় নেই।

তখনই সেটা পকেটস্থ করে জ্যোতিষী বললেন, আপনার ভালই হুবে—বলিয়ে দিয়ে যাসসি—শুনিয়ে রাখেন। তেবে আপনার সন্তান স্থানে রিষ্টি আসে।

ললাটে রক্তচন্দন-শোভিত গণৎকারকে বললাম, হাত না দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী! ভালই হুবে তো বললেন, আবার ফাঁড়া আছে বলতেও কসুর করলেন না। এইটেই বা কোন্‌দেশী ভাল বুঝলাম না!

তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখে ভাবলাম, বুঝি মনে মনে তিনি ভৃগুসংহিতা মন্থন করে চলেছেন। ক্ষণকাল পরেই মাথা তুলিয়ে বললেন, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? যদি হামাকে দিয়ে কোনও ক্রিয়াকাণ্ড করাইতে পারেন, তা হলে হয়তো কিছুটা ভাল ফল হোইলেও হোইতে পারে।

প্রয়োজন নেই, আপনি এখন আসুন।

বাইরে আসতেই তাঁকে আবার পাকড়াও করলাম: এবার আমার সম্বন্ধে দু-চারটে বোল ছাড়ুন তো, ভবিষ্যৎ এক্কেবারেই ফরসা, না, কিঞ্চিৎ ভরসা আছে?

বিশেষ কিছু প্রাপ্তিযোগ হল না—তাই তাঁর মনমেজাজ খারাপ। আমার প্রতি একটি অগ্নিময় দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করেই তিনি পথ দেখলেন। ফিরে এসেই দেখি, নানা বইয়ের পাতা মুড়ে খোলা জানলার ফাঁকে অনেকক্ষণ মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। জ্যোতিষীর কথা তাঁর মনে কোনও আলোড়ন তুলেছিল কি না কে জানে?

তক্ষুনি অন্দরে গিয়ে নানীকে সব খুলে বলতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে বাইরে ছুটে এলেন। তখন অবশ্য নানার কাছে কেউ ছিল না। আমিও পশ্চাতে। দেখলাম, নানা তখনও ঠিক ওই অবস্থায় গুম হয়ে বসে আছেন।

উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে নানী জিজ্ঞেস করেন, কী সব শুনলাম, সত্যি ?

এরই মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে গেছ ? খোকার কাণ্ড নিশ্চয়ই ! ওসব কিছু না। ওরা সব বাঁধিগৎ আউড়ে থাকে। মিছিমিছি মনকে দুর্বল করতে নেই।

সে তুমি যাই বল, একেই তো গিরিজার শরীর ভাল যাচ্ছে না—কী সব শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা বলেছে নাকি ?

নানার শেষ মন্তব্য : সে তুমি যা হয় করাও। জানই তো, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।

মুখে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বটে, কিন্তু জ্যোতিষীর বলে যাওয়া কথাটির পুনরুক্তি করে বললেন, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে !

ফলিত জ্যোতিষে নানার বিশ্বাস না থাকলেও, আগন্তুক জ্যোতিষীর বচন বোধ হয় তাঁর মনে কিছু প্রতিক্রিয়া এনেছিল। তাই কিছুদিন পরেই তিনি কটক কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের কাছে তাঁর নিজের কোষ্ঠীর বিচার করতে পাঠিয়ে দিলেন। গণনাফল সমেত উত্তরও এল বটে—তবে সেই জ্যোতিষীর বলে যাওয়া কথার সঙ্গে তার অনেকটা মিল ছিল।

আর একদিনের কথা।

একদিন রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেদিন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হবে। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে এসেছেন, চোখে কালো ফিতে বাঁধা সুন্দর পাঁশনে চশমা। আমি তাঁর পাশেই বসে আছি আর অন্য পাশে রামেন্দ্রসুন্দর। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম। দ্বিতলে তিলমাত্র স্থান নেই। যতদূর মনে আছে, পরিষদের সভ্যেরাই এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

উপরের প্ল্যাটফরমে যেখানে বক্তারা উঠে প্রবন্ধ পাঠ করতেন বা বক্তৃতা দিতেন, সেখানেই অভিনয় শুরু হল। বিশেষ লক্ষ্য করলাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির রূপদান কে কী রকম করেছে সেইটেই দেখে চলেছেন। চোখে পলক পড়ে না, একটু নড়েচড়ে বসার নাম নেই—যেন হিমাদ্রির মত অটল স্থির।

সামনে কৃষ্ণ যবনিকা পড়ে গেল। কে একজন এসে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, অভিনয় কেমন লাগছে ?

আমি তাঁর হয়ে উত্তর দিয়ে বসলাম, ভাল না, দরদ নেই—যেন প্রাণহীন। কেদার ভাল করতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে মৃদু হাস্য করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর নীলচক্ষু ঘুরিয়ে বললেন, খুব সমঝদার হয়েছ দেখছি। অতঃপর নাট্য-পরিচালনার ভার তোমাকে না-হয় দেওয়া যাবে!

রবীন্দ্রনাথ এবার মুখ খুললেন: শ্রীমান্ ঠিকই বলেছে, সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পেলাম।

সগর্বে আমি একবার নানার মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম, তাঁর চোখে মুখে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা পাশাপাশি খেলা করছে। যে ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে গ্রীবা বাড়িয়েছিলেন, তিনি আর এক মুহূর্তেও সেখানে দাঁড়ালেন না।

আবার এখানেই একদিন দেখেছিলাম বাগ্দেবীর বরপুত্র রামেন্দ্রসুন্দরের সলাজনম্র মূর্তি। তাঁর পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এক সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিনন্দিত করে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর অন্যতম সহকারী ছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—ইনি চটপট করে হাঁটেন, তড়বড় করে কথা বলেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিনন্দনপত্রখানি রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে অর্পণ করলেন। চাঁদির ফলকে খোদাই করা চারদিকে সোনার গোলাপপাতায় সাজান। মখমলের বাক্স করে দেওয়া হয়েছিল, বেশ মনে আছে।

বোলপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, সঙ্গে এন্‌ড্রুজ সাহেব। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন দিয়ে স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত অভিনন্দন পাঠ করলেন।

এরপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নানাকে চন্দন মাখিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিতেই একে একে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দসরস্বতী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের নিজের কবিতা পাঠ করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফীও কবিতা পড়লেন। তারপরই অসুস্থ রামেন্দ্রসুন্দর উঠে রুদ্ধকণ্ঠে সামান্য দু-চারটি কথা না বলে আর পারলেন না। কনিষ্ঠ দুর্গাদাস ত্রিবেদীকে তাঁর লিখিত ভাষণ পড়বার ভার দিলেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সভায় যোগদান করতেই সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল। তিনি নানাকে আশীর্বাদ ও তাঁর অসংখ্য গুণকীর্তন করে বললেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্দ্রজীবনের আর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। দুর্বল শরীরে রামেন্দ্র-সুন্দর উৎসাহের আবেগ সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সম্মান, এই বিপুল সম্বর্ধনায় তাঁর কত সংকোচ! মুখে

তাঁর সেদিন এই ভাবটাই প্রকাশ পেয়েছিল যেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্য নয়, যে সাহিত্য-পরিষদের সেবা তিনি আজীবন করে এসেছেন এ অভিনন্দন যেন তারই স্বীকৃতি। কত দ্বিধা, কত কুণ্ঠা, কতই বিনীত সৌজন্য তাঁকে যেন "তৃণাদপি সুনীচেন" করে তুলেছে। প্রতিভাদীপ্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সেই অপার্থিব মুখচ্ছবি আমি আজও ভুলতে পারি নি।

এই উপলক্ষে নানার নগদ প্রাপ্তি হল একটা সোনার কলম, পেন্সিল—একটার এক দিকে সোনার ছুরি, অপর দিকে কাগজ-কাটা চেয়াড়ি আর একটা সোনার দোয়াত। বাড়িতে নিয়ে আসার পর আমি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম, নানী তাড়াতাড়ি সিন্দুকে তুলে রাখলেন।

নানাকে বললাম, নানীকে ওটা বের করে দিতে বল, আমি ওতে সবপ্রথম একটা কিছু লিখে ফেরত দিয়ে দেব।

কী লিখবে ?

কাল যা দেখলাম, তারই বিবরণ! ওটা দিয়ে তোমার সম্বন্ধে কিছু না লিখলে ও জিনিসের কোনও মূল্যই নেই।

আচ্ছা, তাই হবে।

একদিন সেই দোয়াতে নানী কালি ঢেলে দিয়ে বললেন, সোনার দোয়াত-কলমে লেখবার উপযুক্ত হও, তবেই তোমার নানার আনন্দ—নইলে যা-তা আঁচড় টানলে কী হবে ?

আচ্ছা, দেখই না কী লিখি !

আমি নানার সেই অভিনন্দন-উৎসবের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে উপসংহারে লিখলাম, 'রচনা-সমৃদ্ধ সোনার দোয়াত কলম সাদরে নানা ও নানীর যুগ্ম করকমলে প্রত্যর্পিত হইল।'

রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান ও ধারণাই ছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্। এরই মধ্যে তিনি তাঁর সমগ্র সত্তাকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তাঁর বুকের রক্তে এই মন্দিরের ইটের পর ইট গাঁথা হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য, বাংলার পুরাতত্ত্ব, বাংলার ইতিহাস, বাংলার পুরাবস্তু, বাংলার অবদান— এক কথায় বাঙালীর প্রাণ তাঁর ধ্যানের সামগ্রী ছিল। জীবনের সাধ আহ্লাদ, আশা আকাঙ্ক্ষা,

ঐহিক ও পারলৌকিক লক্ষ্য এই সাহিত্য-পরিষদেই জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ করে তিনি তাঁর সঙ্কল্পকে রূপ দিতে চাইলেন। একদিকে থাকবে একটি পুস্তকালয়, সেখানে বাংলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হবে, হাতে লেখা প্রাচীন পুথি বাংলার নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে আনা হবে। আর একদিকে থাকবে বাংলার পুরাতত্ত্বের উপাদান—যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, যে তাম্রলিপি, শিলালিপি, প্রাচীন সভ্যতা ও ভাস্কর্যের নিদর্শন—বাংলার পুরনো রাজধানীগুলোর আলোকচিত্র এই সব সেই বিভাগে সযত্নে সংরক্ষিত হবে।

এই কাজে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বদাই ডুবে থাকতেন। নিজের মনের রসেই নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে নিত্য নূতন প্রেরণার পথে তিনি এগিয়ে যেতেন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি তাঁর কাছে প্রায়ই আসতে। সংগৃহীত পুরাতত্ত্বের জিনিসগুলি দুজনে মিলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন, তাম্রলিপি বা শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সে কী গভীর আগ্রহ, সে কী অদ্ভুত নিষ্ঠা! হস্তলিখিত বহু মূলবান দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং অনেকগুলো তাম্রলিপি, শিলালিপি, পুরাকালের প্রস্তর মূর্তি ও মুদ্রা, আমার ঠাকুরদা মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ আমাদের লালগোলার লাইব্রেরি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে প্রায়ই পাঠিয়ে দিতেন, আমিও সেগুলো অবাক হয়ে নেড়েচেড়ে দেখতাম। এগুলো নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং সেগুলি যথোচিতভাবে পরিষদ্-ভবনে রক্ষা করবার ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরদা এ বিষয়ে এক রকম মুক্ত হস্তেই সাহায্য করেছিলেন, তাঁর অর্থেই তাঁরই সংগৃহীত কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সংগৃহীত রসসাগর 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হল। মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের বৈশিষ্ট্যই ছিল—শুভস্য শীঘ্রং। একবার কোনও ভাল কাজ তাঁর মনে এলে আর উপায় ছিল না—যতক্ষণ না সেটা শেষ হয় ঠাকুরদার চোখে ঘুম আসত না। 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' পুস্তকের সম্বন্ধেও সেই একই ব্যাপার।

রামেন্দ্রসুন্দর 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুমে'র তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে বিস্তর লিখেছেন, তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম :

"মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের নামমাহাত্ম্যে ওই গ্রাম আজি বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ। ওই ক্ষুদ্র গ্রামে রাজা বাহাদুরের লাইব্রেরীতে অনেক মহামূল্য ও দুর্লভ ছাপা বহি ও হাতে

লেখা পুথি ছিল। রাজাবাহাদুরের দানযজ্ঞ কতকটা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের মত। ওই লাইব্রেরীটি এখন প্রায় আলমারি-মাত্র-শেষ হইতে বসিয়াছে। আমি যখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম, মাঝে মাঝে পুস্তকের পুঁথির বোঝা আমার নিকট আসিত। সাহিত্য-পরিষদে অর্পণের জন্য একদিন একখানি বৃহৎ পুস্তক আসিল—সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম।...

সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম গ্রন্থখানি দানের পর রাজাবাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, গ্রন্থখানি পুনঃপ্রচার করিতে হইবে।...সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করিবেন। তাঁহার আদেশে আমার হৃৎকম্প হইল, এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডের ভার লইতে আমার সাহসে কুলাইল না। জীবনে অনেক অনধিকার চর্চা করিয়াছি, কিন্তু সঙ্গীত-বিদ্যা চিরকাল আমার অধৃষ্য হইয়া আছে। আমি কর্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না; মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরের একটা স্বভাবগত বিশিষ্টতা আছে, হঠাৎ একটা সাধু সঙ্কল্প তাঁহার মনে আসে, আপনা হইতেই মনে আসে, যতক্ষণ সেটা কাজে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাঁহার শান্তি হয় না, বোধ করি ঘুম হয় না।

আমার নিকট সাহিত্য সম্বন্ধে ও সাহিত্য-পরিষদ্ সম্বন্ধে তাঁহার যে পত্ররাশি আছে, তাহাতে পদে পদে সেই পরিচয় পাইয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। সাহিত্যে তাঁহার যেমন অনুরাগ, সঙ্গীতেও অনুরাগ প্রায় তত্তুল্য; তাঁহার ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ দেখিয়া অগত্যা বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বসুর শরণ লইলাম।...গ্রন্থখানি ছাপিতে রাজা বাহাদুরের বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে—রাজা বাহাদুর অকাতরে এই অর্থাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলির মত বীণা-পুস্তক-ধারিণী বাণীর চরণকমলে উৎসর্গ করিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির সমুদয় স্বত্বও রাজা বাহাদুর তাঁহার চিরপ্রিয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অর্পণ করিয়াছেন।”

একদিন দেখলাম, রামেন্দ্রসুন্দর একটি পত্র হাতে নিয়ে আপন মনেই হাসছেন। আমি ঘরে ঢুকে তাঁর হাস্যসুন্দর মুখের দিকে চেয়েই বলে উঠলাম, কী হয়েছে নানা? মুখে যে হাসি ধরে না?

নানা চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে পড়তে বললেন।

চির পরিচিত হস্তাক্ষর দেখেই বললাম, এ যে রবিবাবুর চিঠি। ও, এবার বুঝেছি, সেইজন্যেই এত হাসিখুশি! পত্রে লেখা আছে:

ওঁ শিলাইদহ

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই। ইতি ২৬শে বৈশাখ, ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিখানা পড়েই আপসোস করে বললাম, আহা, একদিন আগে লিখলেই তো জন্মদিনের চিঠি হত!

সে দুঃখ করে লাভ নেই। গরমের ছুটি হয়েছে, তুমি কাল লালগোলায় যাচ্ছ, আমি একখানা চিঠি দেব, তোমার দাদুর হাতে দিয়ো আর মুখেও বোল তাঁর একখানা ছবি যেন রবিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানা সঙ্গে দেবে না?

না, ওটা আমার কাছেই থাক্, আমার পত্রের সঙ্গে এর একটা নকল পাঠিয়ে দেব।

বেশ, তাই দিয়ো।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি এলেই নানা আলাদা করে রাখতেন, কারও হাতে দিতেন না। মনে পড়ে, বহুদিন আগে এই রকম একটা চিঠি এসেছে, নানাও পড়ে খুব খুশী, তাড়াতাড়ি একখানা সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা খুঁজে এনেই আবার তার মধ্যে ডুবে গেলেন। উঁকি দিয়ে দেখলাম, নানারই লেখা "ধ্বনি বিচার" নামে একটি রচনা। দু-এক লাইন পড়তে গিয়ে কিছুমাত্র বোধগম্য হল না, নানার কাছে রবিবাবুর পত্রখানা একবার দেখতে চাইলাম, তিনি বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, আমার হাতে পত্রখানা দিতেই আমি গোগ্রাসে গিলে চললাম।

"ধ্বনি বিচার পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

এই পর্যন্ত পড়েই থেমে গেলাম। পত্রটি নানার সামনে ধরেই তর্জনী দিয়ে পরবর্তী লাইনটি দেখিয়ে দিলাম—"তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম…আমি এতটা

পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম।...”

এতক্ষণে নানার হুঁশ হল, তিনি চিঠিখানা আমার হাত থেকে এক রকম ছোঁ মেরেই কেড়ে নিলেন, তারপর একটি আওয়াজ শোনা গেল, ব্যস্!

চিঠিখানা দেরাজে বন্ধ করে রাখা এবং আমাকে বিদায় দেবার আদেশ একসঙ্গেই জারী হয়ে গেল।

আমি লালগোলায় এসেই দাদুকে প্রণাম করে পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, রবি ঠাকুর তোমার ছবি চেয়েছেন, নানাও বলেছেন, একখানা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

ততক্ষণে দাদুর চিঠি পড়া শেষ হয়েছে, পত্রখানি বুকপকেটে রেখে দিয়ে বললেন, তোমার কী ইচ্ছে?

ওরে ব্বাবা, ওসব বড় বড় কথায় আমি নেই, তবে জিজ্ঞেস যখন করলেই তখন বলি ছবি পাঠান উচিত নয়।

দাদু কিছুক্ষণ চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন বল তো?

ছবি পাঠানোটা আত্মপ্রচার ছাড়া আর কি? ওসব আমার ভাল লাগে না।

উৎফুল্ল হয়ে দাদু আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছ, আমি এমন কী মানুষ—আমার ছবি শান্তিনিকেতনে টাঙিয়ে রাখতে হবে? রবিবাবু আমাকেও অনেকবার লিখেছেন, আমি সে বিষয়ে কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছি। আমি কি রাজা রামমোহন, না, বিদ্যাসাগর?

তা হলে তোমার যা মন্তব্য নানাকে জানিয়ে দাও, আমিও তোমার সঙ্গে যা কথা হল সমস্তই লিখে দিচ্ছি।

লালগোলায় নিরাপদে পৌঁছনোর সংবাদ দিয়ে নানাকে সব খুলে লিখলাম, তার জবাবও এল। লালগোলায় গরমের ছুটিটা কি ভাবে কাটাই তার বিবরণ নানা লিখে রাখতে বলেছেন, কলকাতায় গিয়ে দেখাতে হবে। গঙ্গাধর মাস্টার মশাই সঙ্গেই আছেন, লেখাপড়ায় যেন কোনও ত্রুটি না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সবশেষে লিখলেন:

তোমার মন্তব্য বয়সোচিত না হইলেও উহাতে প্রীত হইয়াছি, ব্যবহারিক জগতে ইচ্ছা না থাকলেও, আপনা হইতেই এইরূপ প্রচার হইয়া যায়।

আবার চিঠি দিয়ে জানতে চাইলাম, তোমার মুখেই একদিন শুনেছি রবীন্দ্রনাথের

কথা : "আমারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে"—তা হলে এর অর্থ কী বুঝিয়ে দাও।

যথাসময়ে তার উত্তর পেলাম—যেন একটা ছোটখাটো প্রবন্ধ, ক্ষুদে ক্ষুদে লেখায় চার পৃষ্ঠা ভর্তি। এবার রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

এর অর্থ অহঙ্কারকে বর্জন করবে। আমি করি, আমিই সব, আমার মত আর কে আছে? এই গর্বিতভাব মনে যেন স্থান না পায়। সব কিছুই সেই মহাশক্তির কাছে সমর্পণ করবে। তুমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, তুমি কার্য, তিনি কারণ, তিনি ইচ্ছা, তুমি উপলক্ষ মাত্র। বড় হও, বুঝবে। তোমার দাদুর মত নিষ্কামধর্মী হও, এই আমার আশীর্বাদ।

সেদিনকার মত লেখাপড়া মাথায় উঠল। মাস্টার মশাইয়ের কাছে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর পত্রের মর্মাংশ যথাসম্ভব উপলব্ধি করে তবে তাঁকে অব্যাহতি দিলাম। গঙ্গাধরবাবু আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমিও আশীর্বাদ করি, এদিকে দাদু আর ওদিকে তোমার নানার মতই তুমিও নিষ্কামধর্মী হও।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছেই শুনেছিলাম—রবীন্দ্রনাথ নানাকে মৌখিক অনুরোধ করেছিলেন—একবার লালগোলার রাজাবাহাদুরকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে চলুন, তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের জন্যে অনেক কিছুই করেছেন, সবাই তাঁকে পেতে চায়।

রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টা করেও কৃতকার্য হন নি। চিরদিনই লক্ষ্য করেছি আমার ঠাকুরদা আড়াল থেকেই দান করে এসেছেন, কারও কোনও উপকার করে প্রকাশ করতে চাইতেন না, আমার পিতৃদেবও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

আমার ঠাকুরদা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদের সদস্য না হলেও যখন যা পরিষদের প্রয়োজন হত তিনি মুক্ত হস্তে সাহায্য করতেন।

"ভারতশাস্ত্রপিটক" গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন :

"পরিষদের অন্যতম পরমানুগ্রাহক লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে যাহার নাম অক্ষয় থাকিবে, তিনিও এই শাস্ত্র-প্রকাশকার্যে পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছেন।"

বহরমপুরের বিখ্যাত চিকিৎসালয় বস্তুতঃ তাঁরই বিপুল অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্যে লক্ষাধিক মুদ্রা দিয়েছেন, বহু জীর্ণ মন্দির সংস্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন।

আমাদের বাড়িতে এক দুর্গাপুজো ছাড়া সব পুজোরই চল ছিল। কী একটা বিঘ্ন হওয়ায় পূর্বপুরুষের নির্দেশে দুর্গাপুজোটা দূরে আমাদের কাছারি-বাড়িতেই সম্পন্ন হত। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর তিনটি দিনই ঠাকুরদা নরনারায়ণের পূজা করতেন। সমস্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ঢোলাই দিয়ে যত দুঃস্থ আতুর অনাথ গরীবদের ডেকে আনা হত, পাশাপাশি জেলারও অনেকেই আসত। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক কাতারে কাতারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির প্রকাণ্ড হাতায় জমা হত। সপ্তমীর দিন প্রত্যেক পুরুষকে ধুতি ও মেয়েদের শাড়ি দেওয়া হত, অষ্টমীর দিন সবাইকে অন্নব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন খাওয়াতেন; পিল পিল করে সবাই এসে বসে যেত, সে কী অগণিত নরনারীর মেলা—যেন কুম্ভপ্রয়াগ! দলে দলে লোক পরিবেশন করে চলেছে, কে কী পাচ্ছে না পাচ্ছে ঠাকুরদা নিজেই নগ্নপদে ঘুরে ফিরে খুঁটিয়ে দেখতেন, নবমীর দিন প্রত্যেককে চাল পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন। এক দিকে স্তূপাকৃতি চাল আর এক দিকে সিকি-আধুলির পাহাড়। ছোটরা সিকি আর বড়রা আধুলি পেত। প্রত্যহ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা না হওয়া পর্যন্ত তিনি অভুক্ত থাকতেন, সেই অগ্নিবর্ণ গৈরিকাবৃত আনন্দঘন মূর্তি আমার স্মৃতিপটে চিরন্তন হয়ে আছে। প্রত্যেক বার পুজোর ছুটিতে লালগোলায় এসে এই সবই দেখতাম। ঠাকুরদা বলতেন, এই তো আমার দুর্গোৎসব। কথাটি নানাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় পুজো আর কী আছে? জগৎজনের সেবাই হচ্ছে জগন্মাতার অর্চনা।

তদানীন্তন রাজপুরুষ লালগোলায় এসে তাঁকে খেতাব দিয়ে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও লাট-বেলাটের দরবারে পা দেন নি। একবার ভাইসরয় বহরমপুরে এলেন, অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি গেলেন না। লর্ড কারমাইকেল শেষের দিকে একবার বহরমপুরে এসে দানবীর যোগীন্দ্রনারায়ণের কীর্তিসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে সভায় বলেছিলেন, এই রকম আড়ম্বরশূন্য দান প্রত্যেক দানশীল ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত।

রামেন্দ্রসুন্দরও মাঝে মাঝেই ঠাকুরদার এই সব সৎকার্যের উল্লেখ করে আমাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, তোমার ঠাকুরদার পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

ওদিকে মাস্টার মশাই আবার বলতেন, তোমার নানার কড়ে আঙুলের যোগ্য হলেও ধন্য হবে।

আর একটা মজার কথা মনে পড়ে। কাংড়াতে (পাঞ্জাবে) ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক দুঃখ নিরন্ন মৃতপ্রায়। তাদের জন্য ফণ্ড খোলা হয়েছে, সেখানে কিন্তু দেশবাসীর সাহায্য গিয়ে পৌঁছয় না। ওদিকে ভাবী সম্রাট পঞ্চম জর্জকে 'স্বাগতম' জানাবার জন্যে অর্থের পাহাড় জমে উঠল। দু দিক থেকে অবিরাম পত্র আসে, ঠাকুরদা 'স্বাগতম ফাণ্ডে' দু শো টাকা আর 'ভূমিকম্প তহবিলে' দু হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করায় মৃদু হাস্যে তাঁর অধর অনুরঞ্জিত হয়ে উঠল, উত্তর দিলেন, বাজী পোড়াবার জন্যে দু শো টাকাই যথেষ্ট, এইটেই যা কিছু অর্থের অপব্যবহার হয়ে গেল ; কিন্তু যারা খেতে পায় না, ঘর-বাড়ি নেই, তাদের জন্যে দু হাজার টাকা যে কিছুই নয়।

পূর্বেই বলেছি, ঠাকুরদা ঘরে বসেই পুনঃ পুনঃ রাজসম্মান পেয়েছেন, প্রত্যেক বারই লালগোলাবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন দিতে প্রয়াসী হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সম্মতি পাওয়া যায় নি।

যখন যোগীন্দ্রনারায়ণ সি. আই. ই. উপাধি পেলেন, দরবারে তিনি কখনই হাজির হতেন না বলে সনন্দ-পত্র ডাক-যোগে কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যথারীতি লালগোলার অধিবাসীরাও তাঁকে অভিনন্দিত করতে চায়, তিনি মোটেই রাজী নন। ঠিক এমনই সময়ে, রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং না এসে সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, টাকীর যতীন মুন্সি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায়, প্রভৃতি মহারথীদের পাঠিয়ে দিলেন লাল-গোলায়। ঠাকুরদার কাছ থেকে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি যা তিনি কিনে নিয়েছিলেন, সেটা সাহিত্য-পরিষদে দান-স্বরূপ গ্রহণ উপলক্ষে তাঁরা সকলে উপস্থিত হয়েছেন।

এর অন্তরালে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, তাই রামেন্দ্রসুন্দর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হয়েই বললেন, আপনি যদি লালগোলার রাজাবাহাদুরকে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরিটি কিনতে অনুরোধ করেন, তবে বড় ভাল হয়। আমাকেই তাঁর কাছে এটা ওটা সেটা নিয়ে বারম্বার পরিষদের জন্যে সাহায্য চাইতে হয়, এবার আপনিই যদি দয়া করে এগিয়ে আসেন—। রাজা বাহাদুর কালই এসেছেন, আবার পরশুই চলে যাবেন।

সার্ গুরুদাস অভয় দিয়ে বললেন, বেশ, তাই যাব। যোগীনকে বুঝিয়ে বললে, আশা করি সে রাজী হবে।

নানার গোপন ব্যবস্থানুযায়ী গুরুদাসবাবু পরদিন প্রাতেই ঠাকুরদার কাছে উপস্থিত। দাদু তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই গুরুদাসবাবু বললেন, ছ্যাখ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটা দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ আছে। আমার ইচ্ছে ওটা তুমিই কিনে নাও। নামের খাতিরে হয়তো ওটা আর কেউ কিনে রাখবে, কিন্তু তাতে একমাত্র পোকা ছাড়া আর কারও উপকারে আসবে না।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে যোগীন্দ্রনারায়ণ বললেন, যে আজ্ঞে, তাই হবে।

ঠাকুরদা চলে গেলেন। তাঁর আদেশানুযায়ী যথাসময়ে লাইব্রেরি কেনাও হল, আলমারি বোঝাই বইগুলো লালগোলায় চালান হয়ে আমাদের বাড়িতেও পৌছল।

রামেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তিনি ভেবেছিলেন, ঠাকুরদাকে দিয়ে লাইব্রেরিটি কিনিয়ে সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তিভুক্ত করে নেবেন। সেই আশা ফলবতী না হওয়ায়, তিনি আবার ছুটে গেলেন সার্ গুরুদাসের কাছে। হতাশ কণ্ঠে বললেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরি কিনেও যে সব পণ্ড হয়ে গেল।

সার্ গুরুদাস জিজ্ঞেস করলেন, কেন? এতে আবার পণ্ড হবার কী আছে?

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, গোটা লাইব্রেরিটাই যে লালগোলায় চলে গেল।

যোগীন নিজের জিনিস নিজের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, এতে পণ্ড হবার কী আছে?

অপ্রতিভ হাস্যে রামেন্দ্রসুন্দর থেমে থেমে বলতে লাগলেন, ওটা কিন্তু আমি লালগোলার জন্যে বলি নি, আপনার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্যেই লাইব্রেরিটি রাজাবাহাদুরকে দিয়ে কেনাতে চেয়েছিলাম।

সে কথা আগে বললেই ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত। তা হলে আর নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার হাঙ্গামা হত না। বেশ, আমি যোগীনকে আবার একটা চিঠি দিচ্ছি, সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে কয়েকজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।

তাই সার্ গুরুদাসের পত্র নিয়ে এঁরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুরদার সদাশয়তায় নানার ঐকান্তিক ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না।

এই সুযোগে লালগোলার অধিবাসীরা তাঁদের ধরে বসলেন, তাঁরা অনুরোধ করলে মহারাজা হয়তো অভিনন্দন-সভায় যোগদান করতে রাজী হবেন।

শাস্ত্রী মশায়ের কথা ঠাকুরদা ঠেলতে পারলেন না, বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণ সভায় এসে বসলেন। এঁরা সবাই বক্তৃতা দিলেন—শাস্ত্রী মশাই সভাপতি। লালগোলাবাসীও তাদের অন্তরের ভাষা নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথাও মনে পড়ে। খেতাবের মোহ আমারও কোনকালে নেই; তাই যখন সেটা পাবার কথা নয়, অর্থাৎ মহারাজার জীবিত-কালেই আমার রাজা উপাধি পাওয়াটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় এবং উপাধি পাওয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম হলেও ঘরে বসে আমাকেও এই রকম খ্যাতির বিড়ম্বনা সইতে হয়েছে। কিন্তু এই খ্যাতি আমার আদর্শ ও নীতির একান্ত বিরোধী। প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ ও সুবিধা না থাকলেও আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গ করা, গোপনে রাজনৈতিক কর্মীদের অর্থ সাহায্য, এই সব কাজের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার কিছুটা যোগাযোগ ছিলই—যার ফলে আমার শিকারী জীবনের পরম প্রিয় বস্তু বন্দুকটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম! তবু যখন সেই আমাকেই এই রকম একটা উপাধি দেওয়া হল, মহারাজাকে আমার সুস্পষ্ট মত জানিয়েছিলাম।

ওসব খেতাব-টেতাব আমার ধাতে সইবে না—এটা ফেরত দিয়ে দিই, কী বল?

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আমি জানি, ওসব পেয়ে কোনও লাভ নেই, তবু তোমার শিকারের খ্যাতি, তোমার সাহিত্যসেবা, তোমারও দানধ্যানের কথা রাজপুরুষদের নজরে আছে বলেই—তার একটা পুরস্কার দেবার চেষ্টা করেছেন। তুমি না চাইলেও ওটা ফেরত দেওয়া চলে না, ওতে অসৌজন্য দেখান হয়।

সেই যোগীন্দ্রনারায়ণের অহংশূন্যতার কথাই বলছিলাম। আর এইজন্যেই বুঝি নিরহঙ্কার রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে অহঙ্কারবর্জিত যোগীন্দ্রনারায়ণের আত্মিক যোগাযোগ এমন অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজের বিজ্ঞাপনের জন্যে মানুষ কী না করে থাকে! নিজের নিজের দল গঠিত হয়, অহেতুক প্রতিযোগিতায় ঈর্ষা দ্বেষের বিষ-বাষ্প হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আত্মপ্রচার ও আত্মতুষ্টির পিচ্ছিল অন্ধকার অন্তরের সহজাত ব্যাপ্তিকে সঙ্কীর্ণতম করে তোলে। মানুষের অপরিসীম দাম্ভিকতাই এই তামসিক সাধনার শোচনীয় পরিণাম। এই আত্মাভিমান ও আত্মপ্রতারণার জটিল ব্যাধির কবল-মুক্ত ছিলেন আমার পিতামহ যোগীন্দ্রনারায়ণ,

আমার মাতামহ রামেন্দ্রসুন্দর। এই পীড়িত, বিকৃত, এই আত্মঘাতী মনোভাব একদিনের জন্যেও তাঁদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে নি আর সেই যুগ্ম আলোক-স্তম্ভের উজ্জ্বল আদর্শ আমার চোখের সামনে আছে বলেই, যেখানে বিন্দুমাত্র দম্ভের প্রকাশ দেখতে পাই, আমার মন সেখানেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেদিকে ফিরেও চাই না।

সেই যোগীন্দ্রনারায়ণও একদিন ধরা পড়ে গেলেন। ঠাকুরদা কলকাতায় এসেছেন একবার আমাকে দেখতে ; হপ্তাখানেক থেকেই চলে যাবেন।

এই সুবর্ণ সুযোগ। একদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এসে উপস্থিত। দাদা তাঁর ছাত্র, বহরমপুরে প্রথম জীবনে তাঁর কাছে প্রাইভেটে আইন পড়েছিলেন। গুরু আসতেই দাদা পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হল, তা হলে বাবার বাবা তস্য বাবাও আছেন।

সার্ গুরুদাস বললেন, যোগীন, তোমাকে একটা কথা বলব, না বলতে পাবে না।

আদেশ করুন।

সাহিত্য-পরিষদের সবাই তোমাকে একবার দেখতে চায়—তোমাকে যেতেই হবে। দিনও আমরা ধার্য করে ফেলেছি। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না, রামবাবুর কাছে তোমার লালগোলায় ফিরে যাবার তারিখ আগেই জেনে নিয়েছি।

দাদু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন।

আপনি আদেশ করেছেন, না বলবার উপায় নেই, কিন্তু এসব বিষয়ে আমাকে না টানলেই ভাল হত।

সার্ গুরুদাসের কণ্ঠে কিছুটা আদেশ কিছুটা অনুরোধ : না না, ও-কথা শুনব না, তোমাকে যেতেই হবে। আমার কথায় তোমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা একদিন না হয় মুলতুবীই রাখলে।

বেশ, যখন বলছেন, যাব।

রামেন্দ্রসুন্দর পাশেই দাঁড়িয়ে, তাঁর আনন্দোদ্ভাসিত-চোখে ভেসে উঠল বিজয়ীর দৃপ্তভঙ্গী। মুখে কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

সার্ গুরুদাস চলে গেলেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরকে অনুযোগ করেন : এর মধ্যে আপনার হাত আছে নিশ্চয়, রামবাবু?

কুণ্ঠিত উত্তর এল : সাহিত্য-পরিষদ্‌কে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলাই আমার কাজ।

দিন যতই এগিয়ে আসে, দাদুর গাম্ভীর্য যেন ততই গুরুতর হয়ে ওঠে। মাঝে আর দুটি দিন বাকী। এই স্বভাববিরুদ্ধ আবহাওয়ায় তিনি যেন বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। যিনি চিরদিন অলক্ষ্যে থেকেই কাজ করে যান, তাঁকে এই প্রথম তাঁরই প্রশংসামুখর সভায় উপস্থিত হতে হবে—এ কী নিদারুণ বিধিলিপি !

ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর যথোচিত আদর সম্বর্ধনার আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যখনই ঠাকুরদার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সাক্ষাৎ হয়, তাঁর চোখে ফুটে ওঠে একটা দুরন্ত অভিযোগ : তার অর্থ—আপনি আমায় বধ করলেন। রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁর চিরন্তন মৃদুহাস্যে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

সুযোগ বুঝে দাদাকে বলে বসলাম, অ্যাদ্দিন ডুমুরের ফুল হয়ে কাটিয়ে দিলে, আজ তো দশজনের সামনে আসতেই হবে, কী পোশাকে যাবে ?

কেন, যা পরে আছি—এই ধুতি-পাঞ্জাবি।

ওখানে কিছু বলবে ?

পারতপক্ষে নয়।

ওঁরা কি তোমায় কিছু না বলিয়ে ছেড়ে দিবেন ?

সে দেখা যাবে।

ছোট ছোট কথায় উত্তর দিয়ে আমার কাছেও তিনি অব্যাহতি পেতে চান। আবার তাঁকে বলি, তুমি যদি বল, আমি একটা ভাষণ লিখে দিতে পারি।

কী লিখবে ?

কী ভাষায় বলেছিলাম, এখন মনে থাকবার কথা নয়, তবে তার ভাবার্থ এই—

সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ, প্রত্যেক বাঙালীর গর্ব—আমাদের জন্মগত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাংলার আদর্শে মনীষীদের তপস্যায় এর ভিত্তি গড়ে উঠেছে, তাঁদের সবাইকে এখানে একসঙ্গে দেখে আজ আমি ধন্য। যে কদিন বাঁচব, সাধ্যমত আপনাদের সেবায় জীবন যদি কাটিয়ে দিতে পারি, তবেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

"ভৃঙ্গার" কথাটি আমার ভারী মিষ্টি লাগত, সেটাও লাগিয়ে দিলাম : এই পরিষদের তীর্থসলিলে অবগাহন করে প্রাণের ভৃঙ্গার ভরে নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

আরও বলবে : আপনাদের পরিচর্যায় পরিষদ্ যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।

নাঃ, সেটা বলে কাজ নেই, দীর্ঘজীবনেরও তো একটা সীমা আছে, বরং এই কথাই বোল—

আপনাদের কৃপায়, আপনাদের শুভেচ্ছায় পরিষদ্ যেন শত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাকে, এই কামনা করি। আরও যদি ইচ্ছে হয় তো বলতে পার—

আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্য-পরিষদ্—চোখের সামনে আছে অতীতের মহা আদর্শ, সামনে প্রতীক্ষা করছে সোনার ভবিষ্যৎ—আর আছে সামনে—

সামনেই দেখলাম রামেন্দ্রসুন্দর—আর বলা হল না। হয়তো তিনি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আমার এই আবেগভরা বক্তৃতার মহড়া শুনছিলেন, ঘরে প্রবেশ করেই উক্তি : বাঃ, বেশ চালিয়ে যাচ্ছ, মন্দ নয়।

ওদিকে বালকের মুখে বড় বড় কথা শুনে পুলকিত গর্বে যোগীন্দ্রনারায়ণ বললেন, আপনার কাছে থেকে বাংলা ভাষায় বেশ দখল হয়েছে খোকার। রামেন্দ্রসুন্দর অপাঙ্গে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ঠাকুরদার মন্তব্যের কোনও উত্তর না দিয়ে তাগিদ দিলেন, আর বেশী সময় নেই, এবার যেতে হয়।

চলুন।

একটি চাদর কাঁধে ফেলে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ল্যাণ্ডো গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আমি সঙ্গে আছি, এ কথা না বললেও চলে।

ঠাকুর-প্রাসাদে সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে। সাহিত্য-পরিষদের মহারথীগণ ছাড়া বাংলার মনীষীরা প্রায় সকলেই সমবেত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। সেদিন ঠাকুরদা কী করেন, কী বলেন, সেইটেই আমার লক্ষণীয় বিষয় ছিল। আমরা পৌঁছুতেই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে ঠাকুরদাকে অভ্যর্থনা জানাতেই দাদু করজোড়ে মৃদু ভঙ্গীতে অগ্রসর হলেন—যেন সরমকুণ্ঠিতা নববধূ। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে নিয়ে ফরাশে সোনালী জরির কাজ করা জাজিমের ওপর বসালেন, পেছনে কিংখাপের প্রকাণ্ড তাকিয়া। দাদু জাজিম আর তাকিয়াটা ঠেলে

সরিয়ে দিলেন, তারপর ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম দেখে নিলেন।

একে একে শুরু হল সম্বর্ধনার ভাষণ—দাদার সহৃদয়তার কথা, তাঁর যশোলিপ্সা-হীন দানের কথা, তাঁর উন্নত চরিত্রের কথা। আজীবন যত সৎকর্ম করে গিয়েছেন, একটার পর একটা যেই উল্লেখ হচ্ছে দাদা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চান। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর উন্মুক্ত হস্তে দান, প্রাচীন গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশ ও হস্ত-লিখিত পুথির মুদ্রণ-ব্যয় বহন ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী তাঁর কাছে কত সাহায্য পেয়েছেন, তাঁরই অর্থে কত রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে; তাঁর সাত্ত্বিক গুপ্ত দানের কথা, কতজনকে কত কী সাহায্য করেছেন তবু লোক-জানাজানির ভয়ে কারও কাছে প্রকাশ করেন নি ইত্যাদি। যখন ক্রমে ক্রমে সেই সব উল্লেখ হতে লাগল, দেখলাম, দাদা ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছেন—যেন আর বসে থাকতে পারেন না।

এর পর সেই চরম মুহূর্ত সমাগত হবে—দাদা ভাষণ দিতে উঠবেন, আমি অনেক আশা নিয়ে বসে আছি।

হরি হরি, তিনি উঠলেন না, রামেন্দ্রসুন্দরকে কাছে ডেকে কানে কানে কী যেন বলে দিলেন। নানা উঠে ঘোষণা করলেন—

যোগীন্দ্রনারায়ণ পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে সঙ্কল্পিত পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তা ছাড়াও গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে সাহিত্য-পরিষদে বার্ষিক আট শো টাকা দিতে চেয়েছেন।

সঘন করতালির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হল।

ঠাকুরদা পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচেন। কিন্তু তা কি হয়? যাঁদের সঙ্গে দাদুর সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের একে একে চিনিয়ে দেন। আলাপ-পরিচয় চলতে থাকে, বেশ কিছুটা সময় চলে গেল। যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে এতদিন ছিলেন আজ তাঁকে দেখে সবারই চোখে-মুখে আনন্দের মাত্রা যেন সীমাহীন। আপ্যায়ন আদান-প্রদান শেষ করে যখন তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে এসে গাড়িতে চাপলেন তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ কিছুটা রাত্রি হয়েছে।

ঠাকুরদার যদি কখনও কোন ঘড়ি কেনার প্রয়োজন হত, তিনি স্বয়ং কুক্

কেলভীর দোকানে যেতেন। এবার আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্যের জন্যে ছুটি পকেট-ওয়াচ কিনতে গেলেন। আমিও সঙ্গে আছি। নিজের পৌত্র হলেও তিনি যথারীতি রামেন্দ্রসুন্দরের অনুমতি নিয়ে তবে আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখতে দেখতে তাঁর নিজেরও একটা পছন্দ হয়ে গেল, আকারে কিঞ্চিৎ বড় বলে সেটাকে আম-পাড়া ঘড়ি বলাই উচিত। আমার কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ রামেন্দ্রসুন্দরের বিনা হুকুমে আমার জন্যে একটি পয়সার দ্রব্যও কেনা চলবে না—তা সে যত প্রয়োজনীয় বস্তুই হোক না কেন।

ঠাকুরদা এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘড়ি পছন্দ করছিলেন, সঙ্গে তাঁর দুই বাল্যবন্ধু—কালীভূষণ ডাক্তার ও দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য। আমি আর এক কোণে দাঁড়িয়ে একটি অদ্ভুত চাইমিং-ক্লক দেখলাম। প্রত্যেক পনরো মিনিট অন্তর বাংলা নাচের গৎ-বাজানো সুবৃহৎ ঘড়িটি দু ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশটি একটি ছোটখাটো থিয়েটারের স্টেজ। নীচের অংশে কারুকার্য করা রং-বেরংয়ের চিত্রিত ডায়াল। প্রত্যেক পনরো মিনিট অন্তর সম্মুখের যবনিকা সরে যায়, আর দু পাশের উইংস থেকে তিনটি করে ছটি রঙীন শাড়ি-পরা বাঙালী মেয়ের মত পুতুল বেরিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে আবার তেমনই করেই চলে যায়—সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পতন। আমি সমস্ত মনোযোগ দিয়ে সেই অপরূপ নৃত্যভঙ্গী দেখে চলেছি। আমার মত বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে ওখানকার বড় সাহেব ঘন ঘন কোয়ার্টারের কাঁটা সরিয়ে দেন আর অনবরত নাচ চলতে থাকে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই; কারণ ঘড়িটির দাম মবলক দশ হাজার টাকা। গায়ে টিকিট ঝুলছে, একটা বিক্রি হলেই বেশ মোটা লাভ, আর এমনই করেই ভারতীয় রাজন্যবর্গের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁও মারার তালে এই সব বিদেশী বণিকরা ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সুচতুর বড় সাহেব এটা ধরে নিয়েছিলেন, যদি আমি ওইটির জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করি, তা হলেই রাজাবাহাদুর আমাকে নিশ্চয়ই ওটা কিনে দেবেন।

দাদুও আমার এবম্বিধ তন্ময়তা দেখে, কাছে এসে আদর করে বললেন, এটি নেবে? তা হলে আমি রামবাবুকে জিজ্ঞেস করে তোমায় কিনে দিতে পারি।

আমার সরাসরি উত্তর শুনে তিনিও চমকে উঠলেন।

না, ওসব বাজে পয়সা খরচ করে লাভ নেই, ওরে ব্বাবাঃ, একটা ঘড়িতে এতগুলো টাকা! বরং গরিবদের দিলে ওরা খেয়ে বাঁচবে!

দাদুর মুখ দেখে তখন কিছু বোঝা না গেলেও, বাড়ি ফিরে এসেই তিনি আমার

কথাটি হুবহু নানার কর্ণগত করে মন্তব্য করলেন, আপনি যে নাতিটিকে একেবারে মোহমুদ্গার করে ছেড়ে দিয়েছেন !

আরও কী বলতে গিয়ে দাদুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। স্বভাবগম্ভীর হলেও, আমার মধ্যে স্বীয় আদর্শের প্রতিফলন দেখে তিনি এবার যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

এদিকে নানাও কথাটি শুনে, আনন্দের আতিশয্যে সেদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না ; তখুনি বাজার থেকে গরম গরম জিলিপি আনিয়ে, আমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়ালেন। সে কী আদর ! এক একটি করে আমার মুখে তুলে ধরেন, আমিও চোখ বুজে ভক্ষণ করে যাই। নাতি-নাতনীদের নিয়ে নানার এই ধরনের ঘরোয়া স্নেহবিহ্বল রূপ, এমন সাংসারিক জীবনের ছবি আমি কখনও দেখি নি। তাই এবার আমাকে উপর্যুপরি দুদিন গরম জিলিপি খাওয়ানো—তাও আবার কোলে বসিয়ে—এ যে অবাক কাণ্ড !

যাই হোক, রামেন্দ্রসুন্দরের পরামর্শে ঠাকুরদা আমাকে এক ডজন লাল নীল পেন্সিল উপহার দিয়ে লালগোলায় চলে গেলেন।

কয়েক মাস পরে।

একদিন এলেন হারানচন্দ্র রক্ষিত শেক্সপীয়রের বঙ্গানুবাদ নিয়ে। এসেই করজোড়ে বিনয়বিগলিত কণ্ঠে বললেন, আমার একসেট বই লালগোলার রাজাবাহাদুরকে পাঠিয়েছি। আর এবার লিখছি "ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য"—প্রায় শেষ করে এনেছি, যদি তিনি দয়া করে ছাপিয়ে দেন তা হলে দুঃস্থ সাহিত্যিকের বড় উপকার হয়। এ বিষয়ে আপনি যদি তাঁকে একটু লেখেন—

রামেন্দ্রসুন্দর মুখে সেই চিরন্তন হাসি নিয়ে বললেন, দেখুন, সাহিত্য-পরিষদের যখনই যা প্রয়োজন হয়, রাজাবাহাদুর মুক্ত হস্তে দান করেন, আর সেজন্যে তাঁর কাছে বহুবার পত্র লিখে ভিক্ষে চাইতে হয়। একজন মানুষের কাছে বার বার লিখতে বড়ই সঙ্কোচ লাগে। আপনিই বরং একবার লালগোলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আপনার যা বক্তব্য বলে দেখুন।

রক্ষিত মশায় সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরদার লেখা একটি পত্র তাঁর পকেট থেকে বের করে রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে দিয়ে বললেন, আমার প্রথম পত্রের উত্তর না পেয়ে আবার লিখেছিলাম, এটা তারই উত্তর। তিনি লিখেছেন, রামবাবুর কাছে যাবেন, তাঁর অভিমত পেলে দ্বিমত হবে না।

তা হলে আপনি কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন। আচ্ছা, আমি একবার তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে দেখি, তারপর জানাব।

হারান রক্ষিত যেন তাঁর হারানো আশা ফিরে পেলেন, বিদায় নেবার সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে কখন আসব ?

এই দিন সাতেক পরে—

আচ্ছা, আগামী রবিবারে আসব কি ?

বেশ, তাই আসবেন।

কার্যতঃ দেখা গেল, রবিবার পর্যন্ত রক্ষিত মশায়ের ধৈর্য রক্ষিত হয় নি। তিনি শুক্রবার প্রাতেই এসেই রামেন্দ্রসুন্দরের পাদপদ্মে সভক্তি প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

রাজাবাহাদুরের পত্র পেয়েছেন কি ?

হঁ্যা পেয়েছি, তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

রাজাবাহাদুর প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ব্যক্তি। মনে করেছি বইখানার রাজ-সংস্করণ করে তাঁকেই উৎসর্গ করব।

বাল্যকাল থেকেই আমার রহস্য করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল। রাজা উপাধি সব চাইতে বড় আর রায়সাহেব সব চাইতে ছোট খেতাব, এটা আমার আগেই শোনা ছিল। তাই বলে ফেললাম, পুস্তকের রায়সাহেব সংস্করণ হয় না ?

তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, হঁ্যা, হয় বৈকি ! এই আমাদেরই মত সাধারণ প্রচ্ছদপটে বাঁধাই করে নিলেই হল।

ভ্রূ-কুঞ্চিত রামেন্দ্রসুন্দর হুমকি দিয়ে উঠলেন : বেশী প্রগল্‌ভতা করে না।

রক্ষিত মশাই পুনরায় নানার চরণ বন্দনা করে বিদায় নেবার পরেই বললাম, তুমি তখন আমার ওপর অমন মুখ খিঁচিয়ে উঠলে যে বড় ? কী করেছি আমি ?

উনি রায়সাহেব খেতাব পেয়েছেন। হয়তো ভাবলেন যে তুমি তাঁকেই ইঙ্গিত করে উপহাস করছ। গুরুজনের প্রতি একটা মর্যাদাবোধ থাকা উচিত, নইলে শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য কী ?

উত্তর দেবার জন্যে আমার ঠোঁট কেঁপে উঠতেই, তিনি বলে উঠলেন, জানি, উনি যে রায়সাহেব হয়েছেন, তুমি তা জান না।

আমিও জোর গলায় বলি, নিশ্চয়ই জানতাম না, নইলে, বয়োজ্যেষ্ঠই হোক আর কনিষ্ঠই হোক, কাউকে চিমটি কেটে কথা বলার অভ্যেস আমার নেই। তুমি যে মিছিমিছি আমায় তাড়া দিলে, তার ক্ষতিপূরণ দাও।

কী চাও ?

আমি Lamb's Tales from Shakespeare পড়ি, আমার বেশ ভাল লাগে। ওই বাংলা বইগুলো দাও না, অবসর সময়ে পড়ে ফেলব।

তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমাকে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। শেক্সপীয়রকে বগলদাবা করে যেই উঠছি এমন সময় প্রবেশ করলেন জে. এল. ব্যানার্জি—মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা, বেশ সুপুরুষ, দেখতে অনেকটা আমার পিসেমশাইয়ের মত। তিনি এলেই আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। প্রথম দু-একটা বাংলা কথায় আদান-প্রদান করেই তিনি ঝড়ের মত ইংরেজী বলতেন। নানা কিন্তু বাংলাতেই জবাব দিতেন।

আমার হাতে একগাদা বই দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওগুলো কী? কার বই?

শেক্সপীয়রের বাংলা অনুবাদ।

এবার জে. এল. ব্যানার্জি বাংলায় উপদেশ দিলেন, মূল নাটক না পড়লে খাঁটি রস পাবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, এখনও সে বয়স হয় নি—বড় হলে পড়বে বৈকি !

জে. এল. ব্যানার্জি নানার সামনে বসতেন মেরুদণ্ড সোজা করে—দু-হাঁটু মুড়ে ঠিক শিবাজীর মত—আর সেইজন্যেই তিনি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি চলে যেতেই নানার কাছে জানতে চাইলাম, তিনি বাঙালী, তুমিও বাঙালী—তবে উনি ইংরেজীতে কথা বলেন কেন ?

দাঁতের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো হাসি বেরিয়ে এল—এ হাসির জাত আলাদা—নিরাসক্ত উত্তর পেলাম : যার যা অভ্যেস।

"ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য" বেশ সুন্দর বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরুল। উৎসর্গপত্রে রায়সাহের হারানচন্দ্র রক্ষিত লিখেছিলেন—কথা মনে নেই, ভাবটা মনে আছে : "ইষ্টদেবীর আরাধনার পর যাঁর মূর্তি আমি পূজা করি"—তারপরই কতকগুলি বিশেষণ দিয়ে—"সেই রাজারাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের শ্রীচরণে তাঁহারই জিনিস তাঁহাকে দিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।"

আমার ঠাকুরদা উৎসর্গপত্র দেখে বড়ই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কুণ্ঠিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখেছিলেন, এত বাড়াবাড়ি কেউ যদি করে তা হলে আমার পক্ষে আর কিছু করা বড় মুশকিল হবে। স্বল্প ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের মর্মকথা।

আর একদিনের কথা বলি। একজনকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই নিয়ে এলেন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। পীতাভ বর্ণের আকৃতি। নাম শুনলাম ডাঃ কিমুরা। জাপানী পণ্ডিত, ভারতবর্ষে এসেছেন—ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিষয়ে জ্ঞানলাভের আশায়। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাই প্রাচ্য জ্ঞান ও ধর্মদর্শনের লীলাভূমি ভারতে না এসে উপায় কি!

রামেন্দ্রসুন্দরের কাজ আরও বেড়ে গেল। সোজা কথা নয়—এক পণ্ডিত এসেছেন আর এক মহাপণ্ডিতের কাছে!

প্রাচীন আর্য রীতিনীতি, ধর্ম, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সুনিপুণ অধ্যাপনায় ডাঃ কিমুরা যে কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধানে কিমুরা সাহেবের বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে। এ বিষয়ে তাঁকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে যেতে হয় নি, রামেন্দ্রসুন্দরই তাঁর জীবনে অদ্বিতীয় হয়ে রইলেন।

এই অপরিসীম জ্ঞানের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। সমগ্র জাপানী জাতির সম্মুখে সেই জ্ঞানের স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন। সেই হল তাঁর গুরুদক্ষিণা। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই উদ্যোগে রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকখানি গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, আর বাংলা ভাষার কোন গ্রন্থের জাপানী ভাষায় সেই সর্বপ্রথম অনুবাদ।

আরও একদিনের কথা।

"পৃথিবীর বয়স" লেখা নানা শেষ করেছেন এবং সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। কয়েকজন শ্রোতাও উপস্থিত আছেন। কথা প্রসঙ্গে একজন প্রশ্ন করে বসলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স কত?

নানার মুখে একটা অপার্থিব হাসি, গড়গড়ার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন, পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করতে গিয়ে নিজের বয়স হারিয়ে ফেলেছি।

রামেন্দ্রসুন্দর চলে গিয়েছেন। কথাটি বেঁচে আছে।

কী সুন্দর একটা মিষ্টি গান ভেসে আসে! পশ্চিম দেশীয় একটি ছোকরা হারমোনিয়ম বাজিয়ে চলে যায় আর একটি ষোল-সতরো বছরের ঘাগরা-পরা মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে চলেছে—কখনও বা দ্বৈত-সঙ্গীত। আমি রেলিংয়ে ঝুঁকে খুব

মনোযোগ দিয়ে শুনছি। রাস্তায় কত লোকের ভিড় জমে গেল, তাদের চাল-চলন লক্ষ্য করে চলেছি—এমন সময় কে যেন পেছন থেকে আমার মুখ ধরে ঘুরিয়ে দিল, চমকে দেখি রামেন্দ্রসুন্দর!

প্রশ্ন করলেন, পড়াশুনো ছেড়ে কী হচ্ছে?

গান শুনছি, কী চমৎকার গলা!

এ সব বিষয়ে তোমার ব্যুৎপত্তি আবার কবে থেকে হল? ওদিকে মাস্টার মশাই ছাত্রকে বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর তুমি কিনা এখানে দাঁড়িয়ে বেশ গান শুনছ? দিন দিন বুদ্ধিটা পেকে খয়ের হচ্ছে। তোমায় কী বলেছি, মনে নেই?

আমাকে নীরব দেখেই তিনি আবার বললেন, কী সব দেখছিলে বল?

দেখছিলাম ওদের আর ভাবছিলাম—কোন্ সুদূর পশ্চিম থেকে পেটের দায়ে এই বাংলায় এসেছে, কণ্ঠই তাদের সম্পত্তি, আর এই মূলধন নিয়েই পথেঘাটে কেমন নেচেগেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে পরতে পরতে বুঝে নিয়েছিলেন বলেই কথাটি তিনি বিশ্বাস করলেন। মাঝপথে আমার এই জীবন-ভাষ্য থামিয়ে বললনে, ওসব ভাবের কথা এখন থাক্, পড়তে যাও।

মাথা নীচু করে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

কিছুদিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পার্শিবাগান ছেড়ে দিয়ে পটলডাঙার বাড়িতে উঠে এলেন, খুব কাছেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ি। দুজনের ঘন ঘন যাতায়াত চলতে থাকে। একদিন বিকেলে সার্ আশুতোষ এসে উপস্থিত। সঙ্গে আরও দু-চারজন লোক। কে এসে নানাকে আগেই খবর দিল যে, সার্ আশুতোষ দূরে গাড়িটা রেখে হেঁটে তাঁর বাড়ি খোঁজাখুঁজি করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা শীতলচন্দ্রকে বললেন, যাও তো একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে, শাস্ত্রী মশাইয়ের বাড়ি থেকে দুখানা চেয়ার শীগ্‌গির নিয়ে এস।

শীতলচন্দ্র তাড়াতাড়ি রওনা হতেই আবার তাঁকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ দেখো, যেন তাঁর কাছে আশু মুখুজ্জের নাম কোরো না।

পরে এর কারণ শুনেছিলাম, ওঁদের মধ্যে নাকি তেমন বনিবনাও নেই।

রামেন্দ্রসুন্দর বাড়িতে একেবারে বাংলা প্রথায় ফরাশে বসেই লেখাপড়া করতেন,

তাই ভাল চেয়ারের বালাই তাঁর ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে, শিক্ষায়-দীক্ষায় খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বিলিতি ভাবধারাকে বাংলার মাটি বাংলার জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিজস্ব অননুকরণীয় সাবলীল ভঙ্গীতে খাঁটি স্বদেশী পাঁচন তৈরি করেছিলেন। ভাষা ছিল তাঁর অনবদ্য, দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি সহজ সরল ভাষায় বলে যাওয়াই ছিল তাঁর অপূর্ব রচনার প্রধান বিশেষত্ব। স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। আচারে ব্যবহারে সাহেবিয়ানার নামগন্ধ নেই, গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করেও তিনি সব-কিছুর বাইরে—দামামা বাজিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় তিনি চিরপরাঙ্মুখ। জনকোলাহল মুখরিত কলিকাতা মহানগরীর নিভৃতপ্রান্তে বসে আত্মসমাহিত ভাবের মানুষ এই রামেন্দ্রসুন্দর। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একবার এসেছেন তাঁরাই জানেন, কী এক বিরাট, ঋষিকল্প, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন তিনি—যিনি অর্থের বিনিময়ে তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে কখনও কারও কাছে বিক্রয় করেন নি। বিদ্যার গভীরতা ছিল তাঁর অসীম, অথচ বাইরে লোকজানানোর স্পৃহা নেই। তাঁর চরিত্রে, তাঁর প্রতিটি কথায়, তাঁর চালচলনে, আচার-ব্যবহারে কী বলিষ্ঠ আত্মসংযম! দীর্ঘদিন তাঁর কাছে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। অসংশয়ে বলতে পারি, একদিনের জন্যেও রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে অসুন্দরের লেশমাত্র চোখে পড়ে নি। এইখানেই রামেন্দ্র-মানসের অভিব্যক্তি আর সেই অকম্পিত চেতনালোকের প্রসাদেই রূপায়িত হয়েছে সমগ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অপূর্ব কান্তি—তার অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ। আমার বাল্য কৈশোর ও যৌবনোন্মুখ জীবনের স্মৃতির পাতা যখন উল্টে দেখি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। হিসাবের খাতায় তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। তাঁর ভাবগম্ভীর মূর্তি, তাঁর চারিত্রিক ঐশ্বর্য, তাঁর গতি ও ভঙ্গীর ঝলক আমার জীবনে একটা গভীর রেখা টেনে দিয়েছে।

অর্থ-খ্যাতি বা পদমর্যাদার প্রলোভন তাঁর ছিল না। উপাধির বিড়ম্বনাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক—সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি পুষ্টি ও বিস্তৃতির চেষ্টা রামেন্দ্র-জীবনের সাধনার অঙ্গীভূত ছিল। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা না থাকলে যে কোনও জাতিই বড় হতে পারে না, এই ছিল তাঁর জীবনের উপলব্ধি—তাঁর মজ্জাগত বিশ্বাস। তাই তিনি বাঙালীকে বীরের ভাষা দিয়ে গিয়েছেন, বীরের সঞ্জীবন-মন্ত্র শুনিয়ে গিয়েছেন। দধীচির মত আপন অস্থি, আপন প্রাণ, আপন তপস্যা দিয়ে সাহিত্য-পরিষদ্‌কে সঞ্জীবিত করে গিয়েছেন, সমস্ত অশুভকে চূর্ণ করে তিনি এক সুরলোকের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কথায় কথায় একটু বেশী দূরে এসে পড়েছি, আবার খেই ধরতে হবে।

সার্ আশুতোষ এসে পড়েছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের দৌহিত্র নির্মল বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তিনি এসে তার পরিচয় জেনে নিয়েই পেট টিপে প্রশ্ন করলেন, কই হে, তোমার দাদু কোথায় ?

আগেই বলেছি নির্মল বেশ সাদাসিদে ধরনের ভাল ছেলে। সে ভয়ে ভক্তিতে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তাঁকে পৌছে দিল। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কী একটা অনুরোধ নিয়ে তিনি নাকি এসেছিলেন।

তখুনি তাঁর জলযোগের আয়োজন করা হল। খাঁটি দেশী খাবার—ভীম নাগের সন্দেশ, বেলের শরবত, আরও কত কী! শরবত খেতেই সার্ আশুতোষের বেলের কলপ দেওয়া গোঁফজোড়া আরও ফুলে উঠল। সে এক অপরূপ দৃশ্য !

তারপর অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনার পর তিনি বিদায় নিলেন। সার্ আশুতোষকে সবাই তখন রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলত। বজ্রকঠিন, স্বাধীন সবল চিত্তের মানুষ। রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনপীঠ ছিল যেমন সাহিত্য-পরিষদ্, সার্ আশুতোষেরও ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সে যেন জগৎসভায় সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এইই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, এইই ছিল তাঁর অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

আমার ঠাকুরদাদার আহ্বানে তিনি লালগোলায় পারিতোষিক বিতরণী সভায় গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র—বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদ। অসুস্থ থাকায় রামেন্দ্রসুন্দর সেবার লালগোলায় আসতে পারেন নি।

সার্ আশুতোষ পুরস্কার বিতরণের পর সুদীর্ঘ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। ধন্যবাদ দেবার ভার পড়ল আমার ওপর।

বাংলাতেই বলতাম, কিন্তু সার্ আশুতোষ ইংরেজিতে বললেন, তাই আমাকেও বিদেশী ভাষার আশ্রয় নিতে হল।

মনে পড়ে গেল, আজ যদি রামেন্দ্রসুন্দর আসতেন, তা হলে তিনি বাংলা ছাড়া ইংরেজিতে কখনই ভাষণ দিতেন না। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় বলি—"প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালীর ধুতি চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশকরূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রীতি নহে, এইজন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইসচ্যান্সেলার স্যর ডক্টর দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন।"

দেশাত্মবোধই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার মূল ভিত্তি। তিনি বাংলার উপকরণেই বাংলার পূজা করতেন—বাংলার ভাবসম্পদেই বাংলা ভাষার সেবা করেছেন।

স্যাডলার কমিশন শিক্ষা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত জানতে চাইলে তিনি যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন, কমিশনের রিপোর্টে আমরা তার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি লিখেছিলেন—

"Western Education has given us much, we have been great gainers ; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence to others ; as regards the nobility and dignity of life."

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর এই স্যাডলার কমিশন রিপন কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। কমিশনের কর্তা স্যাডলার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে জনৈক অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে রামেন্দ্রসুন্দরের মত এই রকম তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন লোক নিযুক্ত না করে কতকগুলো ছেলেছোকরা নিযুক্ত করা হয়েছে কেন?

উত্তরে শুনেছিলেন—This is the fate of our country.

প্রথম যখন বাংলার বুক চিরে দু ভাগ হয়ে গেল—সেই বঙ্গভঙ্গে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন প্রচণ্ড। তাঁর জন্মস্থান জেমো কান্দীর ঘরে ঘরে তাঁর রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ হত। কলকাতায় আমরাও সব ভাই-বোনে তিনবার সমস্বরে বলতাম—

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।

বছরে বছরে ওই অরন্ধনের দিনে আমাদের ঘরে উনুন জলত না। আমরাও তাঁর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের দিনটি যথাসম্ভব শুচিতার সঙ্গে পালন করতাম।

সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতাম—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল,
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ,
বাঙলার বন বাঙলার হাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান ॥

তারপরেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনার সেই শাশ্বত বাণী আমরা সকলেই উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করে যেতাম—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।

আমাদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবে বিভোর উচ্ছল কণ্ঠও ধ্বনিত হয়ে উঠত। প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা এখনও বর্তমান আছেন—এই দৃশ্য তাঁদের আজীবন মনে থাকবে। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না এমনই একটা আন্তরিকতার দীপ্তি তার মধ্যে জড়িয়ে ছিল।

এই দিনে রামেন্দ্রসুন্দর গরদের ধুতি চাদর পরতেন। এবম্বিধ বেশ ধারণের কারণ জানতে চাইলে তিনি আমায় বলেছিলেন, বিশেষ কারণ কিছু নেই, তবে মা

ফি-বছরে পুজোর সময় গরুদের ধুতি চাদর দিয়ে থাকেন—আর সেটা এই দিনে ব্যবহার করাই তো উচিত।

পাঠ্যজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর দিনরাত অত্যধিক পরিশ্রম করার দরুন মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণায় ভুগতেন। এবার সেটা প্রবলভাবে দেখা দিল। শরীর ইদানীং যেন আর চলতে চায় না, তাঁর বড় সাধের সাহিত্য-পরিষদেও যেতে পারেন না—সাময়িকভাবে অবসর নিয়েছেন। মনের অবস্থাও ভাল নয়। রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত দু বেলাই রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখতে আসেন, ডাক্তারও আসেন দু বেলাই। একদিন তিনি ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, দেখ, শরীরে খুব কষ্ট পাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে, মাথাটা যেন আরও পরিষ্কার হয়েছে। এর কারণ কী, বলতে পার ডাক্তার?

ডাক্তার নিরুত্তর।

বিপিনবিহারী গুপ্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, অনেক কথাই মনে আসে, যদি বলে যেতে পারতাম! যখন ভাল ছিলাম, তখন আপনি প্রায়ই আমাকে নূতন কিছু লিখতে বলতেন। ভাবতাম, নূতন বলার কিছু নেই। যাও বা ছিল, একজন না একজন কেউ সে বিষয়ে বলেছেন। আজ রোগশয্যায় শুয়ে সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা নূতন আলো দেখতে পাই—ইতিহাস, দর্শন, সব কিছুরই একটা নূতন ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে হতাশার সুর!

অধ্যাপক বিপিনবিহারী বললেন, আমি তো দু বেলাই আসি। বেশ তো, আর একটু সকালেই এসে হাজির হব, আবার কলেজ ফেরতা সোজা এখানেই চলে আসব। আপনি বলে যাবেন, আমি সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখব।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী ভাবলেন, রামেন্দ্রসুন্দর এই রচনার মধ্যে ডুবে থাকলে হয়তো কিছুটা স্বস্তিও পাবেন আর দৈহিক যন্ত্রণাও ভুলে থাকবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখে মুখে আনন্দ।

তাই ঠিক হল। যথাসময়ে অধ্যাপক আসেন, রামেন্দ্রসুন্দর বলে যান—অধ্যাপকেরও কলম নিয়মিত চলতে থাকে।

'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র সৃষ্টি এমনিভাবেই হয়েছে। কী অনবদ্য ভাষা আর কী অতলস্পর্শী ভাবের অভিব্যক্তি!

অধ্যাপক বিপিনবিহারী অত্যধিক পান খেতেন, অন্দর থেকে হরদম পান সেজে পাঠিয়ে দিত—তিনি পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলতেন। কলমেরও বিরতি নেই, তাম্বুল চর্বণেরও কামাই নেই। বাড়ির সবাই বিরক্ত—তার কারণ, ঠিক সময়ে নানার ওষুধ পড়ে না, পথ্য দেওয়া চলে না, এ আবার কী একটা নূতন উপসর্গ এসে জুটল! প্রায়ই দেরি হয়ে যেত বলে, বিপিনবাবুও ওখানেই স্নানাহার সেরে সটান কলেজে রওনা হতেন।

একদিন রবিবার—বিপিনবাবুর কলেজ নেই—বারে বারে স্নানাহারের তাগাদা সত্ত্বেও তিনি কলম ছেড়ে উঠতে পাচ্ছেন না, কারণ রামেন্দ্রসুন্দর সেদিন একটা গুরুতর গবেষণার কথা বলে চলেছেন। নানার পথ্যেরও অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে অনুজ দুর্গাদাস ত্রিবেদী ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে বিপিনবিহারী-বাবুকে দু হাতে তুলে নিয়েই সটান বাইরে চলে গেলেন। ধ্যানমগ্ন রামেন্দ্রসুন্দরের হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। মুখ ফিরিয়ে বালকের মত গোঁ ধরে বসলেন, সেদিন তিনি কিছুই খাবেন না। অগত্যা রামেন্দ্রসুন্দরের সামনে বিপিনবাবুর কাছে দুর্গাদাস ত্রিবেদী ক্ষমা চাইলেন। তিনিও নানাকে বুঝিয়ে বললেন, আপনারই ওষুধপথ্যের দেরি হচ্ছে বলেই আমাকে দুর্গাদাসবাবু সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ঘটনার পর অধ্যাপক বিপিনবিহারী সমঝে গেলেন—ঠিক কোন্ সময়ে তাঁকে কলম ছেড়ে উঠতে হবে। কিন্তু নানা তাঁর নিজের শরীরের প্রতি সমান নির্বিকার! এ-ও জ্ঞান-তপস্বী রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি রূপ।

ওদিকে দেড় বছর হল একটি মেয়ে হওয়ার পরেই গিরিজামাসী কেবল ভুগছেন। অসুখ সারতে চায় না—ক্রমে বেড়েই চলেছে। মাসীমার দুই পুত্র চার কন্যা। জ্যেষ্ঠ নির্মলের কথা আগেই বলেছি। কনিষ্ঠ সুবিমল যখন হামাগুড়ি ছেড়ে টাল খেয়ে চলতে শুরু করেছে, নানা তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা শীতলচন্দ্র রায়কে সামটায় পত্র দিলেন—"ঘোষ সাহেব হাঁটিতে শিখিয়াছে।"

সুবিমলের গায়ের রঙ কিঞ্চিৎ ময়লা। সে সময়ে যে গয়লা বাড়িতে দুধ যোগান দিত, তার গায়ের রঙটাও অনুরূপ ছিল বলেই নানা আদর করে সুবিমলের নাম রেখেছিলেন "ঘোষসাহেব"। সেই "ঘোষসাহেব" এখন পুরোদস্তুর ইঞ্জিনিয়ার —বিলেত ফেরত, তবে ঘোষ নয়—সাহেব হলেও তার চাল-চলনে ঘোষণার বালাই নেই।

গিরিজামাসীকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলেছে। প্রত্যহই চিকিৎসক আসেন, দেখে যান, ফী নেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবিধ ওষুধের প্রেসক্রিপশন করেন, কিছুতেই আর ফল হয় না। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল।

ডাক তাঁর এলে ডাক্তারের ক্ষমতা নেই যে কাউকে ধরে রাখে! রামেন্দ্রসুন্দর মাদুলি বা টোটকা-টুটকি ব্যাপারে কখনই বিশ্বাস করতেন না। এখন যেন তিনি কী রকম হয়ে গেলেন। যে যা বলেন, তাতেই তিনি সম্মতি দিয়ে যান—দৈবপ্রক্রিয়াও বাদ পড়ে নি। গিরিজামাসী যে কক্ষে রোগশয্যায় শায়িতা, সেখানে কালীপুজোও হয়ে গেল। তবু নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান রোধ করবার শক্তি মানুষেরই নেই।

দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। মাসীমার অবস্থা এখন-তখন।

ম্লানপাণ্ডুর আকাশ, নীচেও তার প্রতিচ্ছায়া। দোতলার সংলগ্ন খোলা ছাতে খালি গায়ে বসে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট থরথর করে কেঁপে উঠছে—সেই কাঁপুনি আর থামতে চায় না। গিরিজামাসীকে দেখে ডাক্তার সামনে আসতেই কে যেন তাঁর হাতে নির্ধারিত ফী গুঁজে দিল। তিনি সেটা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন, আজ আর টাকা নিতে পারব না, ত্রিবেদীমশাই!

রামেন্দ্রসুন্দর স্তব্ধ। শূন্য আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল পরে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা মর্মভাঙা স্বর বেরিয়ে এল: কোন রকমেই কি আর গিরিজাকে ধরে রাখা যায় না, ডাক্তারবাবু?

রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তার নীরব। উদ্‌গত অশ্রুবারি গোপন করবার জন্যে তিনি মুখ ফিরিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

গিরিজামাসীর জীবনের স্পন্দন থেমে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দরের অবস্থা বর্ণনাতীত, অন্তরের জমাট ব্যথা চোখে মুখে ফেটে পড়তে চায়। সামনে মাতৃহীন পুত্র-কন্যারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে, তাদের হাহাকার যেন আর কানে শোনা যায় না! যাকে তাঁর রেখে যাবার কথা, সেই আজ তাঁকেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! এই কি বিধিলিপি! এই কি বিশ্বনিয়ন্তার খামখেয়ালী ভাঙাগড়া!

গিরিজামাসী চলে যাবার পরেই একটা গাঢ়কৃষ্ণ যবনিকা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে নেমে এল।

মনের এই দুঃসহ অবস্থায় তিনি আমার জননীকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। কিন্তু চিঠিখানা যেন আমার মাকে লেখা নয়—তার মধ্যে তিনি নিজেই যেন নিজেকে বিশ্লেষণ করে সান্ত্বনা কুড়িয়ে নিতে চান। মানুষ কেন আসে, কেন যায়, আনন্দ পায় কেন, সেই মানুষই তখনি আবার দুঃখে কেন বাক্যহারা হয়ে পড়ে, কোন্ অদৃশ্য-লোকের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে চলেছে—শোক তাপ আশা আনন্দ বিরহ-মিলনের এই অপূর্ব রচনা! জ্ঞান কর্ম ও বৈরাগ্য-সাধনার প্রতীক রামেন্দ্রসুন্দর, স্বভাব-গম্ভীর, চিরসংযত, প্রজ্ঞাবান রামেন্দ্রসুন্দর, 'নিয়মের রাজত্ব'-রচয়িতা রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানময় জীবনেও জেগে উঠেছে যেন অনিয়মের এলোমেলো অসংখ্য জিজ্ঞাসা!

নানীর মুখের দিকে আর তাকানো যায় না, নানাও যেন কেমন হয়ে গেলেন, বাইরে থেকে সম্যক্ বোঝা না গেলেও ভিতরে যে ভাঙন ধরেছে তার কোনও ভুল নেই। সাধারণতঃ তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন, শোকের আঘাতে আরও যেন কথা ফুরিয়ে গেল।

গিরিজামাসীর স্বামী শীতল মেসোমশায়ের অবস্থা ততোধিক। তাঁদের বাল্য-কালেই বিয়ে হয়েছিল, তখন থেকেই মাসীমার কাছছাড়া হন নি। এতদিনের বন্ধন কোন্ নিষ্ঠুর বিচারে ছিঁড়ে গেল, সে কথাই ঘরের এক কোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করেন। একদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একনিষ্ঠ হয়ে এতদিন কাটানোর পর যদি কেউ ছেড়ে চলে যায়, মৃত্যুর পরেও কি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়?

একটা অতি দীন শুষ্ক ম্লান হাসি তাঁর অধরে ফুটে উঠল। উদাস দৃষ্টি মেলে বললেন, ঠিক জানি না, তবে নিষ্ঠার মূল্য যদি কিছু থাকে, সংস্কারের মধ্য দিয়েই হয়তো দেখা পাওয়া যায়!

শীতলবাবু আবার প্রশ্ন করেন, তবে শুনতে পাই ব্যবহারিক জগতে যা সত্যি, পারমার্থিক জগতে তাই নাকি মিথ্যে?

স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মের পার্থক্য থাকবে বৈকি। আর তাই নিয়েই সত্যি-মিথ্যের মাপকাঠি তৈরি হওয়াটা বিচিত্র নয়।

এই সব বলে তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন এ নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না।

বিপদ কখনও একলা আসে না। কিছুদিনের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের জননী আমাদের পদ্মমাও মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকেও আর ধরে রাখা যাবে কিনা সেও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপর্যুপরি দু-দুটো আঘাত সেই নির্বিকার মানুষটিকেও এবার বিকারের আওতায় এনে ফেলেছে। রোগজীর্ণ দেহে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করে আবার কলকাতায় ফিরে এসেই সেই যে শয্যা গ্রহণ করলেন, আর উঠলেন না।

ব্রাইটস্ পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, যন্ত্রণায় ঘুম হয় না। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল রামেন্দ্রসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে মানসিক শক্তি সঞ্চালন করে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ঘুম ভেঙে গেলেই আবার যে-কে সেই। এই সময় একদিন দুঃখ করে তিনি বললেন, পার্শীবাগানের বাসায় রোগযন্ত্রণায় বড় কষ্ট পেয়েছিলাম, মা আমাকে কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন, তাঁর সর্বদুঃখহারী আশীর্বাদেই আমার কষ্টের লাঘব হয়েছিল। আজ আমার মা নেই, কে আর আমাকে শান্তি দেবে!

এই কথা বলে তিনি অসহায় বালকের মত কেঁদে উঠলেন।

হয়তো কোন এক অজানা রহস্যলোকের আহ্বান তিনি শুনতে পান; তাই একদিন দুষাকে ডেকে বললেন, মণীন্দ্র, একবার ডি. এল. রায়ের সেই "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" গানটি আবৃত্তি করে শোনাও—

কবিতাটি মণীন্দ্রের মুখস্থই ছিল। শেষের চরণ দুটি যখন সে আবৃত্তি করছিল—

পরিহরি ভব সুখ দুখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে—
বরিষ শ্রবণে মাতঃ তব জলকলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে—

রামেন্দ্রসুন্দর শুয়ে ছিলেন, তাঁর দু চোখ বেয়ে গঙ্গা-যমুনার ধারা নেমে আসে। সকলেরই মন বিষাদাচ্ছন্ন—যেন একটা ঘন কালো মেঘ ছেয়ে এসেছে। সকলেরই চোখে মুখে আসন্ন বিচ্ছেদের করুণ ছায়া। এমনই ভাবে আরও কয়েকদিন কেটে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদিন শুনলেন তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তাঁর জীবন-মন্থন-করা

সেই পরিষদে যাবার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন—এও রামেন্দ্রসুন্দরের একটা মর্মান্তিক বেদনা। সেই দুঃখই তাঁর দিনগুলিকে দুর্বহ করে তুলেছিল।

ঠিক এমনই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধিত্যাগের সঙ্কল্প জানিয়ে বড়লাটকে যে ইংরেজী পত্র লিখেছিলেন তার বাংলা তর্জমা বসুমতী কাগজে প্রকাশিত হল। রোগশয্যায় শুয়েই রামেন্দ্রসুন্দর সংবাদপত্র পড়লেন।

স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হত।

কবিগুরু সেই মনীষীর সম্বর্ধনায় স্বহস্ত-লিখিত সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্রে লিখেছিলেন, "সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমায় সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের উপাধিবর্জনের সংবাদ পেয়েই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে একবার শেষ কাছে পেতে চাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদীকে দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলে পাঠালেন, আমি উত্থানশক্তিরহিত, একবার পায়ের ধুলো চাই, আর নাইট উপাধিত্যাগের মূল ইংরেজী পত্রখানি যেন তিনি দয়া করে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

খবর পেয়েই কবিগুরু ছুটে এলেন তাঁর বাড়িতে। অভিন্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথও বুঝে নিলেন কেন এই আকুল আহ্বান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কালিদাস নাগ—যিনি আজ বাংলার অন্যতম বিজ্ঞ সুধী। ডাঃ নাগের মুখেই শুনেছি, রামেন্দ্রসমীপে যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, একজন খাঁটি মানুষকে দেখে আসবে চল।

রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছেন। রাস্তায় ভীড় জমে গেল। একদিকে উৎসুক দর্শকের সজীব চঞ্চলতা, আর একদিকে গৃহের অভ্যন্তরে আত্মীয়স্বজনের অচঞ্চল নীরবতা। কী যেন একটা অনাগত আশঙ্কায় সকলেই ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি বিরাট হৃদয়ের মিলন-তীর্থে সবাই নীরবে চেয়ে দেখল—রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনধারা যেন সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গমে মিশে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে একবার শুনতে চাই।

তিনিও একখানি নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল ত্রিবেদীতাপসের মুখে। শারীরিক

অসুস্থতার তীব্রতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন তাঁকে দেখে কে বলবে, তিনি বহুদিন যাবৎ এমন কঠিন অসুখে ভুগছেন! দেহে যেন কোথাও এতটুকু গ্লানি, এতটুকু জ্বালা, এতটুকু যন্ত্রণা নেই। দুজনের মধ্যে অনেক কিছু আলোচনা চলতে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বাঙ্গে উৎসাহের আবেগ। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা বুঝি এমনই করেই জ্বলে ওঠে।

কম্পিতস্বরে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, আমি আর উঠতে পারি না, দয়া করে আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন।

পায়ের ধুলো দিতে গেলে পা তুলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী নন। নানা কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেন, আমার শেষ ভিক্ষা, দয়া করে প্রার্থনা পূরণ করুন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম ইচ্ছা কি উপেক্ষা করতে পারেন?

কবিগুরু বিদায় নিলেন। এদিকে রামেন্দ্রসুন্দরও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙল না। যাঁর সব কিছুই সুন্দরের প্রকাশ, তাঁর মৃত্যুতেও সুন্দরের সাহচর্যে সেই চিরসুন্দরের দেখা এমন সুন্দরভাবে তিনি পেয়ে গেলেন। সেই স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস কোন এক নিস্তরঙ্গ জ্যোতির্লোকে বিলীন হয়ে গেল। অর্ধশতাব্দীর গৌরবময় ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে সেই চলমান জীবনের মহাপ্রস্থানের পথে শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে রইল।

যুগে যুগে মহামানব আসে আবার চলে যায়। তিনিও এসেছিলেন আমাদের মধ্যে, দিয়ে গিয়েছেন তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি আর সাধনার আলো, রেখে গিয়েছেন তারই পরিচয় তাঁর অতলগভীর অপূর্ব. রচনাবলীর মধ্যে। স্বদেশআত্মার বাণী-মূর্তিকে রূপ দেবার জন্যে বুকের রক্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে থাকবে। সৃষ্টিই কষ্টিপাথর, জনপ্রিয়তার হঠাৎ ফিকে জৌলুস নয়। অবাক হয়ে ভাবি, নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখা এই রামেন্দ্রসুন্দরকে! তিনি কোন্ জগৎ থেকে এসেছিলেন, আবার কোন্ জগতেই বা চলে গেলেন! কী বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর অন্তরে আর কী সুমহান আদর্শ ছিল তাঁর সম্মুখে! আজ বাঙালী ও বাংলাকে চিনতে গেলে, জানতে হবে রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনালব্ধ এই সুন্দর জীবনটিকেও।

কে সেই—যিনি এই মহাজীবনকে পৃথিবীর জীবনে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর পথটুকু এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন! সেই অদৃশ্য মহাশক্তিকে নমস্কার!

আজ শুধু অন্তর্জগতে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রেমতর্পণ করলেই আমাদের কর্তব্য ফুরিয়ে যাবে না, বহির্জগতেও তার নিদর্শন চাই, তাঁকে উপযুক্ত অর্ঘ্য দেবার আসন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমি শুধু ব্যষ্টির কথা বলি না, সমগ্র জাতি সমষ্টিগতভাবে সেই ভগবানের চিহ্নিত মানুষটিকে প্রত্যক্ষ পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করুক—তবেই তাঁর কাছে আমাদের জাতীয় ঋণ যদি কিছুটা পরিশোধ হয়। ব্যক্তিগতভাবে, আমার পিতামহ—মহারাজা সার্ যোগীন্দ্রনারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমিতে তাঁরই নামে হিন্দু ও মুসলমানের জন্যে দুটি পৃথক পান্থনিবাস ও তৃষ্ণার্ত নরনারীর জন্যে রামেন্দ্রসরোবর করে দিয়েছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যানুরাগীই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আজ বাংলার মনীষী এবং সাহিত্য ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে আমার এই একটি প্রশ্ন, সমষ্টিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উপযুক্ত পন্থা কি আমরা আজও খুঁজে পাই নি? বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিস্তারের রাজ্যে যাঁর এতখানি দান, চিন্তাশক্তির পরিশুদ্ধ আলোয় চেতনাশীল জাতির চিত্তে সেই রামেন্দ্রসুন্দরের উপযুক্ত স্মারক প্রতিষ্ঠায় একটা অনির্বাণ অবিকম্পিত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠুক—নব-জাগ্রত জাতির চক্ষে সেই আনন্দ-সুন্দর জীবনের মর্মকথা পাঠ করে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই, এই আমার সর্বশেষ নিবেদন।

স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড়ই পীড়াদায়ক!

আমার বাল্য ও কৈশোরের দিনে তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে! তোমার নিষ্কলুষ ভাবধারা, তোমার তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি, তোমার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমার জীবনকে সঞ্জীবিত করেছে, পরিপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে; জানিয়ে দিয়েছে, জীবন কত উচ্চ, কত সুন্দর, কত মহীয়ান! সেই জীবনের অধিপতি তুমি, হে রামেন্দ্র-সুন্দর, তোমার সুন্দর ছোঁয়া পেয়ে খুঁজে পেয়েছি এমন একটা কিছু—ভাষা

যেখানে মূক, হৃদয় যেখানে পরিপূর্ণ আনন্দে স্তব্ধ। যা শুধু অতীন্দ্রিয় জগতেই বোঝা যায়, অথচ ধরা যায় না। এই দৃশ্যজগতে তুমি আজ আমার কাছে নেই, তবু তুমি আছ—আমার সর্বাঙ্গীণ অনুভূতির গভীরে তুমি মুখর হয়ে আছ। আমার তন্দ্রায় জাগরণে, আমার স্পন্দিত কল্পলোকে, আমার ধ্যানের ধারণায়, আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—চেতনার উত্তরণতীরে সেই আলোকতীর্থে প্রতিষ্ঠা করেছি তোমার রত্নসিংহাসন। দুজনের মধ্যে আজ মরণসিন্ধু কল্লোল করে চলেছে। এই দুস্তর ব্যবধানের এপারে দাঁড়িয়ে আমি দীর্ঘশ্বাসের সেতুবন্ধ রচনা করেছি—তার ওপর দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম তোমারই কথা। তুমি সেই জ্যোতির্লোক হতে আমায় আশীর্বাদ কর।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রালোকে রামেন্দ্রসুন্দর

'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থের এই বিশেষ অধ্যায়টি পূর্বে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নি। উপযুক্ত মালমশলা যোগাড় করতে যে বিলম্ব হয়েছিল সেইটি প্রধান কারণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে যে আন্তরিক যোগাযোগ ছিল এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এই দু'টি মহাপ্রাণ যুগন্ধর মানবের যে রূপ প্রকাশিত হয়ে ওঠে, চিঠিপত্রের মধ্যেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শাশ্বত কালের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের যে প্রদীপ্ত আলোকে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখেছিলেন এবং যে সজীব নির্ভরতায় রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাল্য অর্পণ করেছেন, তার মধ্যে দিয়েও আমরা সেই নীরবকর্মী, প্রকাশ-বিমুখ, তপস্যা-ভাস্বর রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় পাই। একথা বলাই বাহুল্য, বঙ্গবাণীর লীলায়িত কুঞ্জেই দুজনের মধ্যে আন্তরিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল; কিন্তু এই আন্তরিকতা সাহিত্যের প্রাঙ্গণেই শুধু উন্মুক্ত ছিল না, উভয়ের অন্তর্লোকে অন্তরঙ্গতার একটা অমলিন স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি দেখতে পাই। সমসাময়িক সর্বপ্রকার আবর্তনের অন্তস্তলে যেখানে বোধির নিস্তরঙ্গ প্রবাহ, সেই শান্ত উদার অবগাহে এই লোকোত্তর জীবনদুটিকে দেখার আগ্রহ নিয়েই এই পরিশিষ্টের সূচনা। সেখানে প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের উচ্ছলতা, কাব্যদীপালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিকের তপস্যা, উভয়ের আর্ষ অনুভূতির যুক্তধারায় প্লাবিত হয়েছে বঙ্গদেশ—শুচিতার অকম্পিত আলোকে ধন্য হয়েছে মাতৃভূমি।

দুঃখের বিষয় কবিগুরুর নিকট লিখিত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রাবলীর মধ্যে মাত্র একখানি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে। সেই পত্রখানি প্রকাশিত করার সুযোগ ও অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মহোদয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সঙ্কলিত পত্রাবলীর মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মাত্র একখানি পত্র থাকলেও, কবিগুরুর পত্রাবলী থেকেই পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে উভয়ের গভীরতা ও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, টেলিফোনে একজনের কথা শুনলেই অপরের কথাও অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

কবিগুরুর লিখিত পত্রাবলী আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত বঙ্গবাণী পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে। উক্ত পত্রিকার ষষ্ঠবর্ষের (১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দ) ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যায় যে সমস্ত পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পত্রগুলি আমার মাতামহী, রামেন্দ্র-সহধর্মিণী ৺ইন্দুপ্রভা দেবীর জীবদ্দশায় তাঁর কাছ থেকে উক্ত বঙ্গবাণী পত্রিকার প্রকাশক চেয়ে নিয়েছিলেন। বহু চেষ্টাতেও সেই মূল পত্রগুলি তাঁদের কাছ থেকে আর ফেরত পাওয়া যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায়, সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে টাউনহলে যে অভিনন্দন দিয়েছিলেন, সেই অভিনন্দন পত্রটিও এখানে সন্নিবিষ্ট হ'ল। এর কারণ এই যে সে-যুগে একটি ক্ষুদ্র রবীন্দ্রবিরোধী দলের অস্তিত্ব ছিল। এই অনুষ্ঠানে তাঁদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিবাদপত্রের যে উত্তর রামেন্দ্রসুন্দর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে দিয়েই কবিগুরুর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং সেই প্রতিভার যোগ্য সমাদর যে জাতির অবশ্য কর্তব্য, এই প্রতিজ্ঞাই ফুটে উঠেছে।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কবিগুরুর স্বহস্তলিখিত অভিনন্দন পত্রটিও এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হয়েছে, কারণ, ইহা 'রবীন্দ্রালোকে রামেন্দ্রসুন্দর' এই পরিশিষ্টেরই পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের চিঠিপত্রের সংযোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠির সন্ধান আছে ; কিন্তু সেগুলি 'রবীন্দ্রালোকে রামেন্দ্রসুন্দর' অধ্যায়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থখানির সঙ্গে 'রবীন্দ্রালোকে রামেন্দ্রসুন্দর' এই অধ্যায়টি সংযুক্ত করে আমি একটি যুগের কথাই বলতে চেয়েছি—যে যুগের প্রধান পুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যে যুগের অন্যতম প্রজ্ঞান-সারথি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত)

[১]

ওঁ

জোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে উপস্থিত হইয়া আহার ও আলাপ করিলে বড় সুখী হইব। যদি ভোজন সম্বন্ধে আপনি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, তবে আহারের পরেও আসিতে পারেন;—আমাদের ভোজটা হিন্দু-মুসলমানী। অনুগ্রহ পূর্বক একটা উত্তর পাঠাইবেন। ইতি

ভবদীয়

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২]

ওঁ

বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন—

নববর্ষের প্রিয় সম্ভাষণ জানিবেন। নিশ্চয় বাড়ি গেছেন। সব খবর ভাল ত?

একটি ছাত্রের আবেদন পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় এমন আরো অনেক ছাত্র আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন জানিতে ইচ্ছুক আছি।

আমি ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শরোগ প্রেরণ করিয়াছেন—এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।

ভাণ্ডার বাহির হইয়াছে—প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে। ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই। ইতি

৭ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩]

ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আমাদের স্কুলে দুটিমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে—তাহাদিগকে আপনার নির্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। যে সকল ছেলের বয়স বারো বৎসরের অধিক নহে, তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করিবেন না। নিতান্ত কচি এবং সম্পূর্ণ ঝুনো এই দুটোকেই বাদ দিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলি ভাণ্ডারে চালান দিব।

কথাসরিৎসাগরের তর্জমায় কোনো অধ্যাপককে লাগাইয়া দিব। পঞ্চতন্ত্র ছেলেদের দিয়া তর্জমা করাইয়া লইব।

অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" এখানকার দুটি ছাত্র তর্জমা করিতেছে—প্রায় শেষ হইয়াছে। মনে করিতেছি নিখিলবাবুর ঐতিহাসিক চিত্রে ছাপিতে পাঠাইব।

ধর্মপূজার খোঁজ লওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে "নেশন" ছিল না ও নাই সে কথা সত্য—তাহার পরিবর্তে কি আছে বা ছিল সেইটাই ভাল করিয়া বিচার্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারিবেন।

এবারকার ভারতীতে খেয়ালখাতা নামক একটা নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে, সেটাতে আমাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয় বন্ধুরা যখন যাহা খুশি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না, রচনার সৌন্দর্যও থাকিতে পারে না— * * * হঠাৎ সেগুলিকে পাঠক সমক্ষে তুরী ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষতঃ বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কিনা জানিনা কারণ, আজকাল দোকানদারিই সবচেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

পরিষদের শৈশব বিভাগের ভার সম্পূর্ণ আপনাকেই লইতে হইবে। ইহাকে লালফিতার উদ্বন্ধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন না। ইতি

১৪ই বৈশাখ, ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪]

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুতঃ দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা— তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না। টাকা এ সকল কাজে যে আকর্ষণে অজস্র আসিয়া পড়ে তাহা ভাবের আকর্ষণ—আমাদের দ্বারা ধনী লোকের চরণ আকর্ষণ নহে। আমি নিশ্চয় জানিতাম * * * টাকা দিবেন না। তাঁহারা কোনো দিন উচ্চভাবের দ্বারা চালিত হন নাই—তাঁহাদের অভ্যাস ও সংস্কার সর্বপ্রকার মহৎ ত্যাগস্বীকার ও দুষ্কর তপশ্চর্যার বিরোধী। হঠাৎ একটা আন্দোলনের বেগে কতদিনের জন্য কতটুকুই বা আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে? * * * কে আমি ঠিক চিনি না—কিন্তু তাঁহার মন্ত্রদাতা * * * এর প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা নাই—আমি ইঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছি।

ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্ধাপ্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষতঃ উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া, যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি—আমি ভাট মাত্র—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার

কোনো সেবাকার্যে আমাকে আহ্বান করেন, তবে আমি অগ্রসর হইব—কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই—যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি—ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫]

ওঁ বোলপুর

বিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি পাঠাইতেছি। ইহা হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ও তিনি কি কি কাজে কিরূপ ব্যাপৃত আছেন বুঝিবেন। পারিশ্রমিকের কথা পড়িয়া দেখিয়া যদি কিছু বাড়াইতে পারেন ত ভাল, নতুবা ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্তব্য পালন করিবেন। বইগুলি যদি ইতিমধ্যে আনাইয়া দিতে পারেন তবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বিলম্ব হইবে না।

আমিও আমার বিদ্যালয় দেড় মাসের জন্য বন্ধ করিয়া বিশ্রামের চেষ্টায় আছি। ইতিমধ্যে শিক্ষা-পরিষদের জন্য আমার সাহিত্য প্রবন্ধ চতুর্থ কিস্তি লেখা হইয়াছে—পরিষদের ছুটি ফুরাইলে কোনো একদিন পড়িয়া আসিব—কিন্তু আপনাকে কি সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইব? না পাইলে ও আপনার চিরপ্রসন্ন মুখ না দেখিলে আমার পড়িয়া সুখ হইবে না।

রংপুর আমার প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈব লক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরেজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? এইবেলা আপনাদের রংপুরের শাখাটিকে সাবধান করিয়া দিন। দোহাই আপনাদের—আমার ত আর সভাসমিতি এবং টানাটানি সহ্য হয় না। কি উপায় অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব তাহার একটা উপায় বলিয়া দিবেন।

আশা করি ভাল আছেন ও আনন্দে আছেন। ইতি

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬]

ওঁ

(পোস্টমার্ক—বোলপুর)

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এখানে আসিয়াই তিনি শতপথ ব্রাহ্মণ যেখানে যাহা পাওয়া সম্ভব আনাইয়া লইবেন। তাঁহার আসিতে আর প্রায় দুই সপ্তাহ আছে। তিনি একবার কাজে লাগিলে তাঁহার বিলম্ব বা শৈথিল্য দেখিতে পাইবেন না—এ সকল কাজে তাঁহার নিষ্ঠা আশ্চর্য। ইতি

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭]

ওঁ

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রাংশ আপনাকে পাঠাই, যথাবিহিত ব্যবস্থা সত্বর করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি বলেন ত তাঁহাকে এখনি কাজে লাগাইয়া দিব।

আমি এবার বরিশাল ও চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। দুই জায়গাতেই সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদের জেলা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। একটা প্রশ্নের তালিকার মত করিয়া দিলে জেলার নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর তাঁহারা আনাইয়া লইতে পারেন। ভিন্ন জেলার উপভাষাগুলির তৌলন ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহারও বিবরণ চান। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া এই কাজটা সারিয়া ফেলুন। মফস্বলের লোকদিগকে একবার ধরাইয়া দিলেই অতি সহজেই আপনারা সফলকাম হইবেন। দেরি করিবেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি

১১ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮]

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ সুরু করিয়া দিয়াছেন। এখানে সোসাইটির প্রকাশিত শতপথ তিন ভল্যুম আছে—সেই পর্যন্ত শেষ করিতেই অনেকদিন লাগিবে। ইতিমধ্যে বাকি অংশ বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব—অথবা অন্যত্র হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। মোদ্দা কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় একবার যখন শতপথ লইয়া পড়িয়াছেন তখন উনি ফিরিবেন না।

আমি দীর্ঘকাল এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। এখন যে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আবার কলিকাতা যাতায়াত করিব এমন সম্ভাবনা বিরল। যদি কোনো জরুরী কাজে নাকে দড়ি দিয়া কলিকাতায় টানিয়া লইয়া যায় তবেই রাজধানীতে আমার শুভাগমন হইবে এবং তদুপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করাও অসম্ভব নহে। আপনি একবার দয়া করিয়া এখানে পদার্পণ করিবেন আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা—সে কি একেবারেই সম্ভাব্যের বাহিরে? এখানে আসিলে মফস্বল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে। ইতি

১৭ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯]

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র পড়িয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ মহাশয়কে আমি জানি। ইনি কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন— সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অধিকার সাধারণ পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী। লোকটি অত্যন্ত ভাল। ইঁহার সহিত পরিচয় হইলে আপনি খুশি হইবেন। ইতি

১৩ই শ্রাবণ ১৩১৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মফস্বল সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলির জন্য একটা প্রশ্নাবলী তৈরী করার কি হইল?

[১০]

ওঁ   (পোস্টমার্ক—বোলপুর)

৩রা আগষ্ট, ১৯০৭

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

হঠাৎ কন্যার পীড়ার সংবাদে বোলপুরে আসিতে হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্য জন্য যে কয়খানি বইয়ের দরকার তাহার তালিকা আপনাকে পাঠাইয়াছি। তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাঁহার কাজে প্রবৃত্ত আছেন। আদর্শস্বরূপ আপনার অনুবাদখানি দেখিবার জন্য তিনি উৎসুক আছেন—কবে পাওয়া যাইবে? অনেককাল আপনাদের কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি পরামর্শ এ সমস্তই মাঝে মাঝে জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি

শনিবার   আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১]

ওঁ   শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের কতকটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ করাই তাঁহার ইচ্ছা। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইলে গ্রাহক ও অনুবাদক উভয়েরই উৎসাহ হয়। নতুবা এত বড় বৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—সেটা ঠিক সঙ্গত হইবে না বলিয়া বোধ করি। এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবেন। অন্তত আগামী বৈশাখ হইতে যদি প্রকাশ আরম্ভ হয় তবে এখন হইতে গ্রাহকদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিতে পারেন। মাসে মাসে বা প্রতি তিনমাসে বাহির করিবার কোনো বাধা দেখি না।

আপনার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যেরূপ পীড়ার সংবাদ জানিতাম তাহাতে এ সময়ে আপনাকে এ পত্র লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। আশা করি আপনারা ভালই আছেন। ইতি

২৬শে পৌষ ১৩১৪   ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২]

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আপনি ত বাসা বদল করিয়া বড় মুস্কিলেই ফেলিলেন। নূতন বাসার নাম ও নম্বর এ বয়সে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। যদি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র না পান ত নিশ্চয় জানিবেন আপনাকে ভুলি নাই কিন্তু আপনার বাসা ভুলিয়াছি।

কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানাপক্ষ হইতে গালিসংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, কন্‌ফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে, তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব—বাবা, তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও—তাহা হইলে আমি যে কোন্ দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।

ধ্বনি বিচার পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরো অনেক শাখা প্রশাখায় বাহিত করিয়া লইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। যথা, ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্যক্ষর সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন অন্ত্যাক্ষরেও তাহা বিস্তারিত ভাবে খাটাইয়া দেখা কর্তব্য—কচ্‌কচ্ (চ), কট্‌কট্ (ট), কন্‌কন্ (ন), কর্‌কর্ (র), কল্‌কল্ (ল) কস্‌কস্ (স)—এই শব্দগুলির আদ্যক্ষর একই কিন্তু অন্ত্যাক্ষরের পার্থক্যে কেন পৃথক অনুভূতি প্রকাশ হইতেছে তাহা আপনার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করা এক্ষণে সহজ হইয়াছে। আপনিও যে ইহার আলোচনা করেন নাই তাহা নহে।

প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্তি আছে এবং সেই জন্যই সেই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্তত বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

আমি চৈত্র মাসটা এখানে কাটাইয়া তবে কলিকাতার দিকে ফিরিব এইরূপ অভিপ্রায়—বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা জানি না। আমাকে আপনি এখনো নূতন কর্মে জুড়িয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছেন? আমার কি সেই বয়স? আমার বনগমনের কাল প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন কেবল পাকা দাড়ি নাড়িয়া দূর হইতে পরামর্শ দেওয়াই আমাকে শোভা পাইবে—আর কি কাজ করিতে পারিব? এমন কি, কলমটাকেও বিসর্জন দিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। যে হতভাগ্য ঠিক জায়গাটাতে থামিতে জানে না সে যে তালকানা—আশা করি আমার এ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। ইতি

১১ই ফাল্গুন ১৩১৪ ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩]

ওঁ বোলপুর

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আপনার মন হইতে কি দয়ামায়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে? আমার আপীল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর—with cost? আপনি জানেন আমি আত্মরক্ষার জন্য যতদূরেই পলায়ন করি না কেন, আপনারা ডাক দিলে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারি না—সেইজন্যই আপনাদের দয়া প্রার্থনা করি। যেখানকার কাজ শেষ করিয়াছি সেখানে আপনারা আবার ফিরিয়া ডাকিলে আমি রক্ষা পাইব কি করিয়া? কর্মফলও ত এক জায়গায় আসিয়া নিঃশেষিত হয়, অন্তত তাহা এক পর্ব হইতে পর্বান্তরে নূতনরূপে নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করে। আমার কর্মও তাহার ক্ষেত্রের লীলা শেষ করিয়া কি গোলাবাড়ির ইতিহাস সুরু করিতে পাইবে না? কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করিব না—বিবাদ ত নয়ই। অনুরোধ রাখিবার চেষ্টা করিব—অর্থাৎ বাহিরের ব্যাঘাত যদি গুরুতর হইয়া না ওঠে তবে বর্তমান অবস্থায় আমার যেরূপ সাধ্য আছে সেইরূপই সাধন করিব। কিন্তু একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আছে। এক ভদ্রলোক হুঙ্কার নাম দিয়া কতকগুলি উগ্র

কবিতা লিখিয়াছিলেন ; আমার অনুমতি না লইয়াই তাহা আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খুলনা ন্যাশনাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেখানে রাজদূতে তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরিয়াছে। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুনলায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিশের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি—সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের পত্রও দেখিয়াছি। হয়ত বা শীঘ্রই ডাক পড়িবে। এই টানাটানি আমার পক্ষে নিদারুণ—এদিকে আমার শরীরও এখন একেবারেই অপটু—যদি বোলপুর হইতে খুলনায় নাড়াচাড়া ঘটে তবে আমি যে সম্পূর্ণ আস্ত থাকিতে পারিব এমন আশা করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাকে আপনাদের জবাব দিতেই হইবে—নতুবা ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিবে। সব কথাই ত শুনিয়া রাখিলেন—আমি ছোটখাট কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব কিন্তু যত্নে কৃতে যদি না ঘটিয়া উঠে তবে ক্ষমা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা আছে, অতএব যদি কখনো সেবায় ত্রুটি ঘটে তবে তাহা ক্ষমতার অভাবে—তাহাতে সেবকের অপরাধ লইবেন না। ইতি

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫ ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৪]

ওঁ

(পোস্টমার্ক—বোলপুর)

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

যাহা বলিয়াছিলাম লিখিয়া দিবার চেষ্টা করিব। রিপোর্টে ছাপিয়া বাহির করিবার মত কোনো কথা বলি নাই তবে রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে, যতটুকু মনে পড়ে লিখিয়া দিব।

কতকগুলি পুঁথি আছে—কবে নিশ্চিন্তমনে সেগুলি পরিষদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে ?

আমার পিতৃদেবের ছবিখানি যদি আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দেন তবে মন সুস্থির হয়। ইতি

১লা পৌষ ১৩১৫ ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৫]

ওঁ

কালকা
C/o U. Ganguly, Esq.

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শব্দতত্ত্ব এবং অন্য গদ্য গ্রন্থগুলি যথাসময়ে আপনার করকমলে গিয়া পৌঁছিবে। আমার প্রকাশকবর্গ যে আপনাকে ভুলিয়া আছেন ইহা আমি মনে করি নাই। আজই তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া দিলাম।

আমার শরীর বিশেষ একটু অসুস্থ হওয়ায় এই গ্রীষ্মের দিনে দূর পথ অতিবাহন করিয়া আজ কালকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যদি ভাল থাকি তবে কিছুদিন এখানে যাপন করিব।

অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই। আরো দীর্ঘকাল হয়ত দেখা হইবে না। স্মরণে রাখিবেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই।

ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি

২৬শে বৈশাখ ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৬]

ওঁ

শিলাইদহ
নদীয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

চিঠিখানি পড়িয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। আমার খনিতে যত গভীর করিয়াই খনন করুন খনিজ পদার্থতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না—আমার কাব্যে কেবল একটি মাত্র দুর্ভাগা কবিতায় খনিজ বস্তুর সংস্রব আছে—সে ঐ সোনার তরী—কিন্তু সে ত মগ্নপ্রায়। অতএব পত্রলেখকটিকে আপনাদের বৈজ্ঞানিক বাণী-ভাণ্ডাগারে ডাকিয়া লইবেন।

সম্প্রতি পদ্মায় বেড়াইতে আসিয়াছি। অনেকদিন আপনার কোনো সন্ধান পাই নাই। আপনাকে আমার বইগুলি পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে তাগাদা দিয়াছিলাম—তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। আপনার শরীর মাঝে খারাপ হইয়াছিল। এখন ভাল আছেন ত? ইতি

৩০শে আষাঢ় ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিকানায় নম্বর সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। যেখানে সংখ্যার কোনো সংস্রব আছে সেখানে আমি বৈদান্তিক বললেই হয়—অর্থাৎ একের উর্ধ্বেই আমার কাছে অবিদ্যা।

[১৭]

ওঁ (পোস্টমার্ক—কলিকাতা)
১৭. ৯. '০৯

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে নিশ্চয় সাহিত্য-পরিষদে আপনার প্রবন্ধ শুনিতে যাইব। অপরাহ্ণ বলিতে অনেকটা সময় বুঝায়—ঘণ্টাটা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইতি

শুক্রবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮]

ওঁ শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

লালগোলার রাজাবাহাদুর আমার গৃহে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে এবং আমার ঘরে তাঁহার শুভাগমনকে আমি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করি। এবারে যে সুযোগ হারাইলাম বারান্তরে তাহা লাভ করিবার আশা মনে রহিল।

সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হইয়া বরোদায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে কিন্তু পাত্রটি যদি একেবারে বাণীশূন্য হয় তবে পাত্রের মুখ রক্ষা হইবে কিসের

জোরে। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা এ পর্যন্ত আমাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন—প্রবাসে সভাসঙ্কটে কে আমাকে রক্ষা করিবে? যদি চাণক্যের পরামর্শ অনুসারে চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লম্বশাটপটের আয়োজন করিয়া যাত্রা করিতে পারি কিন্তু তেমন অবিচলিত নিঃশব্দতার সহিত আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করিলে আপনারা কি নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিতে পারিবেন? নিশ্চয়ই সেখানকার যজ্ঞকর্তারা সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন, তখন কিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা আমি আমার মূঢ়তা গোপন করিব সে পরামর্শ আমাকে দিবেন। যদি আপনারা কেহ সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য আমাকে লিখিয়া দেন তবে সজীব গ্রামোফোনের মত আমি তাহা আবৃত্তি করিয়া আসিবার ভার লইতে পারি। আপনি বা হীরেন্দ্রবাবু যদি যান তবে আমি আপনাদের পশ্চাতে থাকিয়া কেবলমাত্র হাত পা নাড়িয়া কাজ চালাইবার ভরসা রাখি। ইতি

২৭শে আশ্বিন ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯]

ওঁ

কুষ্টিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

পাব্লিকের সেবাকার্য হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে কতদিন থেকে চেষ্টা করছি—দূরে থাকি, চুপচাপ করে থাকি, কারো কোনো কথায় থাকিনে, যেন মরেই গেছি এম্‌নিতর ভান করে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি কিন্তু তবু আপনারা দয়া করেন না কেন? আপনারা কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে, সত্যি সত্যি না মরলে উপায় নেই? এ রকম আভাস ইঙ্গিত প্রয়োগ করা কি বন্ধুর কাজ? সংসার এবং বিষয়কর্ম থেকে একেবারে সরে পড়েছি—সুতরাং যে দাঁড় আশ্রয় করে আমি পাব্লিকের চিড়িয়াখানায় ঝুলতে পারতুম সে দাঁড় ভেঙেছি—এখন ব্যাধের মত আমাকে আর তাড়া করে বেড়াবেন না। আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন করা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেইজন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়—সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই দয়া হওয়া উচিত। বর্তমান

অবস্থায় আমাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচান। আমি যেটুকু পারি কাজ করচি এবং করব কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর মিশতে পারব না। গোলে হরিবোল দেওয়াই ভিড়ের প্রধান কাজ, এখন আমার সেরকম উদ্যম, ইচ্ছা ও গলার জোর নেই। আপনাদের বর্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—রজনী সেন মহাশয় যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন অবসান করেছেন আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি এবং তাঁর আশ্চর্য সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধও হয়েছি এইজন্যে আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের ভার লাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা—কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা বাড়াতে হয়, শেষকালে কেউ কোনমতেই দোহাই মানে না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াপীড়ি করেন, তবে অবশ্যই আমাকে রাজি হতে হবে কিন্তু তার পূর্বে আমার তরফের কথাটা একবার আপনার সামনে উপস্থিত করলুম—আমার প্রতি দয়া না হয় তবে আমিই হার মান্‌ব।

আমি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার নামের সহযোগে "কুষ্টিয়া" এই ঠিকানা দিলেই আমি চিঠি পাব। ইতি—তারিখ ঠিক জানা নেই!

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০]

ওঁ

প্রীতি নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

এতদিন চিনির কারখানা আপনার মনোরাজ্যেই ছিল, এ কথা সর্বজন বিদিত, কিন্তু সেটাকে দেহক্ষেত্রে বিস্তৃত করলেন কেন? ওটা একেবারে রহিত করা কি চলে না? কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা কি অসম্ভব? কলকাতার জাঁতার মধ্যে আর নিজেকে দলিত করবেন না—বেরিয়ে আসবার হুকুম এসেছে—এখন বিশ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে মহত্তর কাজে বসে যান। একথা আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই বলছি—আমার এ জায়গায় আপনাকে পাব এমন লোভ আমার থাকতে পারে কিন্তু আশা নেই, অতএব নিরাসক্ত চিত্তেই আপনার মঙ্গল কামনা করছি।

সাহিত্য পরিষৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন—এতে করেই পরিষদের সাত্ত্বিকতার লাঘব হয়ে আসচে সুতরাং নিত্যকার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনোমতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহু মূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী খুশী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণু প্রত্যাশী মধুকরের দল প্রমাদ গণতে থাকে। আমাদের দেশে সর্বত্রই রাজসিকতার স্থূল হস্তাবলেপটা নূতন এই জন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজন মাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যা এত বেশি, তাদের ফরমাশ এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিসকে আর দেখবার জো থাকে না। আসল কথা কোনো জিনিসকে চালাতে হলে তার সাম্‌নেকার পথটা ত ছেড়ে দিতে হয়—আমরা কিছুতেই কাউকে পথ ছাড়তে পারিনে—ঘোড়া ও সারথির সামনে সবাই মিলে জড় হয়ে আমরা এমনি হুড়োহুড়ি করতে থাকি যে মনে করি তাতেই বুঝি অগ্রসর হবার খুব সাহায্য হচ্ছে। অথচ উপায় ভেবে পাইনে আজকাল সকল কাজেই মাল-মসলা এত বেশি গুরুতর হয়ে পড়েছে যে, তার খাতিরে সকলেরই কাছে আসল জিনিসটাকে আগাম বন্ধক রেখে কাজ সারতে হয়—সে বন্ধক আর উদ্ধার হয় না—চিরকাল বিকিয়ে থাকতে হয়। বাড়ি গড়বার জন্যে যে রাজমিস্ত্রীকে ডাকা যায় অবশেষে সেই বাড়িটি দখল করে ধুমধাম করে বাস করে আর গৃহস্থ চিরদিন দ্বারের বাইরে বসে গৃহকর্তার ভান করে কাষ্ঠ হাসি হেসে রৌদ্রে জলে লোককে অভ্যর্থনা করবার ভার নিয়ে থাকে।

বিদ্যালয় বন্ধ হবে ১৭ই তারিখে। বন্ধ হবার পূর্বেই ছেলেরা একটা কিছু অভিনয় করবে—আমাকে ত নিশ্চয়ই ছাড়বে না—সেই কথা ভাবছি। আপনার সভায় উপস্থিত থাকার প্রলোভন আমার খুবই আছে—যাবার চেষ্টা মনে জেগে থাকবে নিশ্চয়ই জানবেন—কিন্তু এ কথাও মনে রাখবেন আমার এই সব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্বল ও এরা আমার সংসারপক্ষের ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে—সেইজন্য এদের জোর বেশি—এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ।

আপনাকে আমাদের শারদোৎসবে টেনে আনার আশা করা কি একেবারেই দুরাশা ? কিছুতেই বিচলিত হবেন না ? ইতি

৩২শে ভাদ্র ১৩১৭ আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি, সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন যে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন, তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভার বহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষদ্ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের

সভ্য। আপনাদের এই কবি সম্বর্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না, সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষদ্‌কে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার এক-পঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম। আপনারা আশীর্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি

২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে আপনাদিগকে আশু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে—অথচ আমার পুজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি, আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না, এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন

আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এইজন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি

২২শে বৈশাখ ১৩১৮ ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৩]

ওঁ

শিলাইদা

নদীয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্র স্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন, সমস্ত জড় জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে—নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ—সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে উপহাস করে? আমি যদি কালো আলপাকার চাপকানপরা অফিসের কেরাণী জীবনের পরিচয় দিই তবে লোকে সেটাকে একটা সত্য পদার্থ বলিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে থাকে—আর

আমার যে পরিচয়টা জগৎজোড়া পরিচয় সেটাতে যদি ট্রামগাড়ীর যাত্রী ও সীজ্‌ন্‌-টিকিট ওয়ালাদের হাসি পায় তবে সে হাসি আমাকে হজম করিতেই হইবে। দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিকরঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিকপ্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধূলা মাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই—ইহাই আমার গৌরব—আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে—আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমার রক্ততরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না—এইজন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে—কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না। আমার স্মৃতি তাহাদের মধ্যে নাই। ইহাতে কি হাসিবার কিছু আছে? আপনার Execution of duty-তে গায়ের জোরে আমি বাধা দিব না কিন্তু নালিশ জানাইয়া রাখিলাম। ইতি

১৭ই ফাল্গুন ১৩১৮ অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

প্রিয় বন্ধু!

সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি ত মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি—আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয়ত

ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"কোলাহল ত বারণ হল
এবার কথা কানে কানে—"

এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজী তর্জমা সুরু করিয়াছিলাম, বারণটা যে কতদূর সফল হইল তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।

আপনি আছেন কেমন সে কথা লেখেন নাই। শীঘ্রই কলিকাতায় একবার যাইতে হইবে তখন দেখা করিব। ইতি

১ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৫]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন—

কোনো ঠিকানা না রাখিয়া কিছুকালের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আপনার চিঠিখানি পাইলাম। দুই একদিনের মধ্যেই আবার নিরুদ্দেশের মধ্যে ডুব মারিবার চেষ্টায় আছি। শিকারী যতই গুলি চালাইতে থাকে হাঁস তেমনি যেমন ঘন ঘন জলে ডুব মারে, আমার সেই দশা হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ আমি হঠাৎ দূর দূরান্তরের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছি, তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইবার আয়োজন করিতেছি। চিঠিতে কাহাকেও সাড়া দেওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছি—কিন্তু আপনার ডাকে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু আমি উড়ুক্ষ-ডানা মেলিয়াছি—অতি শীঘ্রই আমি নাগালের বাহিরে পৌঁছিব—এমন কি, সেখানে গোলাগুলিও পৌঁছিবে না।

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়—আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয়—কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ত বাধা নাই। এত কথা যে বলিতেছি তার কারণ এই যে, প্রতিকূলতা চারিদিকেই তর্জনী তুলিয়াছে, বুঝিতেছি

যে দেশের লোককে আমি ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছি—সেটা যদি দোষের হয় তবে তাহা আমার বুদ্ধিরই দোষ, হৃদয়ের দোষ নহে—আপনি জানেন দেশের লোককে আমি ভালই বাসি—সেইজন্য তাহাদের ভাল চাই—ভাল কথা চাই না। এই দুর্যোগের দিনে এই আশাটিকে সম্বল রাখিতে চাই যে বন্ধুরা যদি বা আমার মঙ্গলের আশা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবু হৃদয় হইতে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইতি

১২ পৌষ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৬]

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন

আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার শেষ চিঠিখানির সুরের মধ্যে কিছু রুদ্ররসের আমেজ দিয়াছিল না কি? বোধ হয় সেটা করুণ রসেরই ছদ্মবেশ মাত্র—সূর্যাস্তকালের মেঘের মত বাহিরে দেখিতে আগুনের রং কিন্তু একটু আঁচড় কাটিলেই অশ্রুবাষ্প বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছি বোধ করি তাই মনের ভিতরটা কিছু আর্দ্র অবস্থায় আছে—দেশকে গভীর ভাবে ভালবাসি বলিয়াই এইরকম সময়টায় অনেক দিনের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে অভিমানের কথাগুলো কিছু আতপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই আপনার চিঠিতে নিজেকে বোধ করি ঠিক সামলাইতে পারি নাই। সংযত হইবার বয়স হইয়াছে—অন্যকে উপদেশ দিবার বেলাতেও পাকাচুল কাজে লাগে কিন্তু নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি কবির কোষ্ঠীতে বয়স আর কিছুতেই এগোতেই চায় না—শরীরটা শেষের পথে খুব ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু স্বভাবটা সেই যে পঁচিশের কাছে আসিয়া ঠেকিয়া গেছে কিছুতেই আর প্রমোশন পাইতেছে না। আমি জানিতাম গণিতের বুদ্ধি আমারই নাই কিন্তু আমার বিধাতারও যে আমারই দশা প্রতিদিন তাহা ধরা পড়িতেছে—আমার ভিতরকার বয়সটার সম্বন্ধে কেবলি তিনি ঠিকে ভুল করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমার পাকা চুলের সঙ্গে আমার আচরণের বড়ই বেমানান হইতেছে। সত্য কথা যদি বলিতে হয় আপনার মধ্যেও

একদিকের অঙ্ক অন্যদিকে চালিয়া দেওয়া হইয়াছে—অনেককাল হইতেই আপনার অন্তরের দিক হইতে হরণ করিয়া আপনার পাকা চুলের দিকে পূরণ করা চলিতেছে, এ ভুলটা আজ পর্যন্ত সংশোধন করা হইল না। কিন্তু এখন প্রার্থনা করিবার সময় হইয়াছে আপনার শরীরের দিকটায় ভুল অঙ্কের ভার আর যেন চাপানো না হয়। ইতি

২৭ পৌষ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার রাত্রে কলিকাতায় যাইব—আপনার পটলডাঙ্গার বাসার সমস্যা ভেদ করিতে পারিব না, আমি লিভিংস্টোন নই, আমি যৎসামান্য কবি মাত্র, ইহা মনে রাখিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র তাঁর জন্মদিনে এক সান্ধ্যসম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরকে সংবর্ধিত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবজাত শ্রুতিসুখকর অমৃতবর্ষী মধুর কণ্ঠে এবং কবির পূর্ণ হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষায় তাঁর স্বহস্তলিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন :

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—

হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রধীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চির সঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

এখানে আসিয়া অবধি বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সময় কিছুই পাই না—শীঘ্র পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দুই একটা ক্লাস আমাকে লইতে হইতেছে।

তা ছাড়া আমি কোনো মতেই আজকাল লেখায় মন দিতে পারি না—লোকালয়ের যে সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি এখন তাহার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি—এখন আমাকে অবসর লইতেই হইবে। আমাকে এখন আসরে ডাকিলে আর যে পাইবে সে আশা নাই। মনে করিয়া লও সেই প্রবন্ধলেখক লোকটার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার সৎকার শেষ করিয়া পবিত্র বিস্মৃতির জলে তাহার খ্যাতির ভস্ম তোমরা নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলে তাহার একটা জীবনের লীলা সাঙ্গ হয়—

তাহার একটা বোঝা চোকে। যাই হোক আমাকে তোমরা বাদ দিয়া রাখ—ভূমিকা লেখাই বল, অভিভাষণ বল, সমালোচনাই বল, আমার দ্বারা আর ঘটিবে না। বয়সের গতিকে যখন শক্তির অনাবশ্যক প্রাচুর্য আর থাকে না তখন তাহাকে নানাদিকে ছড়াইয়া দেওয়া চলে না—তখন ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া শক্তিকে সংহত করিতে হয়—আমার সেই সময় আসিয়াছে, অতএব একটা দিকে দাঁড়ি টানিয়া ইতি লিখিয়া বসিয়া আছি। ত্রিবেদী মহাশয়কে আমার সানুনয় নমস্কার জানাইয়া আমার প্রতি দয়া রাখিতে বলিবে—কাজের বাহির হইয়াছি বলিয়াই একেবারে আবর্জনার মত বর্জন না করেন—যদি করেন তবু আমার উপায় নাই—বস্তুত যে কাজের শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে সে কার্যক্ষেত্র হইতে সর্বতোভাবে সরিয়া যাওয়াই শ্রেয়—সেখানে দেহত্যাগ করিয়াও প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ানো কল্যাণকর নহে অতএব নমস্কার। ইতি

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* পত্রখানি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত নয়—তাঁর নিকট লিখিত রবীন্দ্র পত্রাবলীর মধ্যে ছিল।

[রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পত্র]

৮ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
হ্যারিসন রোড ডাকঘর
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

জিজ্ঞাসা-র দ্বিতীয় সংস্করণ আজিকার ডাকে পাঠাইলাম; একবার পাতা উল্টাইবেন; কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ ইহাতে দিয়াছি; পঞ্চভূত, অতিপ্রাকৃত, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা। সাহিত্য-পরিষদে মায়াপুরীটা পড়িয়াছিলাম। সেদিন আপনি উপস্থিত ছিলেন; আপনার সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠের ভাগ্য আমার বড় একটা জোটে না; সেই একদিন জুটিয়াছিল।

৫ই ভাদ্র সন্ধ্যার পর আপনার দত্ত পুরস্কার মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া—শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম; সমস্ত ভাদ্রটাই শয্যাগত ছিলাম। আশ্বিন ও কার্তিকের

অর্দ্ধেক বাড়ীতে গিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিয়াছি ; আবার কিছুদিন চলিবে। এইরূপে ঠেকো দিয়া যতদিন চলে চলুক।

সবুজ পত্রের সম্পাদক আমাকে একদিন আশা দিয়া গিয়াছিলেন সবুজপত্রে আমার 'কর্ম্মকথার' আলোচনা করিবেন। তাঁহার হাতের আলোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। সমালোচনাটা মর্ম্মবেদনার কাজ করিলেও আহ্লাদের সহিত পিঠ পাতিয়া দিব। আপনি এ কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন কি ?

কর্ম্মকথার স্থানে স্থানে হিন্দুর সমাজতন্ত্রের প্রতি এক-আধটু পক্ষপাতের কথা আছে—কিন্তু ওগুলা নিতান্তই অবান্তর কথা—প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কর্ম্মকথার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন—মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিটা স্বভাবের নিয়মে—বাহির হইতে ঘাত প্রতিঘাতে মানব-সমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনে—কতটা গজাইতে পারে অধিকাংশ প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। Natural Selectionকে নিংড়াইয়া কতটা ধর্ম্মরস আদায় করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে Evolution-তন্ত্রীরা যে পথে Ethics ছাত্র গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমি দেখাইয়াছি। Evolution হইতে সবটুকু পাওয়া যায় না ; কর্ম্মকথার শেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ'—এই প্রবন্ধটিতে আমি একটু নূতন পথে গিয়াছি। আপনি 'কর্ম্মকথা' পড়িয়াছেন কিনা জানি না—যজ্ঞ প্রবন্ধটি একবার সময়মত পড়িবেন কি ? এই প্রবন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছি কিনা তাহা কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম না।

ইতিমধ্যে আপনার কলিকাতা আসার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৩১৮ সালে ১৪ই মাঘ তারিখে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের পঞ্চাশত্তম বর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন :

অভিনন্দন পত্র

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু—

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ কিরণপাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ

করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরীক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ ব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন, মনীষিগণ স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুম সম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামীগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাট দেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহের অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিনী গায়ত্রী কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব রক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়ন কালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারা বর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত কণিকা বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সম্বৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহপীযুষে বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই ভুবন মনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্ব-পিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের পত্র :

১২, পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০-এ মাঘ, ১৩১৮

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্য-সেবার উপলক্ষ করিয়া (পরিষৎ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনও রূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই বা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান নির্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহক-গণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান-প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্ত্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্ব্বতন 'সাহিত্য-রথী'দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান

নাই ; কেন না, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চূণ-কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন ও উহা পরিষৎ-মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সংবর্দ্ধনা-কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এই চাঁদা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে তোলা হয় নাই, তাঁহাদের নিজের ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই ; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থে পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যে কলিকাতায় থাকিয়াও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি সংবর্দ্ধনা ব্যাপারে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফঃস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না ; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে। কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন, বুঝি না। * * *

আপনার কুশলপ্রার্থী

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর, ১৩২০ সালে ৪ই অগ্রহায়ণ
রামেন্দ্রসুন্দর পত্রান্তরে লিখেছিলেন :

·· রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না ; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত ? একেই ত কথা আছে, বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি ? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে। আপনার কুশল প্রার্থনা করিয়া ইতি করিলাম।···

ভবদীয়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী